লৌহকপাট

চতুর্থ পর্ব

জরাসন্ধ

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭১

—সাত টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী

মুদ্রণ—রিপ্রোডাক্‌শন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ক্যাশ প্রেস, ৩৩।বি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মু

উৎসর্গ

লৌহকপাটের অন্তরালে যারা শেষ নিঃশ্বাস রেখে গেল,
সেইসব বিস্মৃত মানুষের উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য রচনা—

লৌহকপাট ১ম পর্ব

ঐ অনুবাদ—হিন্দী, মালয়ালাম, গুজরাটী, মারাঠী

লৌহকপাট ২য় পর্ব

ঐ অনুবাদ—হিন্দী, গুজরাটী

লৌহকপাট ৩য় পর্ব

ঐ অনুবাদ —গুজরাটী

লৌহকপাট ৪র্থ পর্ব

তামসী

ঐ অনুবাদ—হিন্দী, মালয়ালাম

ন্যায়দণ্ড

পাড়ি

ঐ অনুবাদ—হিন্দী

আবরণ

আশ্রয়

মসীরেখা

একুশ বছর

ছায়াতীর

ছবি

বন্যা

মল্লিকা

সপ্তবহ্নি

এবাড়ী ওবাড়ী (নাটক)

পসারিনী

। কিশোর সাহিত্য ।

রংচং

গল্প লেখা হল না

জরাসন্ধের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

জরাসন্ধের ছোটদের প্রিয় গল্প

লৌহকপাট

চতুর্থ পর্ব

॥ এক ॥

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে, লেখক ও পাঠকেব মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক। প্রথম জন দেয়, দ্বিতীয় জন নেয়। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সম্পর্কটা পারস্পরিক, যাকে বলে মিউচুয়্যাল। পাঠকও দেও, অনেক সময় অকাতরে, এবং লেখক সে দান অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করে।

নিতান্ত দৈবক্রমে সহসা যেদিন লেখকের ভূমিকায় নেমে পড়েছিলাম, তারপর থেকে বুঝেছি, অদৃশ্য হাত থেকে পাওয়া সেই অজানা দানের দাম অনেক।

জানি, সকলে এ-মত মানতে চাইবেন না; বলবেন, লেখক যেখানে স্রষ্টা, তার সৃষ্টিই তো তার মন ভরে দেয়। পাঠকের কাছ থেকে কি এল আব না এল, সে বিষয়ে সে উদাসীন।

কথাটা আংশিক সত্য। নিজেব সৃষ্টির মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আছে। কিন্তু তাব গভীবতা থাকলেও স্থায়িত্ব বড় কম। খোলা পাত্রে রাখা কর্পূরের মত দুদিনেই উবে যায়, যদি তার উপরে একটি আচ্ছাদন না থাকে। সেই আচ্ছাদন হলো পাঠকের স্বীকৃতি।

যে-আনন্দ শুধু আমার, যেখানে আপনার অংশ নেই, তার মধ্যে তৃপ্তি কোথায়? একা আমি যা পেলাম সেটা নিছক ভোগ, অন্যের সঙ্গে ভাগ করে যা পেলাম, সেটা উপভোগ।

অনেক সময় দেখা গেছে, আমার কাছে আমার সৃষ্টির কোন মূল্য নেই, কিন্তু আপনার কাছে আছে। আমি কিছুই পেলাম না, আপনি তাকে গ্রহণ করলেন। সেখানে সেই গ্রহণই আমার পরম পাওয়া।

বিখ্যাত স্কটিশ লেখক এ. জে. ক্রোনিন যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'হ্যাটার্‌স্ ক্যাস্‌ল' লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ। ডাক্তার মানুষ; লেখার নেশা কোনকালে ছিল না। সাহিত্যিক

হবার দুরাশা কোনদিন পোষণ করেন নি। দীর্ঘ রোগভোগের পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে হাইল্যাণ্ডসে ঘুরছিলেন। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে অগত্যা একদিন কালি-কলমের শরণ নিলেন। একখানা উপন্যাস। একটু একটু করে এগুতে লাগলেন। মাঝামাঝি পৌঁছে মনে হলো, কিছুই হয় নি, আগাগোড়া সবটাই পণ্ডশ্রম। পাণ্ডুলিপিখানা ছুড়ে ফেলে দিলেন ডাস্ট্‌বিন্-এ। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন। এক চাষী প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা। ডাক্তারকে সে ভালবাসত। অসুস্থ শরীরে জলে ভিজছেন দেখে অনুযোগ দিতে লাগল। ক্রোনিন হয়তো বলতে চান নি; কিন্তু কথায় কথায় ভারাক্রান্ত মনের ব্যর্থতার ক্ষোভ আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। উপন্যাসের কাহিনীর একটা মোটামুটি খসড়াও জানিয়ে দিলেন সেই সঙ্গে।

চাষীর সাহিত্যজ্ঞান সামান্য। কিন্তু অত দিন ধরে যত্ন করে গড়ে তোলা একটা জিনিস নিজের হাতে নষ্ট করার মধ্যে যে বেদনা আছে, সেটা তার মনে লাগল। হয়তো সান্ত্বনাচ্ছলেই বলেছিল, বেশ তো হচ্ছিল লেখাটা। ফেলে দিলেন কেন?

বেশ হচ্ছিল! একজন অজ্ঞ কৃষকের এই সামান্য স্বীকৃতি যেন এক আশ্চর্য বল নিয়ে এল ক্রোনিনের প্রাণে। তখনই বাড়ি ফিরে এলেন, ডাস্ট্‌বিন থেকে উদ্ধার করলেন জলে-ভেজা কাগজগুলো, উনুনের ধারে শুকিয়ে নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করলেন লেখা। বই যখন বেরোল, রাতারাতি বেস্ট্-সেলার।

অকস্মাৎ জীবনের মোড় ফিরে গেল। স্টেথস্কোপ্ ছেড়ে বরাবরের জন্যে লেখনী আশ্রয় করলেন এ. জে. ক্রোনিন। সারা পৃথিবীর এক বিপুল পাঠকসমাজ তাঁকে তাঁর ডিস্পেনসারির অজ্ঞাত কোণ থেকে টেনে এনে বসিয়ে দিল সাহিত্যের আম-দরবারে।

লেখকের ভাগ্যবিবর্তনে পাঠকের দান অপরিসীম।

শোনা যায়, এর ঠিক উল্টোটা ঘটেছিল হতভাগ্য তরুণ কবি কীটস্-এর জীবনে। উত্তরকালে যাঁর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সমালোচকেরা

বায় দিয়েছিলেন, বেঁচে থাকলে এ কবি শেক্সপীয়রকে ছাড়িয়ে যেত, ছাব্বিশ বছর বয়সে ক্ষয় রোগে হলো তাঁর জীবনাবসান। দায়িত্বহীন সমালোচকের তীক্ষ্ণ আঘাত ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে কিছুই তিনি পেয়ে যান নি। যদি পেতেন, আমার মনে হয়, যে জীবন ও ধরণীকে তিনি অমন প্রগাঢ়ভাবে ভালবেসেছিলেন তার দ্বার থেকে হয়তো তাঁকে অত শীঘ্র বিদায় নিতে হতো না।

কিন্তু সব দেশেই একদল ব্যর্থ লেখক ও উন্নাসিক সমালোচক 'সাধারণ-পাঠক'কে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে থাকেন। 'জনপ্রিয়' শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে তার মধ্যে বেশ খানিকটা শ্লেষ না মিশিয়ে ছাড়েন না। তাঁদের মতে যে-বস্তু অনেকে পড়ে তার মধ্যে বস্তু নেই। কে জানে, 'অনেকে'র উপর এই অবজ্ঞার অন্তরালে কিঞ্চিৎ 'টক আঙ্গুর'-এর ক্ষোভ লুকিয়ে আছে কি না!

তাঁরা যাই বলুন, এ-কথা না মেনে উপায় নেই, বৃহৎ পাঠক-গোষ্ঠীর সাগ্রহ দৃষ্টি যিনি লাভ করেছেন, সে লেখক পরম ভাগ্যবান। যিনি শুধু কৌতূহল জাগাতে পেরেছেন, তিনিও মন্দভাগ্য নন। যিনি তাও পাবেন নি, চারদিক থেকে পেয়েছেন শুধু ঔদাসীন্য, তাঁর মত দুর্ভাগা আর নেই।

আজ থেকে দশ বছর আগে নিছক খেয়ালের বশে যেদিন 'লেখনী-ধারণ' করেছিলাম—কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না, লেখনীকে চালনা করেছিলাম তার স্বধর্ম থেকে পরধর্মে, 'ড্রাফ্‌ট, নোটিং আর সিগনেচার'-এর বাঁধা পথ থেকে অজানা পথে, 'সাহিত্য' নামক অজ্ঞাত ও নিষিদ্ধ রাজ্যের সীমানায়—সেদিন আমার মনশ্চক্ষে অনাগত পাঠকের যে-রূপটি ভেসে উঠেছিল, সেটা উদাসীনের রূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে কোল্ড্‌। তোষ নয়, রোষও নয়, নির্বিকার তাচ্ছিল্য। তার বেশি আর কোন প্রত্যাশা আমার ছিল না। কেমন করে থাকবে? লেখক তো রাতারাতি জন্মায় না। তার পিছনে দীর্ঘদিনের সাধনা চাই, চাই অবিশ্রান্ত অনুশীলন। সেখানে একটি

বৃহৎ শূন্য ছাড়া আর কোন মূলধন যার নেই, পাঠক মহারাজের দৃষ্টি-প্রসাদ দূরে থাক, দৃষ্টিপাতের সৌভাগ্যই বা আশা করবে সে কোন অধিকারে ?

তাছাড়া, কী তার বিষয়বস্তু! রাজ-রাজড়ার গৌরব-কাহিনী, অভিজাত সমাজ বা সুখী সংসারেব মধুর আলেখ্য, কিংবা বিশ্বনাথ কবিরাজ যাকে বলেছেন 'ধীরোদাত্ত সুমহান' মানব-গোষ্ঠীর কীর্তিগাথা অথবা আধুনিক মতে 'মেহনতী মানুষের জীবনযন্ত্রণা'—এর কোনটাকে অবলম্বন করে মহৎ সাহিত্য রচনার আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সে আসে নি। সে সুযোগ ও সামর্থ্য তার থাকলে তো ? লোকচক্ষুর অন্তরালে যে মসিলিপ্ত সঙ্কীর্ণ জীবনধারা যুগ যুগ ধরে অবরুদ্ধ হয়ে আছে, মানবতার প্রাথমিক স্বীকৃতি পর্যন্ত যেখানে গিয়ে পৌঁছয় নি, তারই ভিতর থেকে কয়েকটি খণ্ডচিত্র আহরণ করে, লৌহতোরণের একটা পাল্লা খুলে বাইরের পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিল। তার মধ্যে না ছিল চোখ-ধাঁধানো বর্ণ-সম্ভার, না ছিল তাক-লাগানো শিল্প-শৈলী। অত্যন্ত সাধারণ সুরে বলা কতগুলো অবাঞ্ছিত মানুষের কলঙ্কের কথা। সংসারে কার তাতে কী প্রয়োজন ? কোন্ কল্যাণ সে বয়ে আনবে সৎ ও সভ্য সমাজের দ্বারে ? কে শুনবে সে কাহিনী ? এই প্রশ্নটাই মনের মধ্যে মুখর হয়ে উঠেছিল।

দীর্ঘ আট বছর পরে কী পেলাম আর ন্যায়ত কী আমার পাওনা ছিল, মনে-মনে তার সালতামামির খসড়া করতে গিয়ে বারবার শুধু একটি কথাই মনে হচ্ছে—সংসারে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান! পাওয়া যে আমার প্রাপ্যকে এমন করে ছাড়িয়ে যাবে, কে ভেবেছিল ? যা পেয়েছি, তার মধ্যে কতটা প্রশস্তি আর কতটা দোষারোপ, সে প্রশ্ন আমার কাছে অবান্তর। কারা খুশী হয়ে জিন্দাবাদ দিয়ে গেছে, আর কারা রুষ্ট হয়ে নিন্দাবাদ শুনিয়ে গেল, তার হিসাবও অর্থহীন। সাড়া যে মিলেছে, সেইটাই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার। দীর্ঘদিন ধরে আমি যা দেখেছি, তার কথা

যেমন করেই বলে থাকি না কেন, সে বলা একেবারে ব্যর্থ হয় নি, সাধারণ মানুষের সংবেদনশীল হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি, তার চেয়ে বড় গৌরব আর কী থাকতে পারে? আজ মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞ অন্তরে এই কথাটি বলে যেতে চাই।

এ শুধু আমার ঋণস্বীকারের তাগিদ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছুটা জবাবদিহির দায়। আমার 'পাঠক-পাঠিকা' নামক কঠোর মনিবের কাছে জবাবদিহি।

কথাটা আর একটু খুলে বলা প্রয়োজন।

যে সব খ্যাতনামা ব্যক্তি লেখকদের কাছ থেকে ভুরি ভুরি বই উপহার পেয়ে থাকেন এবং প্রত্যুপহারস্বরূপ দরাজ হস্তে প্রশংসা-পত্র বিতরণ করেন, আমি তাঁদের কৃপা-লাভে বঞ্চিত রয়ে গেছি। সুতরাং প্রসিদ্ধ মাসিক বা সাপ্তাহিকের পাতায় ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত বৃহৎ-বৃহৎ 'অভিমত' শোভিত বিজ্ঞাপন আমার ভাগ্যে জোটে নি। আমার যারা পাঠক, তাদের বেশির ভাগই খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাহীন সামান্য মানুষ। বই তাদের অর্থমূল্যে সংগ্রহ করতে হয়, কাজেই না পড়ে ছাড়ে না। পড়ে, বন্ধুদের পড়ায় এবং ভাল-লাগা ও মন্দ-লাগা দুটোকেই প্রচণ্ড ভাবে প্রকাশ করে। সাধারণত সে প্রকাশ-স্থল—ক্লাব, হস্টেল, কলেজের করিডোর, পাড়ার লাইব্রেরী, রেলের কামরা কিংবা মেস বা পারিবারিক খাবার ঘর। যাদের উৎসাহ কিঞ্চিৎ প্রবল, তারা আর একটু এগিয়ে যায়, অর্থাৎ কালি কলমের আশ্রয় নেয়। না, সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ বা পত্রাঘাতের উদ্দেশ্যে নয়। সেখানে প্রথম বাধা—তারা সম্পাদকের প্রিয়পাত্র বা পরিচিত নয়, দ্বিতীয় এবং দুর্জয় বাধা, রচনাটা যার সম্বন্ধে সে-লোকটা কোন কাগজ-গোষ্ঠীর বশ্যতা স্বীকার করে নি, সুতরাং আনুকূল্য বা অনুগ্রহও পায় নি। তখন এই সব উৎসাহী পাঠক-পাঠিকার সামনে একমাত্র খোলা পথ—তাদের মনের কথাটি সরাসরি লেখকের কাছে তুলে ধরা। একখানা চিঠি। তার মধ্যে নিন্দা প্রশংসা অনুকূল বা প্রতিকূল আলোচনা যতটা থাকে, তার বেশি থাকে প্রশ্ন—'এটা কেন হলো, ওটা কেন

হলো না? অমুকের উপর কি আপনি অবিচার করেন নি? তমুক কি আর ফিরে আসবে না? ওর সঙ্গে তার মিলন ঘটালে কী দোষ হতো? যাই বলুন, নায়িকা চরিত্রের প্রথম দিকটার সঙ্গে শেষ দিকের সঙ্গতি-রক্ষা হয় নি, আপনি কী বলেন?' ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে সেই বিচিত্র প্রশ্নে ভরা চিঠির ঝাঁপি যখন খুলে বসি, ভারী কৌতুক লাগে, তার সঙ্গে বিস্ময়। ভেবে চিন্তে, গুছিয়ে, সাজিয়ে বলার যে মুন্সিয়ানা, তা কোথাও নেই। কতগুলো সরল নিরাভবণ আড়ম্বরহীন অন্তরঙ্গ ঘরোয়া উক্তি। কিন্তু তার প্রতিটি ছত্রে যে আন্তরিকতা ও সহজ রসানুভূতির স্পর্শ জড়িয়ে আছে, তার একটা কণাও কি পাওয়া যায় নামজাদা সাময়িক পত্রের ভাড়াটে সমালোচকের গাল চিবিয়ে বলা ধোঁয়াটে কিংবা জটিল মুরুব্বিয়ানার মধ্যে?

পুরনো চিঠির তাড়ার ভিতর থেকে কত অশ্রুত কণ্ঠ কানে আসছে। কোনোটা কোমল, কোনোটা কঠোর। কারো সুরে অভিভূতের উচ্ছ্বাস, কারো কণ্ঠে বিচারকের তীক্ষ্ণতা। কিন্তু এক জায়গায় সকলেই এক। সকলেরই কিছু জিজ্ঞাসা আছে।

একটি প্রশ্ন দেখছি অনেকের। বারংবার এসেছে, নানা আকারে এবং নানাজনের কাছ থেকে—'জেলখানার লোক হয়ে জেলের দরজা খুলে ধরলেন কোন্ সাহসে?' 'দরদ প্রীতি ও সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে যাদের দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন, তাদের কঠোর শৃঙ্খলার নিগড়ে বেঁধে রাখাই তো ছিল আপনার সরকারী কর্তব্য। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখলেন কেমন করে?' 'আপনার সহকর্মী, অনুকর্মী এবং উপর মহল—কে কী ভাবে নিলেন আপনার সাহিত্য কর্ম?' 'যে সব রূঢ় এবং স্পষ্ট কথা লিখে গেছেন, তার জন্যে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল কি?'

এই জাতীয় প্রশ্ন যাঁরা করেছেন, বুঝতে পারি তাঁরা অনেকেই আমার জন্যে উদ্বেগ বোধ করেছিলেন। কেউ কেউ হয়তো সরকারী

অফিসের লোক, সুতরাং ভুক্তভোগী। এঁদের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করছি। সকলেই জানেন, সরকারী দপ্তরখানার সব অংশটা প্রকাশ্য নয়। আজ যদিও তার আওতা থেকে দূরে সরে এসেছি, তবু যা গোপন, তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রাখতে চাই। তার দ্বারা হয়তো অনেক মুখরোচক তথ্যের স্বাদ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করছি। কি করি ; নিরুপায়।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে যে অলক্ষ্য জীবনস্রোত, আমার আগেও তার কিছু-কিছু অন্তরঙ্গ পরিচয় বাংলা সাহিত্যে রূপলাভ করেছে। তার মধ্যে অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির অভাব নেই। যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন রাজনৈতিক বন্দী। কারা-শাসনের সঙ্গে জড়িত আমিই বোধহয় প্রথম, যার মাথায় এই অদ্ভুত খেয়াল চেপেছিল। দুঃসাহসের কাজ, সন্দেহ নেই এবং দুঃসাহস মাত্রেরই ফলভোগ করতে হয়, আমাকেও হয়েছে। তার অপ্রিয় অংশটা যথাসম্ভব বাদ দিয়ে সেইটুকু শুধু বলি, যার মধ্যে জিজ্ঞাসিত প্রসঙ্গের সঙ্গে হয়তো কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সকালের 'ডাক' এসে পৌঁছল। একরাশ বাদামী রঙের লম্বা লেফাফা 'অন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট্ সার্ভিস'। তার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একখানি হাল্কা সবুজ চৌকো খাম, তার উপরে সুঠাম হস্তাক্ষর। রাবীন্দ্রিক ধাঁচের সঙ্গে মেয়েলি ঢংয়ের সংমিশ্রণ। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। পাঠিকার চিঠি। এর আগে কয়েকখানা মাত্র পেয়েছি। মোহ তখনো কাটে নি। খুলতেই যেন ধাক্কা খেয়ে স্বপ্নের জাল কেটে গেল। নিতান্ত অ-নারী সুলভ রূঢ় ভাষায় লিখেছেন জনৈকা কলেজের ছাত্রী—"লৌহকপাট পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখনি সন্দেহ ছিল, একজন জেল-কর্মচারীর কলম থেকে এমন সুন্দর সরস লেখা বেরোয় কি করে? পরে জেনেছি, আপনি একটি পাকা তস্কর, আর এক নম্বর জালিয়াৎ। এ বইয়ের

একবর্ণও আপনার লেখা নয়। একজন রাজনৈতিক বন্দীর ডায়েরি থেকে হুবহু টুকে নিয়ে নিজের নামে ছেপে দিয়েছেন। আমাদের বাংলার প্রফেসর মিস্—বলেছেন ক্লাসে। তাঁর ভাই জেলে চাকরি করেন, তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনা। এ-কথা আপনি অস্বীকার করতে চান?"

না, চাই না। কারণ, অস্বীকার করে লাভ নেই। একে অধ্যাপিকার উক্তি, তার উপর তাঁর ভাইয়ের সাক্ষ্য, তিনি আবার জেলের লোক—একজন কলেজের ছাত্রীর পক্ষে ডবল বেদবাক্য। আমার প্রতিবাদ সেখানে দাঁড়াবে কিসের জোরে?

ঠিক এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল আমার এক পরম শুভানুধ্যায়ী প্রাক্তন মনিবের কাছে। পিঠের উপর প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে বললেন, সাবাস! যেখানে যাই, শুধু তোমারি নাম, সেই সঙ্গে পয়সাও বেশ আসছে শুনলাম। তা (এবার গলা খাটো করলেন ভূতপূর্ব মনিব) ব্যাপারটা কা বল দিকিন? রাতারাতি লেখক হয়ে পড়লে কেমন করে? এসব মাল পেলে কোথায়?

এখানেও অস্বীকার করা বৃথা। তাই চোখে মুখে রহস্যময় খুশির হাসি ফুটিয়ে তুলে বললাম, পেয়েছি এক জায়গায়।

—"তাই বল", ভীষণ 'খুশী' হলেন ভদ্রলোক। পরক্ষণেই তাঁর সারা মুখে ঘনিয়ে এল নৈরাশ্যের কালো ছায়া। নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কি জানো? সবই হচ্ছে এই কপাল। তা না হলে আমি তো, বলতে গেলে, সারা জীবন ঐ স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চেই কাটিয়ে এলাম। রাত জেগে এক গাদা ডেটিন্যু আর স্টেট্-প্রিজ্নারের খাতা সেন্সর করে করে মাথা ধরাই সার হলো। আগাগোড়া সবটাই রাজনীতির কচকচি। অমন মিষ্টি গল্প কি একটাও থাকতে নেই!"

একদিন শুনলাম, 'লৌহকপাট'-এর আর একজন গ্রন্থকার আবিষ্কৃত হয়েছেন। ডেটিন্যু বা পলিটিক্যাল প্রিজ্নার নয়, আমারই জনৈক প্রীতিভাজন সহকর্মী ও বন্ধু। এক সময়ে এখানে ওখানে দুচারটে গল্প, প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ছবি আঁকেন, চমৎকার বক্তৃতা

করতে পারেন। তার ফলে ডিপার্টমেন্টের নীচের মহলে কিছু সংখ্যক ভক্ত লাভ করেছেন। তাদেরই একজন ছুটি নিয়ে গাঁটের পয়সায় রেল-ভাড়া দিয়ে তাঁর কর্মস্থলে গিয়ে এ রকম 'যুগান্তকারী গ্রন্থ-রচনা'র জন্যে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়ে এসেছে। বন্ধুটি রসিক ব্যক্তি। 'হাঁ' 'না' কিছুই না বলে মধুর হাসি দিয়ে ভক্তকে আপ্যায়িত করেছেন। তারপর আমার সঙ্গে যখন দেখা হলো, ব্যাপারটার সরস বর্ণনা দিয়ে যোগ করলেন, "ছদ্মনামের বিপদটা দেখলেন তো? কার নৈবেদ্য কে পায়!"

ছদ্মনাম নিয়ে একদিন কিন্তু সত্যিই এক 'বিপদ' ঘটবার উপক্রম হলো। আমার অফিসের এক কর্মীর সঙ্গে বন্ধুর আর এক ভক্তের তুমুল বিরোধ বেধে গেল। এ পক্ষেব হাতে অকাট্য প্রমাণ—ছাপাখানা থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল 'প্রুফ' আসতে দেখেছে তার 'সাহেবে'র নামে। ও-পক্ষ তা শুনবে কেন? তার 'হিরো' যে নিজে মুখে স্বীকার করেছেন, তিনিই গ্রন্থকার। (মৌন যে সম্মতির লক্ষণ, তার এমন নিদারুণ দৃষ্টান্ত বোধহয় আর কখনো দেখা যায় নি।) বচসা যখন হাতাহাতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, আশেপাশের লোকজন এসে ছাড়িয়ে দিল।

আমার চেয়ে কিছু সিনিয়র একজন 'দাদা'-স্থানীয় সহকর্মী একদিন লোক মারফৎ একটি প্রস্তাব পাঠালেন, যাকে রীতিমত লোভনীয় বলা চলে। বইয়ের দৌলতে আমি যে এরই মধ্যে 'লাল' হয়ে গেছি, এ 'খবরটা' তখন বিভিন্ন জেলের অফিসপাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। 'দাদা' নিশ্চয়ই তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং কিঞ্চিৎ প্রলুব্ধ হয়ে থাকবেন। বলে পাঠালেন, আমি যা জানি এবং লিখেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি চাঞ্চল্যকর মালমশলা তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। ইচ্ছা করলেই তিনি যে কোন সময়ে সেগুলো লিখে ছাপিয়ে ফেলতে পারেন এবং সে জিনিস হাতে পেলে আমার এই সব জ'লো কাহিনীর দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। সেই জন্যেই সে 'ইচ্ছা' সংবরণ করছেন। অনুজ-স্থানীয় বন্ধুর কোন অনিষ্ট হয়

এটা তিনি চান না। মালগুলো তিনি আমাকে দিয়ে দিতে পারেন, অবশ্য কিঞ্চিৎ বাণিজ্যের বিনিময়ে। টারম্‌স্‌ আমারই অনুকূল—ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি।

ভাবছি, সেদিন যদি সেই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতাম, 'দাদা'র দাক্ষিণ্যে আজ আমি কোথায়!

আর একজন বন্ধুও সত্যিকার বন্ধুর কাজ করেছিলেন। একটা সাধারণ খাম খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একখানা পাঁচ টাকার নোট, সেই সঙ্গে বিরাট চিঠি। তার সারমর্ম—আমার মত একজন প্রতিভাবান লেখককে লাভ করে সমস্ত কারা-বিভাগ গৌরবান্বিত, এবং তার সহকর্মী হবার সৌভাগ্যে তিনিও গর্বিত। দুঃখের বিষয়, এখনো আমার লেখার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নি। বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও স্থানীয় কোন দোকানে আমার বই পাওয়া যায় নি। সেই জন্য পাঁচটি টাকা পাঠালেন। বাকী প্রাপ্যের বিল সমেত দুখণ্ড পুস্তক যেন অবিলম্বে তাঁর নামে পার্সেল করা হয়।

আমি টাকা পাঁচটি মণিঅর্ডারে ফেরৎ দিয়ে সবিনয়ে জানালাম, আমার কোন বইয়ের দোকান নেই, সুতরাং টাকা গ্রহণে অক্ষম। বই দুখানা তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ পাঠাবার জন্যে কোলকাতায় প্রকাশককে নির্দেশ দেওয়া হলো।

পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, যে শহরে তিনি থাকতেন সেখানকার সবগুলো বইয়ের দোকানেই এ বই বিক্রী হচ্ছিল। স্থানীয় পাব্লিক লাইবেরিও একাধিক কপি সংগ্রহ করেছিল।

পরের খবর। বই উপহার পেয়ে বন্ধু যত্ন করে পড়েছিলেন এবং কতকগুলো বিশেষ বিশেষ জায়গা লাল পেন্সিলে চিহ্নিত করে সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, এমন এক বৃহৎ ব্যক্তির দরবারে যাঁর হাতে আমাদের জীবনমরণের কলকাঠি। তাঁকে পরিষ্কার করে বুঝিয়েছিলেন, জেলখানার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকেও এই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লেখক যেখানে সেখানে যথেচ্ছভাবে প্রচলিত কারা-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছে; বন্দীদের জন্যে যে-সব সংস্কারমূলক

বিধি-বিধান ও সুযোগ-সুবিধার প্রবর্তন করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তার উপর বক্র কটাক্ষ করেছে; বিশ্বস্ত কর্মী এবং সরকার নিযুক্ত সম্মানিত জেল ভিজিটরদের সম্বন্ধে মানহানিকর মন্তব্য করেছে; এবং চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাশদের উপর সস্তা দরদের ভান করে জেল-ডিসিপ্লিনের কোমর ভেঙে দিয়েছে—ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তিগত কারণে (সুতরাং অপ্রকাশ্য) বৃহৎ ব্যক্তিটি আমার উপরে আগেই রুষ্ট হয়ে ছিলেন। লালরেখাঙ্কিত লাইনগুলো সেখানে কিঞ্চিৎ ইন্ধনের কাজ করে থাকবে। বন্ধু তাঁর কাছ থেকে কী আশ্বাস নিয়ে ফিরেছিলেন, প্রকাশ পায় নি। তবে যে-রকম ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটে এসে আমার আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত দিয়ে সবিস্তারে সমবেদনা জানিয়েছিলেন, তার থেকে অনুমান করি, তাঁর দৌত্য একেবারে ব্যর্থ হয় নি।

প্রতিদিন নানা সূত্র থেকে নানা রকম ভয়াবহ খবর কানে আসতে লাগল। বোঝা গেল, আমার মাথার উপরে উদ্যত খড়্গ শাণিত হচ্ছে। কখন কি ভাবে এসে পড়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। যখন সত্যি সত্যি এল, তার আকার ও ওজন দেখে আমার বন্ধু ও তার দলবল তো বটেই, আমিও হতাশ হলাম। 'টার্ম' পুরো হবার আগেই আমাকে বড় জেল থেকে মফস্বলের ছোট জেলে বদলি করলেন কর্তৃপক্ষ। হয়তো এটাকেই তাঁরা 'শাস্তি' বলে ধরে নিয়েছিলেন। পদ বা পকেটে হাত না পড়লেও, বৃহৎ দায়িত্ব থেকে ক্ষুদ্র দায়িত্বে অবতরণ। কিন্তু চাকরির দিক থেকে যেটা 'শাপ', অন্য দিকে আমি তাকে 'বর' বলেই গ্রহণ করলাম। যে দুষ্কার্য ওঁরা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, অপেক্ষাকৃত নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে তারই খানিকটা বেশি সুযোগ পাওয়া গেল।

পরে শুনেছিলাম, তোড়জোড় যে ভাবে শুরু হয়েছিল, এত সহজে আমার নিষ্কৃতি পাবার কথা নয়। একজন ব্রিটিশ আমলের শীতল-মস্তিষ্ক ঝানু সিভিলিয়ান ক্রুদ্ধ মালিককে কিঞ্চিৎ বাস্তব জ্ঞান দান করাতে, ব্যাপারটা আর বেশীদূর গড়ায় নি। কোন্ আইনের কোন্

ধারায় ফেলে বইটাকে বাজেয়াপ্ত এবং তার লেখককে শায়েস্তা করা যায়, এই নিয়ে যখন গবেষণা চলছে, তখন ঐ ভদ্রলোক নাকি বলেছিলেন, 'তা হয়তো যায়। ও বেচারী আর কী করতে পারে? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়বে না। তবে আর একটা দিক ভাববার আছে। বইখানা যে রকম পপুলার হয়ে গেছে, ড্রাস্‌টিক্ কিছু করলে প্রেস্ আমাদের পেছনে লাগতে পারে।'

এর পরে বৃহৎ ব্যক্তিটি আর অগ্রসর হন নি। হয়তো প্রেস নামক গোলমেলে জিনিসটাকে ঘাঁটাতে যাওয়া সমীচীন মনে করেন নি, চক্ষুশূল লোকটাকে চোখের উপর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েই বোধহয় আপাতত মনের ঝাল মিটিয়েছিলেন।

আর একজন কর্তাব্যক্তির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেই বর্তমান প্রসঙ্গে দাঁড়ি টানতে চাই। তিনি যে দরের এবং যে স্তরের লোক, স্বাভাবিক রাস্তায় অর্থাৎ যাকে বলে নরম্যাল কোর্স-এ তাঁকে আমাদের পাবার কথা নয়। কি করে পেলাম, সেই ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু বলা দরকার।

শোনা যায়, তাঁকে নিয়ে ততটা না হলেও, তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে মহাকরণের উচ্চমহল বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। পাণ্ডিত্য অনেকেরই থাকে, কিন্তু সরকারী ফাইলের যেখানে সেখানে তার উগ্র প্রকাশ মন্ত্রী ও বিভাগীয় প্রধানদের ভাবিয়ে তুলেছিল।

মফস্বলে পাঠিয়েও মহাসমস্যা। যেখানে যে পদে যান, দুদিন যেতে না যেতেই নীচের মহলে গণ্ডগোল দেখা দেয়। কোথায় নাকি কোন্ একজন কেরানীর গাফিলতি উপলক্ষ করে সমস্ত কেরানী-কুলকে ডেকে এনে উপদেশচ্ছলে এমন সব বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত তারা দল বেঁধে তেড়ে এসেছিল। 'পাব্লিক'-হামলা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোন্ এক জায়গায় একদল ধর্মঘটী মজুরের জমায়েতে কার্ল মার্কস্, কেইন্‌স্ এবং হ্যারল্ড ল্যাস্‌কীর মতামত উদ্ধৃত করে এমন জ্ঞানগর্ভ, দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যে কুলীগুলো সেই ভয়েই, শুধু কাজ ছেড়ে নয়, ডেরা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, এবং মালিকপক্ষ এ হেন বিদ্বান ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা

পাবার আবেদন নিয়ে তখনই মোটর নিয়ে ছুটেছিলেন কলকাতায়।

এমনি করে নানা বিভাগে ঘুরবার পর ভদ্রলোক যখন সরকারের কাছে একটি দুঃসাধ্য 'প্রব্লেম' হয়ে উঠলেন তখন কোন সুরসিক উপরওয়ালার হঠাৎ মাথায় এল—লোকটাকে "জেলে পাঠিয়ে" দিলে কেমন হয়। যে কথা সেই কাজ। এক সপ্তাহ না যেতেই তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে জেলের ঘাড়ে এসে চাপলেন।

এই যে ব্যবস্থা হলো, তার মধ্যে সরকারের কৌতুক বোধ যেমন আছে, কূটনীতিও কম নেই। কারা বিভাগ এমন একটি রাজ্য, সেখানে আর যাই হোক 'পাব্লিক' নামক কোন বস্তুর মুখোমুখী হতে হবে না। বক্তৃতার পক্ষেও জেল অতি আদর্শ স্থান। শ্রোতারা ঘুমিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু পালিয়ে যেতে পারবে না।

মহাকরণ কর্তৃপক্ষ এতদিনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

কিন্তু সরকারী শাস্ত্রে এক্সপিরিয়েন্স বলে একটা বহু-ব্যবহৃত শব্দ আছে, চাকরির বেলায় বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের চেয়ে যাকে বেশী দাম দেওয়া হয়। আমাদের এই কর্তাব্যক্তিটি অন্য অনেক জায়গায় ঘুরলেও জেলের মুখ দেখেন নি। সুতরাং নতুন তক্তে বসাবার আগে তাঁর জন্যেও কয়েক-সপ্তাহ ব্যাপী একটা শিক্ষানবিসির ব্যবস্থা করতে হলো। উদ্দেশ্য—সেখানকার কাজকর্ম, রীতিনীতি এবং লোক-লস্কর সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়া।

ব্যবস্থাটা নতুন নয়। ইংরেজ আমলেও দেখেছি। তার আকার যেমন ব্যাপক, প্রকারও ছিল তেমনি সুষ্ঠু। জাঁদরেল জাঁদরেল সব মেজর, কর্নেল জেলের হাল ধরবার আগে সোজা গিয়ে ঢুকতেন সামান্য একজন ডেপুটি জেলরের ক্ষুদ্র সেরেস্তায়। তার পাশে টুল পেতে বসে প্রথম পাঠ নিতেন তার অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাছে।

এই সূত্রে আমাদের স্বনামধন্য খালেকদার কথা মনে পড়ল। কিঞ্চিৎ মোড়ফের হলেও বলে ফেলা যাক।

প্রথম জীবনে অনেকের মত আমিও একদিন তাঁর সাকরেদি করেছি। কিছু জানতে চাইলেই তিনি গম্ভীর ভাবে একটি প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক উক্তির পুনরাবৃত্তি করতেন—রিড, অ্যাণ্ড ইউ উইল নো। বলে, পনেরো কুড়ি বছর আগেকার বিশাল বিশাল সার্কুলার ফাইল পড়তে দিতেন। মই চড়ে ছাদ-সংলগ্ন র‍্যাকের উপর থেকে আধ ইঞ্চি পুরু ধূলোর স্তর ভেদ করে আমাদেরই সেগুলো পেড়ে আনতে হতো। এই জাতীয় কাজের জন্যে দু'তিন জন কয়েদী মোতায়েন ছিল। দাদা তাদের সাহায্য নিতে দিতেন না। বলতেন, এটাও ট্রেনিং-এর অঙ্গ। মই এবং ধূলোর ভয় করলে কাজ শেখা যায় না।

একবার একজন সদ্য-লড়াই-ফেরৎ আই. এম. এস. মেজরকে (যিনি দুদিন পরে ওঁর 'বস্' হয়ে বসবেন) খালেকদা ঐ একই আদেশ দিয়ে বসলেন। ভদ্রলোক পাঞ্জাবী, ছ'ফুটের উপর লম্বা ; প্রস্থটাও সেই অনুপাতে। উঠে গিয়ে চেরা বাঁশের তৈরি নড়বড়ে মইটাকে ধরে ঝাঁকানি দিতেই তার গোটা কয়েক ধাপ খুলে গেল। মৃদু হেসে দাদার দিকে চেয়ে বললেন, এখুনি যে খুনের দায়ে পড়তে, বাবু।

একটা বোগা মতন ছোকরা কয়েদী ছিল খালেকদার খাস বেয়ারা। অগত্যা তাকে দিয়েই বইগুলো নামিয়ে আনা হলো। সাহেব একটা খণ্ড তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ পাতা উল্টে বললেম, সব তো দেখছি মান্ধাতার আমলের ব্যাপার। কোন কাজে লাগবে এগুলো ?

খালেকদা দমবার পাত্র নন। বিজ্ঞের মত হাত মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন, 'এই যে বাড়িটা দেখছ সাহেব, যখন তৈরি হয়, এর তলায় একটা ভিৎ গড়তে হয়েছিল। এখন সেটা মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে, আমাদের কোনো কাজে লাগছে না। আসলে কিন্তু তারই ওপর সব দাঁড়িয়ে আছে। ঐগুলো হচ্ছে সেই ভিৎ।'

উনি তখন অ্যাড্‌মিশান ব্র্যাঞ্চ, অর্থাৎ 'আমদানী সেরেস্তা'র ভার-প্রাপ্ত ডেপুটি জেলার। সাহেব এসেছিলেন দেখতে, কি করে কয়েদী ভর্তি করা হয়, কি কি রেজিস্টার আছে তার জন্যে, কি সব তথ্য লেখা হয় সেখানে, কোনটার পর কি করণীয় ইত্যাদি। খালেকদা

জেল কোড্ এর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টি খুলে প্রথমেই তার শিরোনামা নিয়ে পড়লেন—অ্যাড্মিশান অফ প্রিজানার্স্; শুরু করলেন প্রিজনার্স্ জন্মের আগের পর্ব থেকে, অর্থাৎ প্রিজন্ বস্তুটি কী, কী তার প্রয়োজন, কোথায় তার সার্থকতা। যে-ভাষায় বলছিলেন সেটা ইংরেজি নিশ্চয়ই, তবে কিং'স ইংলিশ-এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। ওঁর নিজস্ব সৃষ্টি। আমরা বলতাম "খালেকদা'জ পেটেণ্ট ইংলিশ"। আমাদের মত অন্তরঙ্গ সহচর ছাড়া বাইরের লোকের পক্ষে বোধগম্য হবার কথা নয়। মেজর সাহেব কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, এক্সকিউজ মি, আই ডোণ্ট ফলো গ্রীক। বেটার স্পিক্ ইন্ বেঙ্গলি। হামি কুছ্ কুছ্ বাংলা বুঝে।

যাক, যা বলছিলাম। সরকারী আদেশে আমাদের এই জ্ঞানী ব্যক্তিটিও জেল-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ 'ট্রেনিং' নিতে প্রথমেই আমার অফিসে পদার্পণ করলেন এবং গেট্ পেরিয়েই জেলখানার প্রবীণ অধ্যক্ষ থেকে গোটা স্টাফকে ট্রেন-আপ করতে শুরু করলেন। আমরা এতকাল ধরে যা কিছু করেছি, যে-পথে চলেছি, সব ভুল, সজোরে ও সবিস্তারে সেই কথাই প্রমাণ করে দিলেন। শেষের দিকে যোগ করলেন, আমাদের মধ্যে যে সব দুর্নীতি, অনাচার ও অযোগ্যতা বাসা বেঁধে আছে, সেগুলো দূর করতেই সরকার তাঁকে বিশেষ ভাবে নিয়োজিত করেছেন। (নিয়োগের আসল কারণটা যে আগেই ভিতরে ভিতরে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল, সে কথা বোধহয় তাঁর জানা ছিল না।) আমার প্রায়-সাদা-হয়ে-যাওয়া চুলগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে এবং কত বছর জেলে আছি, জেনে নিয়ে মন্তব্য করলেন, গভর্মেণ্টও হয়েছে তেমনি; এক্সপিরিয়েন্স আর এক্সপিরিয়েন্স! ওটা যেন একটা ফেটিস্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার তো মনে হয়, অনেক দিন একই জিনিস নিয়ে পড়ে থাকা একটা ড্র-ব্যাক, আপনাদের সব ড্রাইভ চলে গেছে, ইনিশিয়েটিভ্ নেই, শুধু গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে চলছেন। আমাকে কিছু নিউ ব্লাড আমদানি করতে হবে

দেখছি। চলুন, ভেতরটা একবার দেখে আসি।

তাঁর আগমন সংবাদ জেলের ভিতরে পেঁাছে গিয়েছিল। শীতকাল। প্রচুর মবসুমী ফুল ফুটে আছে এখানে ওখানে। একজন মাতব্বর গোছের হাজতী আসামী কতগুলো বড় বড় গাঁদা তুলে বিশাল এক মালা গেঁথে রেখেছে। আমরা সদলবলে হাজত-ওআর্ডের বারান্দায় উঠতেই সে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। উনি থমকে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিনের জেল তোমার?

—আজ্ঞে, জেল নয়, আমি আণ্ডারট্রায়াল।

—কী কেস্-এ এসেছ?

—ডাকাতি কেস্।

—আমি ডাকাতেব হাতের মালা নিই না।

মুহূর্তের জন্যে লোকটা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলো। তারপরেই বেশ সপ্রতিভ হাসি হেসে বলল, ভুল করলেন, হুজুর। আমি যে ডাকাত সেটা এখনো প্রমাণ হয় নি। বলে, মালাটা হাতে জড়াতে জড়াতে গম্ভীর ভাবে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। উনি আর এগোলেন না। একটা দৃপ্ত ভঙ্গি করে ফিরে এলেন। বাইরে এসে বললেন, লোকটা তো ভারী পাজী দেখছি। আমার মুখের ওপর জবাব করে! এই সব বদমাশগুলোকে কড়া শাসনে রাখা দরকাব। হ্যাড আই বিন ইউ, আমি ওটাকে এখনই সেল্-এ পাঠিয়ে দিতাম।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হলেও আমি যখন সেটা না বোঝার ভান করে নিশ্চেষ্ট রইলাম, তিনি কিঞ্চিৎ শ্লেষের সুরে যোগ করলেন, আমার মনে হয় সফ্‌ট্‌নেস্ জিনিসটা সাহিত্যে হয়তো চলে, কিন্তু অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্-এর পক্ষে মারাত্মক। কী বলেন?

বুঝলাম, আমার 'অপকর্মে'র খবরটা আগেই ওঁর কানে পেঁাছে গেছে এবং তাতে করে আর যাই হোক, আমার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবটা অনুকুল হয় নি। কয়েকদিন পরে সেটা আরো স্পষ্ট হলো। ট্রেনিং পর্ব (কাগজে কলমে তাঁর, কিন্তু আসলে আমার)

যেদিন শেষ হল, চলে যাবার মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, ভালো অফিসার বলে আপনার সুনাম আছে শুনেছি, এ কদিনে আমার ইম্প্রেশানও নট্ ব্যাড্; কিন্তু এসব কী করছেন ?

বক্তব্যটা হঠাৎ ধরতে না পেরে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে মুখের দিকে তাকাতেই যোগ করলেন, এ-রকম একটা বদ নেশা জোটালেন কোত্থেকে! না না; ওসব ছাড়ুন। সেন্টিমেন্টাল সিনেমার গল্প না লিখে কাজকর্মের দিকে মন দিন।

একটু মজা করবার লোভ হলো। আনন্দে বিগলিত হয়ে বললাম, আমার লেখা আপনি পড়েছেন স্যার ?

—আমি!—এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন এর চেয়ে মানহানিকর অভিযোগ আর হতে পারে না। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমার সময়ের দাম আছে।

রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেখে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। ছদ্ম নৈরাশ্যের সুরে বললাম, আমি ভেবেছিলাম পড়ে থাকবেন হয়তো। তা না হলে সিনেমার গল্প লিখি জানলেন কেমন করে ?

—কেন ? আপনার কী একটা বই নাকি ছবি হয়েছে শুনলাম। একেবারে হিট্ পিকচার!

কথা নয়, একরাশ শ্লেষ ও অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিলেন আমার মুখের উপর। তার ফলে আমার ভিতরে আরো খানিকটা কৌতুক রস উথলে উঠল। মাথা নীচু করে ঘাড় চুলকে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, তার থেকে যদি বলেন, আমি সিনেমার গল্প লিখি, তাহলে কিন্তু, স্যার, সেক্সপীয়র, টলষ্টয়, ডিকেন্স, রবীন্দ্রনাথ, ডষ্টয়ভ্স্কি এবং নানা দেশের সব বড় বড় নোবেল প্রাইজ উইনার্সও সকলেই আমার দলে পড়বেন।

আমার দিকে একটা জ্বলন্ত ভ্রুকুটি নিক্ষেপ করে ভদ্রলোক গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেলেন। চোখের দৃষ্টি এবং গমনভঙ্গি দুইই এত সুস্পষ্ট যে তার অর্থ বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। এও বুঝেছিলাম, সেইখানেই শেষ নয়, জের অনেকদূর চলবে। তাই

চলেছিল। শুনছি নাকি, আমার বেরিয়ে আসবার পরেও চলছে। আমার এই বিদ্‌ঘুটে নামটা কিংবা সেই 'সেন্টিমেণ্টাল সিনেমার গল্প' যখনই তাঁর নজরে পড়ে, বিশেষ করে, জেল-লাইব্রেরির বইয়েব তালিকার কোনো কোণে—আশেপাশের সকলকে ইষ্টনাম জপতে হয়। এগুলো যেন প্রাণী বিশেষের কাছে লাল ন্যাকড়া বা রেড র‍্যাগ।

আর একটা মজার ঘটনা কানে এসেছে। বড় বড় জেলেব কয়েদীরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে বাইরে থেকে ফিল্ম আনিয়ে জেলে বসে সিনেমা দেখতে পায়। কোন্ জেল নাকি দুঃসাহসভরে সেই রেড-র‍্যাগ-চিহ্নিত ছবিখানা (যাকে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন হিট্ পিকচার) আনাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। শেষ মুহূর্তে খবর পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং শুনেছি, এ বিষয়ে যারা উদ্যোক্তা তাদেরও একহাত নিতে ছাড়েন নি।

প্রশ্নকর্তাদের কাছে আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন, এসব যা বলছি, তাকে যেন তাঁরা খেদোক্তি বলে মনে না করেন। আমার সামান্য সাহিত্য-কর্মের উপর মুষ্টিমেয়ের এই রোষদৃষ্টি আমি সানন্দে উপভোগ করেছি। এদের বাইরে যাঁরা, লেখার জগতে এসে যাঁদের পেলাম, তাঁদের কথা বলছি না, কর্মী হিসাবে যাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্নস্তর, বহুজনের কাছে যে সস্নেহ প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করেছি, তার কথাই মনে রয়ে গেছে। এক দিক দিয়ে ক্ষোভের কারণ যদি কিছু ঘটেও থাকে, আরেক দিকের প্রাপ্তি তার সবটুকু ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে। মানুষের জীবন তো একটা নিস্তরঙ্গ জলাধার নয়। সে নদীর স্রোতের মত গতিময়। ক্ষণেকের তরে কোন আবিলতা যদি আসেও, গতি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যে মানুষ জীবন্ত, তার পথ একটানা মসৃণ নয়, উত্থান-পতনে বন্ধুর। তার একদিকে যেমন অভিঘাত, আরেক দিকে তেমনি অভিনন্দন।

জেল-পরিধির বাইরেও একটা বিরাট সরকারী মহল আছে।

সেখানে কি প্রতিক্রিয়া হলো, সেটাও অনেকে জানতে চেয়েছেন। সে সম্বন্ধে বিশেষ করে বলবার মত কিছু দেখছি না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, সেখানকার দু-একজন হোমরা চোমরা প্রথম প্রথম আমাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তাকে ঠিক প্রসন্ন দৃষ্টি বলা চলে না। বড় শহরের ভিড়ের মধ্যে হয়তো আমার উপর তাঁদের নজর পড়ত না। কিন্তু থাকি মফস্বলে, তার উপর সাহিত্য করি। এখানে ওখানে সভা-সমিতিতে ডাক পড়ে। সভাপতিত্ব কিংবা প্রধান অতিথির প্রাধান্যও মাঝে মাঝে জুটে যায়। তার আগে এ জাতীয় সম্মানে একচ্ছত্র অধিকার ছিল সরকারী বড় কর্তাদের। স্বাধীনতার পরে সাধারণের চোখে তাঁদের সে জমক নেই। তা ছাড়া ইতিমধ্যে জনজীবনের আনাচে কানাচে সংস্কৃতি নামক একটি নতুন বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে, প্রাদুর্ভাব বলাই উচিত। তাকে বাদ দিয়ে কোন জমায়েত জমে না। তারই সূত্র ধরে সভামণ্ডপের উচ্চমঞ্চে রাজপুরুষের বদলে টান পড়ছে সাহিত্যিকের। সাহিত্যিক যেখানে বাইরে থেকে আমদানি, তাকে উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গোল বাধল —সে যে তাঁদেরই একজন। সুতরাং সরকারী কর্তৃমহলে সে প্রথমে চাপা কটাক্ষ, ক্রমশ প্রকাশ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

প্রথমটা একটু ক্ষুব্ধ হলেও পরে বুঝলাম এইটাই স্বাভাবিক। আমার অপরাধ তো একটি নয়। অফিসারস্ ক্লাবে চাঁদা দিই, কিন্তু ধরনা দিই না, কর্তাব্যক্তিরা যখন স-পারিষদ আসর জাঁকিয়ে বসে রাজা-উজির বধ করেন, মাথা নাড়ার দলে আমাকে পাওয়া যায় না, সন্ধ্যার পর তাস না পিটে 'অন্ধকার মাঠে ঘুরে বেড়াই কিংবা ঘরের কোণে বসে লিখি।' সবটাই বাড়াবাড়ি। সুতরাং ক্লাবে লাইব্রেরির বাৎসরিক 'পারচেজ'-এর সময় কয়েকজন তরুণ মেম্বার যখন 'লৌহকপাট'-এর নাম করে বসল, প্রবীণ সিনিয়ারদের কাছ থেকে এল এক দুর্জয় ধমক—কী আছে ঐ জেলের কেচ্ছায়? ও আবার একটা বই নাকি! নবীন সভ্যরা কিন্তু অত সহজে হঠতে চাইল না। বেশির ভাগই সদ্য বেরিয়েছে কলেজ থেকে, চাকরির অহিফেনে

ধাতস্থ হয়ে ওঠে নি। তখন রফা হলো—বিনা পয়সায় পেলে আপত্তি নেই। কেউ কেউ অভিযোগ করলেন, লেখক যখন ক্লাবের মেম্বার, তারই উচিত ছিল দু এক খণ্ড বই লাইব্রেরিকে প্রেজেণ্ট করা।

কদিন পরে ক্লাবে যেতেই কর্তৃস্থানীয় এক ব্যক্তি সেই ঔচিত্যের কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, এই যে! আপনাকে তো আজকাল দেখাই যায় না। হ্যাঁ, শুনুন, আপনাব নাকি একখানা কি বই আছে?

আমি মাথা নাড়লাম, আছে।

—ছাপানো বই?

কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না। বই তো ছাপানোই হয়ে থাকে। তিনি কি মনে করেছেন হাতে লেখা তালপাতার পুঁথি? জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। তার আগে অর্থটা তিনিই পরিষ্কাব করে দিলেন, 'মানে, বইটা কি পাবলিশ্‌ড্‌ হয়েছে?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি নিজেই বুঝি পাবলিশার?

—আজ্ঞে না।

—তবে?

পাবলিশারের নাম করলাম।

—ও, তাই নাকি! বেশ, বেশ। তা কই, এখানে তো দেখছি না আপনার বই। আমাদের লাইব্রেরিতে দু-একখানা দেবেন তো? মানে, যাকে বলে প্রেজেণ্টেশান।

প্রশ্ন ও প্রস্তাবের ধরনে আমার মাথায় হয়তো কিঞ্চিৎ দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হয়ে থাকবে। সবিনয়ে উত্তর দিলাম, দেখুন, দু রকমের লেখক বই প্রেজেণ্ট করে থাকেন। এক, যাঁরা অনুগ্রাহক, মনে মনে বলেন, আমার বই পড়ে তোমরা কৃতার্থ হও। দুই, যাঁরা অনুগ্রহপ্রার্থী, তাঁরা বলেন—আমার বই পড়ে আমাকে কৃতার্থ কর। আমি এর কোন দলেই পড়ি না। অতএব মাপ করবেন।

॥ দুই ॥

প্রথমটা চিনতে পারিনি। একটু ঠাহর করে দেখতেই মুখ থেকে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে এল, আপনি!

—ভাবছেন, এতদিন পরে খোঁজ পেলাম কি করে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, আপনার কি কোন অসুখ করেছিল?

—অসুখ? হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। করেছিল নয়, বছর সাতেক ধরে চলছে।

—বলেন কি! কী অসুখ?

—রিটায়ারমেণ্ট; আপনারা যাকে বলেন, অবসর-গ্রহণ। বলে, হেসে উঠলেন ভূতপূর্ব ভূতনাথ দারোগা। সেই আগেকার মত পিলে চমকানো ঝড়ো হাসি, শুধু তার বেগটা পড়ে গেছে। তারপর বললেন, চেহারা জিনিসটা দাঁড়িয়ে থাকে কিসেব ওপর জানেন? আপনি বলবেন ভালো স্বাস্থ্য, ভালো খাবার দাবার, যত্ন আত্তি, এই সব। 'অন্যের বেলায় হয়তো তাই। কিন্তু পুলিসের বেলায়—পোশাক। সেই খোলসটা যেদিন ছেড়েছি, সেদিন থেকে শাঁসও শুকোতে শুরু করেছে। যাক সে কথা। এটা নিশ্চয়ই আপনার কাণ্ড?

হাতে ছিল একটা খাঁকী কাগজে মোড়া প্যাকেট। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। মোড়ক খুলে ভেতরকার বস্তুটি সামনে ধরতেই আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। আমার সাহিত্যিক অপচেষ্টার এই নিদারুণ চিহ্নটি ভূতনাথ দারোগার নজরে পড়ে যাবে, স্বপ্নেও কি কোনদিন ভেবেছিলাম? এর ভিতরে ওঁর যে রূপটি ফুটে উঠেছে, তাকে মধুর বলা চলে না। কে জানে তার কোন্ রেখায় ফৌজদারি আইনের কোন্ মারাত্মক ধারা শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে আছে? ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে বলবে, দাও দশ হাজার টাকার ড্যামেজ, কিংবা মানহানির দায়ে চল শ্রীঘর।

না, ভূতনাথবাবু সেদিক দিয়ে গেলেন না। খুশির সুরে বললেন, কদিন আগে পুলিস-ক্লাবে গিয়েছিলাম। পুরনো আমলের জনকতক অফিসার এখনো আছে। মাঝে মাঝে গিয়ে বসি তাদের কাছে। মনটা ভালো থাকে। হাল আমলের ছোকরারাও খাতির যত্ন করে। তাদেরই একজন সেদিন একটা বই নিয়ে এসে বলল, 'এর থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেল।' আমার সম্বন্ধে! আমি তো অবাক। আমাকে নিয়ে আবার বই লিখল কে? ছাপিয়ে বের করবার মত এমন কী কীর্তি রেখে এলাম? তবে অনেক গরম গরম স্বদেশী-ওয়ালাকে ঠাণ্ডা করতে হয়েছে। তারই মধ্যে কেউ বোধহয় ঝাল ঝেড়ে থাকবে। বললাম, পড় তো শুনি। খানিকটা শুনেই বুঝলাম, আপনি। অনেকদিন এক স্টেশনে ছিলাম, এক সঙ্গে উঠেছি, বসেছি। কই, এসব বিদ্যা আছে বলে তো টের পাই নি। আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই।

ভয় কেটে গেল, কিন্তু বিস্ময় রয়ে গেল। যা লিখেছি, তাতে করে এতটা খুশী হবার কথা নয়। বললাম, আমার কিন্তু আশঙ্কা ছিল, আপনি রাগ করবেন।

—রাগ করব! কেন?

—আপনার সম্বন্ধে ভালো কথা তো কোনোটাই লিখি নি।

—আপনি হাসালেন দেখছি। আমি যা, তাই তো লিখবেন। বানিয়ে বানিয়ে ভালো ভালো কথা লিখলে খুশী হতাম ভাবছেন? না। ভূতনাথ দারোগা ভূতনাথ দারোগাই থাকতে চায়। নব্যতন্ত্রের বাবুদের মত মহাপুরুষ হতে চায় না। জানেন? দেশ স্বাধীন হবার পর পুলিস অফিসার মানে এক একটি খুদে মহাত্মা। বিষ তো গেছেই, ফণা পর্যন্ত নেই। সব ঢোঁড়া সাপ। আমার সেই মুষ্টিযোগগুলো ভুলেও কেউ ব্যবহার করে না। সে গাট্‌স্‌ নেই কারো। অথচ, আপনি তো জানেন, তার প্রত্যেকটা থেকে কী অব্যর্থ ফলটাই না পেয়েছি সেদিন।

কথাটা ঠিক। সাক্ষী তৈরী করা কিংবা কনফেশান আদায়

করবার যে কটি পেটেণ্ট ওষুধ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, ফলের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের রীতি পদ্ধতি তার কাছেও ঘেঁষতে পারে না। প্রয়োগ দূরে থাক, অনেক সময় নাম শুনিয়েই কার্যোদ্ধার হতো। নামকরণের মধ্যেও রীতিমত প্রতিভাব পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহৎ-যষ্টি-মধু-চূর্ণ ; তাতে যদি কাজ না হয়, দাও ডোজ কয়েক গুম্ফোৎপাটন রসায়ন কিংবা শ্মশ্রুচ্ছেদন বটিকা, স্থান কাল বুঝে কোথাও কোথাও মহানিমজ্জনী সুধা, চপেটাঘাত সহ সেব্য।

চোখের দিকে চেয়ে মনে হলো, ভূতনাথবাবু বোধহয় তাঁর অতীত কীর্তির গৌরবময় স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলে গভীর সুরে বললেন, সারাজীবন ধরে এত যে করলাম, কী পেলাম তার বদলে! একদিন হয়তো ঐ নামগুলোও লুপ্ত হয়ে যেত। সেই পরিণাম থেকে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, মিস্টার চৌধুরী। প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছেন।

হঠাৎ মুন্সীর কথা মনে পড়ল। বললাম, বদরুদ্দিন মুন্সীকে আপনার মনে আছে?

—নেই আবার! ঐ একটা লোক ছাড়া ভূতনাথ ঘোষাল সারা জীবনে কারো কাছে হার মানে নি। একবার নয়, বার বার। বড় আশা ছিল ব্যাটাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে পারবো। সে সুযোগ আর দিলে না। মুখের ওপর যেন থাবড়া মেরে চলে গেল। বাহাদুর বটে! মরে তো সবাই, অমন মরার মত মরতে পারে কজন?

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বহুদিনের ওপার হতে বদর মুন্সীর মরণাহত বীভৎস মুখখানা বিস্মৃতির পরদা ঠেলে চোখের উপর এসে দাঁড়িয়ে ছিল, ভেসে আসছিল তার সেই ভাঙাগলার আর্তনাদ —আমার সর্বস্ব দিয়েও কি তাকে বাঁচাবার উপায় নেই, হুজুর?

ভূতনাথবাবুর কথা কানে যেতেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। উনি বললেন, আর একটা লোককেও আমি মরদের মত মরতে দেখেছি। তবে তার ব্যাপারটা একেবারে আলাদা।

—বলুন না, শুনি।

ভূতনাথ হেসে বললেন, ও-ও, নতুন খোরাকের গন্ধ পেলেন বুঝি ? কিন্তু যা ভাবছেন, তা নয়। তাকে দিয়ে আপনার বিশেষ সুবিধে হবে না। আপনারা যাকে বলেন ড্রামাটিক, তেমন কিছু সে করে নি। কোনো মহত্ত্ব-টহত্ত্বও দেখায় নি, যে আপনার গল্প লেখার মশলা হবে।

চা এসে পড়েছিল। সেদিকটা দেখিয়ে বললাম, তা না হোক, চা-এর সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্ন্যাক্স্-এর কাজ করবে তো ?

—তা করতে পারে।

—তাহলে শুরু করুন।

ভূতনাথবাবু পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বললেন, বি. এ. পাস করে ল' কলেজে ঢুকেছিলেন নিশ্চয়ই ?

—আজ্ঞে না। ওদিকটা আর মাড়াই নি।

—বলেন কি ! দুপুরে এম. এ. সকালে ল'—আমাদের কালে এইটাই তো ছিল সাধারণ রেওয়াজ।

—আমাদেরও তাই। আমি কোনো রকমে এড়িয়ে গেছি।

—তাই আপনার চুলগুলো এখনো কিছু কাঁচা আছে। মহমেডান্ ল-এর সাক্সেশন চ্যাপ্টার মুখস্থ করতে হলে দশ বছর আগেই আমার দশা হতো !

—কেন, খুব জটিল ব্যাপার বুঝি ?

—জটিল মানে ? বাড়ির মুরগিটা পর্যন্ত ওয়ারিস ; তারও একটা ভাগ আছে। একবার কোনো মিঞা চোখ বুজলে হলো ; সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ জন দাবিদার। তিন চারটে বিবি, তাদের তিন ডজন ছেলেমেয়ে, বোন, ভাগনে, শালা, যে যেখানে আছে। তারপর শুরু হলো মামলা। দুনম্বর দেওয়ানি তো পাঁচ নম্বর ফৌজদারি। খুন, জখম, দাঙ্গা। তার জের যে কোথায় গিয়ে থামবে, কেউ বলতে পারে না। ঐ অঞ্চলের কথা বলছি, সারা জীবন যাদের মধ্যে কাটিয়ে এলাম। আপনিও তো বেশ কিছুদিন ছিলেন। অন্য দশ জায়গায়ও ঘুরতে হয়েছে। ঐ রকমটা দেখেছেন কোথাও ?

স্বীকার করলাম, দেখি নি। মামলা মোকদ্দমা সব দেশের

লোকেই করে। সাধারণত তাদের দৌড় ঐ আদালত পর্যন্ত। সেইখানেই শেষ ফয়সালা। কিন্তু ভূতনাথবাবুর দীর্ঘ চাকরি-জীবন এবং আমারও অনেকগুলো বছর এমন কতগুলো মানুষের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল যাদের অভিধানে 'হার মানা' বলে কোন শব্দ নেই, প্রতিশোধ যাদের নিত্য ধর্ম, এবং আক্রোশ মেটাবার কোনো পন্থাকেই যারা হীন বা অন্যায় মনে করে না। সে বিষয়ে তাদের উদ্ভাবনী শক্তিও অসামান্য।

একটা অভিনব খুনের মামলা মনে পড়ল। অতিশয় হুঁশিয়ার ব্যক্তি তোরাপ গাজী। বাড়িতে দোনলা বন্দুক। লোক ও লাঠি ছাড়া বাইরে বেরোয় না। দারুণ গ্রীষ্মেও জানালা খুলে শোয় না। সেদিন সদর থেকে মামলা জিতে খোস মেজাজে বাড়ি ফিরে পাল্লা দুটোয় খিল আটতে বোধহয় ভুলে গিয়েছিল। গভীর রাত্রে বিকট চিৎকার 'ইয়া আল্লা!' ঠিক বুকের উপর ফণা তুলেছে কাল কেউটে। লাফিয়ে উঠবার আগেই বসিয়ে দিল মোক্ষম ছোবল। 'বেলে বেলে জ্যোৎস্নায়' চোখে পড়ল, জানালা থেকে নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে একটা লম্বা বাঁশের চোঙা। বোঝা গেল সাপ উড়ে আসে নি, ছাদ থেকেও পড়ে নি। এসেছে ঐ বাঁশের ফোঁকর আশ্রয় করে। তার মধ্যেও ইচ্ছে করে ঢোকে নি নিশ্চয়ই। অনেক কৌশল করে বহু সাবধানে চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে একজন কেউ তাকে ঢুকিয়েছে। যাকে বলে সাক্ষাৎ যম নিয়ে খেলা। ভিতরকার মনোভাব হলো—যে কোন উপায়ে শত্রুতা-সাধন। শত্রুর প্রাণ নিতে গিয়ে নিজের প্রাণটা যদি যায়, ক্ষতি নেই। সে জন্যে তারা ভাবে না। একে শুধু রিভেঞ্জ্ বা প্রতিশোধ বলে ছোট করে দেখলে ভুল হবে। এ.এক উঁচুদরের জীবনদর্শন। হায়ার ফিলজফি অব্ লাইফ, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না। মনে হয়, অবাস্তব, অসম্ভব।

আরেকজন মামলাবাজ গ্রাম্য মাতব্বরের কথা শুনেছিলাম। অন্ধকার রাত্রে ঘরের বাইরে লোকের সাড়া পেয়ে 'চোর চোর' বলে লাঠি হাতে ছুটে বেরিয়েই 'মাগো' বলে এক লাফ এবং তারপরেই

'বাবাগো' বলে বসে পড়া। সঙ্গে সঙ্গে গগন-ভেদী আর্তনাদ। 'কী হলো গো' বলে দৌড়ে এলেন গৃহিণী এবং 'উঃ' বলে পা ধরে বসে পড়লেন চৌকাঠের উপর। ছেলে ছিল পাশের ঘরে। বুদ্ধি করে একটা টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিল। দেখল, বাবা মায়ের ঘরের ঠিক সামনে সাবি সারি পোঁতা আছে মোটা মোটা খেজুরের কাঁটা, ছুঁচলো মাথাটা উপবের দিকে। তারই দুটো বিঁধে আছে তার বাবার দু পায়ের তলায় এবং ধপ করে বসে পড়ার ফলে গোটা তিনেক তাঁর পরনের ধুতি ভেদ করে ইঞ্চিখানেক ভিতরে ঢুকে গেছে। চৌকাঠের আশ্রয় না জুটলে মায়ের অবস্থাও অনুরূপ হতো। তাঁর খোঁচাটা আপাততঃ শুধু পায়ের উপর দিয়ে গেছে।

যারা এসেছিল, তারা যে নিপুণ শিল্পী, কাঁটাগুলো বসাবার মধ্যেই তাব পরিচয় পাওয়া গেল। 'চুরি' নামক হেয় কর্মের মতলব নিয়ে তারা আসে নি, তাও বোঝা গেল। গৃহিণীর পায়ের কাঁটা খুলে দেবার পর তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, রান্না ঘরের তালাটা ভাঙা। ছেলের সাহায্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে দেখলেন, বাসন পত্র যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। হাঁড়িতে কিছু পান্তাভাত এবং কড়াতে কয়েক টুকরো ইলিশ মাছ ভাজা রেখেছিলেন, পরদিন প্রাতরাশের জন্য। অতিথিরা সেগুলো তাদের নৈশ ভোজনের কাজে লাগিয়েছে। কাঁটা-রোপণে সময় কম লাগে নি, অনেকটা মেহনৎও হয়ে থাকবে। ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। সেটা সঙ্গে সঙ্গে মেটাবার জন্যেই রান্নাঘরে ঢুকবার প্রয়োজন হয়েছিল। যাবার সময় সাড়া-শব্দটা ইচ্ছাকৃত। কর্তা-গিন্নী চোর মনে করে ব্যস্ত ভাবে ছুটে বেরোবে, এবং তারপর—।

এই ধরনের ব্যাপার আমি আর কতগুলো জানি? ভূতনাথ-বাবুর ভাণ্ডারে দুচার দশটা জড়ো হয়ে থাকবে। তারই একটা ঝাড়বার আয়োজন করলেন। চায়ের পেয়ালায় কয়েকটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বললেন, রহমৎগঞ্জের জব্বার মোল্লাকে ভোলেন নি আশা করি?

—কানা জব্বার?

—'কানা' কি বলছেন! ব্যাটা ঐ এক চোখে যা দেখত, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সহস্র চক্ষু দিয়ে তার চেয়ে একচুল বেশি দেখতেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে। সারাটা জীবন পুলিসকে নাস্তানাবুদ করে একদিন সে পটল তুলল। সেদিন জোড়াখাসির ফিস্টি হলো আমাদের ক্লাবে। সারারাত ধরে ডজন ডজন বোতল উড়ে গেল। সকালে গেলাম কণ্ডোলেন্স জানাতে। শুনলাম, সোনা দানা টাকা কড়ি বিশেষ কিছু না থাকলেও জমিজমা অনেক রেখে গেছে। স্বনামে বেনামে গোটা চরটাই প্রায় তার।

বললাম, হবে না? ডাকাতি তো একটা দুটো করে নি। আমার আমলেই তো—

—ভুল করলেন, বাধা দিয়ে বললেন ভূতনাথবাবু। ওর এক ছটাকও ডাকাতির রোজগার নয়। কিছুটা পৈতৃক আর বেশির ভাগ মামলা মোকদ্দমা করে জ্ঞাতিদের কাছ থেকে বাগিয়ে নেওয়া। ডাকাতিটা ছিল শখ। তার পেছনে বরং বেশ কিছু ঢালতে হতো।

—এত সম্পত্তি থাকতে ডাকাতি করে বেড়াত!

—করবে না? আগেকার দিনে রাজারা যে দিগ্বিজয়ে বেরোতেন, সবটাই কি লাভের লোভে কিংবা অভাবের তাড়নায়? ওটা ছিল তাদের ব্যসন। এদেরও তাই। খন্দটা ভালোয় ভালোয় উঠে গেছে। বড় বড় গোলা ভরা ধান, পাটের বাজার বেশ চড়া, রাখী কারবারেও মোটা রকম মুনফা এসেছে ঘরে। অতএব চল একটু বেরোনো যাক। সঙ্গে সঙ্গে চর চলে গেল গ্রামে গ্রামে সব শাঁসালো গেরস্তের খোঁজে। খবর এসে গেল— কার সিন্দুকে কি রকম মাল আছে, কার ঘরে যুবতী বৌ ঝি আছে, কোথায় কতটা বাধা পাবার সম্ভাবনা। তাই বুঝে দলবল জোটানো হল। রাতারাতি তেল পড়ল বন্দুকে, কাৎরা, বল্লম, ল্যাজা সড়কি শানিয়ে তোলা হলো। তারপর দিনক্ষণ দেখে শুরু হলো অভিযান। পুরোদস্তুর শিকার যাত্রা। তফাৎ শুধু লক্ষ্যের বেলায়। জন্তু-জানোয়ারের বদলে মানুষ।

যাক; যা বলছিলাম। জব্বারের সাক্ষাৎ ওয়ারিস অর্থাৎ ডিরেক্ট ডিসেণ্ডেন্ট্‌স্‌ বেশী নয়। এক জরু, এক ছেলে। জরুটি প্রথম পক্ষ, ছেলে দ্বিতীয় পক্ষের। তার আবার ছুটো বিবি আর তিন-চারটে অপোগণ্ড কাচ্চাবাচ্চা। বাড়ির সামনে খাল। তার ওপারে জব্বারের মেয়ের বাড়ি, আর একটু ওদিকে থাকে ভাগনেরা। তিন বাড়িতে ভাবসাব কোনোকালেই ছিল না। মামলা তু এক নম্বর প্রায়ই লেগে থাকত। তাহলেও জব্বারের সামনে জামাই বা ভাগনেরা মাথা তুলতে সাহস করে নি। ছেলে, অর্থাৎ কাদের মোল্লা বাপের স্বভাব আর চালটা কিছু কিছু পেয়েছিল, বুদ্ধিটা পায় নি। গোঁয়ার, বদরাগী, নানা রকম নেশা ভাঙে ওস্তাদ। খুন জখম আর মেয়েমানুষ-ঘটিত মামলায় কয়েকবার জড়িয়েও পড়েছিল। বাপের ভয়ে অন্য পক্ষ বেশী দূর এগোয় নি। তু-একটা ব্যাপারে থানা পর্যন্ত গড়ালেও কোর্টে ওঠে নি। আপনাব এলাকায় তাকে আসতে হয় নি কোনোদিন। এবার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল। জ্ঞাতি-কুটুম্ব পড়শীর দল জোট বেঁধে লাগল তার পেছনে। হাতে মারতে না পারলেও অন্ততঃ ভাতে মারতে হবে। নদীর ধার ঘেঁষে এক বন্দে অনেকগুলো জমি। ফি বছর সোনা ফলে। অনেকের নজর ছিল সেদিকে। তারই স্বত্ব নিয়ে লাগল মোকদ্দমা।

—কিন্তু ওগুলো তো ওর পৈতৃক সম্পত্তি।

—হলই বা। এতক্ষণ তাহলে শুনলেন কি? বাপের সম্পত্তি ছেলে পাবে—আইন কি অত সোজা? নানা রকম ফ্যাকড়া বেরোল। উকিলবাবুরা মওকা পেলেন। তাদের হাতে পড়ে যা ছিল জলের মত পরিষ্কার, তাই এবার তেলের মত ঘোলাটে হয়ে দাঁড়াল। ও পক্ষের পাণ্ডা হলো বোনাই। বোনাই বোঝেন তো?

হেসে বললাম, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। কথাটার জন্মস্থান হয়তো পূব অঞ্চল, কিন্তু পশ্চিমেও চলে। 'চলন্তিকা'য় চড়িয়ে পরশুরাম ওকে জাতে তুলে দিয়ে গেছেন।

—তাই নাকি। বিস্ময় প্রকাশ করলেন ভূতনাথবাবু। আমি

তো শব্দটাকে নেহাৎ গেঁয়ো বলেই জানতাম, আপনারা যাকে বলেন 'গ্রাম্য' অর্থাৎ ভাল্‌গার। যাই হোক, বোনাই, মানে তোফাজ্জল মানুষটি কিন্তু মোটেই গেঁয়ো নয়। লেখাপড়া জানে, দুপাতা ইংরেজিও পড়েছিল। পোশাকে-আশাকে আদব কায়দায় ভদ্র, মুখে হাসিটি লেগেই আছে। কখনো উত্তেজিত হয় না। অর্থাৎ বাইরে গোবেচারা, ভিতরে ভিতরে একটি দারুণ চীজ। ফল যা হবার হলো। একখানি একখানি করে জমিগুলো কাদের মোল্লার হাত ফসকে ও তরফে চলে গেল। নগদ টাকা পয়সা যৎসামান্য যা ছিল, সে তো গেছে প্রথম চোটে। কাদেরের অবস্থা তখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত, কিন্তু বোনাই-এর গায়ে দাঁত বসাবে, সে মুরদ নেই। তোফাজ্জল সে দিক দিয়ে অত্যন্ত হুঁশিয়ার।

জজকোর্টে একটা আপিলের মামলা চলছিল। কাদেরের খুব আশা ছিল, এটাতে তার জিত হবে। উকিলও অনেক ভরসা দিয়েছিলেন। কিন্তু রায় বেরোতেই বসে পড়ল কাছারির বারান্দায়। বসতবাড়ির ঠিক লাগোয়া আড়াই বিঘে সুপুরিবাগান বন্ধক রেখে কবে নাকি শ'খানেক টাকা ধার করেছিল জব্বার মোল্লা। সুদ সমেত মোটা টাকার ডিক্রি পেয়েছেন হালদারবাবুরা। মানে বাগানটি গেল। তোফাজ্জল এসে শ্যালকের হাত ধরে টেনে তুলল, আহা, অমন ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন ভাইজান? বাড়ি চল। জজের ওপরে জজ আছে। টাকার জন্যে ভেবো না। আমি তো এখনো বেঁচে আছি।

আসল খবর সবাই জানত। হালদারদের সঙ্গে যোগসাজশে মামলাটা দায়ের করেছে তোফাজ্জল। ধারের কাহিনী মিথ্যা, দলিলটাও জাল। কাদের এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। দুচোখ থেকে ঠিকরে পড়ল আগুনের জ্বালা। বোনাই সকলের অলক্ষ্যে মুচকি হেসে সরে গেল।

বাড়ি ফিরতে কাদেরের রাত হলো। সমস্ত পথ শুধু একটা কথাই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে—শোধ নিতে হবে। কিন্তু কেমন

করে ? কত রকমের আজগুবি উপায় মনে হয়েছে। সবটাই তার সাধ্যের বাইরে।

ছোট ছেলেটা বছর পাঁচেকের। জেগে বসে আছে, বাপ কখন আসবে। সদরে গেছে, একটা কোনো মিঠাই হাতে করে ফিরবে নিশ্চয়ই। বলেও দিয়েছিল যাবার সময়—বাপজান, আমার জন্যে লজেঞ্চুশ আনিস।

সাড়া পেয়ে ছুটে আসতেই কাদের ছেলেকে ঠেলা মেরে ফেলে দিল। পড়ে গিয়ে যেমনি কেঁদে ওঠা, পিঠের উপর বসিয়ে দিল চড়। ছেলের মা এল ছাড়াতে। ফোড়ন-টোড়ন কিছু একটা কেটে থাকবে হয়তো। তাকেও তেড়ে গেল। ছুটে না পালালে ঐখানেই খুন-জখম যাহোক একটা ঘটে যেত। মা বুড়ি ঘরে শুয়ে কাতরাচ্ছিল। নানা রোগে ভুগে ভুগে হাড্ডিসার চেহারা। সৎমা হলেও কাদের বুড়িকে বিশেষ হেলাফেলা করতো না। দূরে কোথাও গেলে, ফিরে এসে খোঁজ নিত, মা কেমন আছে। আজ গোঁজ হয়ে বসে রইল দাওয়ার ওপর। মা কয়েকবার ডাকতে রেগে মেগে ঘরে ঢুকে খেঁকিয়ে উঠল, ডাকাডাকি করছ কিসের জন্যে ?

মামলার ব্যাপারে মায়ের মনে উদ্বেগ ছিল। ছেলের হাবভাব থেকে ফলটা আন্দাজ করতে পারলেও সেই কথাই জিজ্ঞেস করল। কাদের কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পেছন থেকে কানে গেল, মা বলছে, 'এত লোক মরে, খোদা আমাকে একবার চোখে দেখে না।'

অতি মামুলী আপসোস। কথাগুলোও নিতান্ত সাধারণ। বুড়ো বয়সে কখনো কোনো ক্ষোভের কারণ ঘটলে, সবাই একবার আওড়ায়। মায়ের মুখ থেকে কাদের নিশ্চয়ই আরো অনেকবার শুনে থাকবে। কান দেয় নি। আজ কী মনে করে থমকে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে মা-র বিছানার পাশে বসল। কোনো কথা বলল না। ছটো জ্বলন্ত চোখ শুধু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই তোবড়ানো গাল, ছানি পড়া চোখ, আর ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার দিকে।

ছেলের সেই চাউনি দেখে বুড়ির শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলল, অমন করে কী দেখছিস?

কাদের জবাব দিল না। আপন মনে বিড় বিড় করে আউড়ে গেল, 'হ্যাঁ, আর বেশীদিন নেই।' আরো কিছুক্ষণ বসে বসে কী ভাবল। তারপর মায়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, আমার একটা কথা শুনবে?

বুড়ি আরো ভয় পেল। ছেলেকে সে চেনে। যা বলে সোজা-সুজি, ভূমিকা করা তার অভ্যাস নেই। জিজ্ঞেস করল, কী কথা?

—যা দেখছি, তোমার ডাক এসে গেছে। যেতে যখন হবেই তার আগে আমার একটা উব্‌গার করে যাও না কেন?

—উব্‌গার! আমি কী উব্‌গাব করবো তোর! সে সাধ্যি যদি থাকত—

—আছে সাধ্যি। তুমি ইচ্ছে করলেই পার।

বুড়ি কিছুই ভেবে পেল না, ছেলের কী উপকার সে করতে পারে। কাদের উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ফিরে এসে মায়ের আরো খানিকটা কাছ ঘেঁষে বসল। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলল, কাগপক্ষী কেউ জানবে না, খালি তুমি আর আমি। ব্যস্।

বুড়ি বিরক্ত হয়ে উঠল, কী চাস, খুলে বলবি তো, না কি?

কাদের তখনো ঠিক আসল কথায় গেল না। বলল, এই যে আমরা ভরগুষ্ঠি পথে বসতে চলেছি, কার জন্যে তুমি তো জান।

—জানি বই কি বাপজান, জেনে কী করবো? খোদা এর ইনসাব করবে। এসব জমি-জমা পুকুর বাগান কিছুই ওদের ভোগে লাগবে না। তুই দেখে নিস।

—খোদা কি করবে না করবে, সে ভরসায় আর বসে থাকা চলে না। আমি আর থাকতে পারছি না। হাত দিয়ে ছাখ, আমার সারা কলজেটা দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে।

মায়ের একটা হাত খপ করে তুলে নিয়ে চেপে ধরল বুকের উপর। তারপর নামিয়ে রেখে বলল, আমার মুখের গ্রাস ঐ শালার

শালা কেমন করে বসে বসে খায়, আমি একবার দেখে নেবো।

বুড়ি নিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। বুঝল, এ শুধু নিষ্ফল আস্ফালন, নিরুপায়ের যা একমাত্র পথ। এ করেও যদি কিছু সুখ পায় তো পাক। তোফাজ্জলের দাড়ি ওপড়ানো দূরে থাক, এক গাছা চুলে হাত দেবার, আপনারা যাকে বলেন কেশ-স্পর্শ করবাব মত ক্ষমতা যে ওর নেই সে কথা সবাই জানে।

বুড়ির বিছানা যেখানটায়, তার উল্টো দিকের দেওয়ালে এক-খানা ছোট সাইজের রামদা ঝোলানো ছিল। সেই দিকে হাত তুলে কাদের বেশ সহজ ভাবেই বলল, শোনো মা, ঐ যে দা-টা দেখছ, ওটা দিয়ে আমি তোমার গলায় একটা কোপ মারবো।

মা আঁতকে উঠতেই ভরসা দিল, ভয় নেই, এমন ভাবে মাববো যে আমার চেঁচানি শুনে লোকজন যারা আসবে, তাদের কাছে যেন বলে যেতে পারো, কোপটা মেরে গেল তোফাজ্জল। মুখে না বললেও চলবে। আমি ঐ বলে চেঁচাবো, তুমি খালি মাথা নেড়ে সায় দেবে। …পারবে না?

মা চুপ করে আছে দেখে বলল, আচ্ছা, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। যা কববার আমিই করবো।

বুড়ির অবস্থা কল্পনা করুন। ছেলেকে যদি না চিনত, মনে করতে পারত সে ঠাট্টা করছে। কিন্তু এটা যে ঠাট্টা নয়, ছেলের যে রকম মতি গতি, কাজটাও তার পক্ষে বিশেষ কঠিন হবে না, সবই বুঝল। কান্নাকাটি করে লাভ হবে না, পালাবে যে সে উপায়ও নেই। জবাই করবার আগে গরুগুলো যে চোখে তাকায়, তেমনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

কী একটা হয়তো বলতে গিয়েছিল, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। কাদের বলল, তুমি ভাবছ, লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তোমার ঐ তেঁতুলতলার জমিটা যে সে হাত করতে চায়, সে জন্যে কয়েকবার এসে তোমাকে ফুঁসলে-ফাঁসলে সাদা কাগজে টিপ সই নেবার চেষ্টা করেছে, সে খবর কে না জানে?

এতক্ষণে কথা সর্‌ল বুড়ির গলায়। বোধ হয় আশা হলো টিপ যখন সে দেয় নি, গলাটা এ যাত্রা বাঁচতে পারে। চোখের জল মুছে ভাঙা গলায় বলল, তোর মুখ চেয়েই আমি রাজী হই নি।

-হও নি বলেই তো সুবিধে। সবাইকে বোঝানো যাবে, সেই জন্যেই তোমার ওপরে তার আক্রোশ।

বুড়ি এবার ডুকরে কেঁদে উঠল। কপাল চাপড়ে স্বামীর উদ্দেশে ইনিয়ে বিনিয়ে কী সব নালিশ জানাতে যাচ্ছিল। ছেলের দিকে নজর পড়তেই মাঝপথে থেমে গেল। কাদের মুখে কিছুই বলল না। ডান হাতের এই আঙুলটা একবাব ঠোঁটের উপর রেখে দুচোখে আগুন ছড়িয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

পরদিন রাত প্রায় আটটা। কাদের মোল্লার বিকট কান্নায় গোটা পাড়াটা কেঁপে উঠল।

আমি বললাম, পরদিনই!

কথাটায় হয়তো কিছু বিস্ময় প্রকাশ পেয়ে থাকবে। কিংবা অজ্ঞাতসারে কোনো আঘাত। ভূতনাথবাবু একটা আধপোড়া চুরুট ধরাচ্ছিলেন। কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে একরাশ কড়া ধেঁায়া ছেড়ে বললেন, তবে কি? সাতদিন ধরে প্ল্যান আঁটবে, এই বুঝি আপনি আশা করেছিলেন? অতখানি কাঁচাছেলে সে নয়। এসব কাজ ফেলে রাখলেই নানারকম বাধা বিঘ্ন এসে জোটে, এই সোজা কথাটা সে জানত। তবু যে একটা দিন দেরি করেছিল, সে শুধু বাধ্য হয়ে। এক নম্বর, এ রকম ঘটনা ঘটাবার জন্যে রাতের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আর দুনম্বর, ব্যাপারটাকে পাকাপোক্ত ভাবে দাঁড় করাতে গিয়ে একটা—কী বলবো, রোমান্সের সুবিধে নিতে হয়েছিল। পুরনো রোমান্স।

এবার সত্যিই চমকে উঠলাম। এত বড় বীভৎস কাণ্ডের মধ্যে 'রোমান্স!'

ভূতনাথবাবু আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বললেন, এক্ষেত্রে আর

অবাক হবার কী আছে? রোমান্স কোথায় নেই বলুন। ওর কি স্থান কাল আছে, না পাত্রাপাত্রের ভেদ আছে? কেন, ঐ বইটা পড়েন নি? কী নাম যেন। দাঁড়ান·· বেশ নাম করা লোকের লেখা···শ্রীকান্ত। পড়েছেন নিশ্চয়ই?

বললাম, তা পড়েছি। কিন্তু এটা তো আপনার জুরিস্‌ডিকশন নয়। ওসব বই-এর খোঁজখবর—

—আমি পেলাম কি করে, এই বলবেন তো? কী করবো, মশাই! বেকায়দায় পড়লে বাঘেও ঘাস খায়। ভূতনাথ দারোগাকেও বাংলা নভেল পড়তে হয়। আমাব নতুন বৌমাটি একটি নাটক নভেলেব পোকা। বদভ্যাসটি সে-ই ধবিয়েছে। প্রথমে ছিলাম চিনির বলদ। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে তার ফরমাশ মত বই নিয়ে আসা আর পড়া হয়ে গেলে পেঁাছে দেওয়া। ভেতরে কী আছে, পাতা উল্টে দেখি নি। কিন্তু আমার খুদে মা-টি রীতিমত নাছোড়বান্দা—'এই গল্পটা একটু পড়ে দেখুন না, বাবা'; 'শুনুন, কী চমৎকার লিখেছেন ভদ্দরলোক!' এমনি করে করে এখন এমন অবস্থা হয়েছে, যে দুপুরবেলা খেয়ে উঠে ওরই যে কোনো একটা টেনে নিয়ে দু-চারপাতা না ওল্টালে ঘুম আসতে চায় না। একদিন হাতে এসে গেল শ্রীকান্ত। ওর আবার অনেকগুলে পর্ব আছে। সেটা কোন্ পর্ব বলতে পারবো না। আপনার হয়তো জানা আছে। ঘটনাটা হলো—কোথায় যেন নতুন রেল-লাইন বসানো হচ্ছে। মাটি-কাটা কুলী এসেছে এক দঙ্গল—নানাবয়সের মেয়ে পুরুষ, কাচ্চা বাচ্চাও কম নয়। কতগুলো ছাদখোলা ওয়াগন হচ্ছে তাদের আস্তানা। এক একটা মধ্যে দু-তিনটে করে সংসার। কাছে পিঠে কোথাও মুখে দেবার মত জল নেই, অন্য সব স্যানিটারি অ্যারেঞ্জমেণ্ট্‌স কাগজে কলমে ছিল নিশ্চয়ই, কাজের বেলায় না-ই বা রইল। যা হয়ে থাকে। গরমের দিন। শুরু হলো কলেরা। একই গাড়ির একপাশে লোক মরছে, আর তার থেকে দু-হাত দূরে একটিপেয়ার—কাঁচা বয়স নিশ্চয়ই—সারারাত ধরে চালিয়েছে উৎকট

রোমান্স। নায়ক রুগীর কাছে বসে। তারই চোখের ওপর পাশাপাশি এই দুই দৃশ্য।

বললাম, ও তো গল্প।

—গল্প বলেই একটু রেখে ঢেকে আব্রু বাঁচিয়ে বলেছেন লেখক। আসলে যা ঘটে, সে তো আরো উৎকট। আমার নিজের পাড়াতেই দেখুন না? ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। স্বামীটি মরমর, ছেলেমেয়েরা যে যার মনে আছে, একটা ছাব্বিশ সাতাশ বছরের মাসতুতো না পিসতুতো ভাইকে বগলদাবা করে রাত দশটা অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কখনো দোকানে দোকানে, কখনো নির্জন নদীর ধারে, কখনো অন্ধকার মাঠে। বাড়ি এসেও রাত দুপুর পর্যন্ত দুজনে মিলে গানবাজনা, হৈ হুল্লোড়।

—আপনাদের পাড়ায় ছেলে-ছোকরা নেই?

কথাটার সুরে বোধহয় কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ পেয়ে থাকবে। ভূতনাথবাবু ছদ্ম গম্ভীরভাবে বললেন, নাঃ, আপনি দেখছি এখনো রিয়ালিস্টিক রাইটার হতে পারেন নি। অল্পেতেই নীতিবোধ চাড়া দিয়ে ওঠে। ছেলে-ছোকরারা কী করবে? এদিকে যে আবার ভাইবোন। তবে হ্যাঁ করত, মহিলাটি যদি তরুণী হতেন। তখন ঐ ছেলেটা হত ওদের রাইভ্যাল। এখন ওকে পিটি করে। আহা, বেচারা! সবাই মিলে নাম দিয়েছে ল্যাং-বোট।...যাক, যে রোমান্সের কথা বলতে গিয়ে এতখানি ভনিতা, সেটা এবার শুনুন।

কাদের মোল্লার ছোট বিবি ফতিমা খালের ওপারের মেয়ে, তোফাজ্জলের কী রকমের বোন। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুটা আশনাই ছিল। সাদিও হয়ে যেত। কোন একটা ব্যাপারে জব্বার জামাইকে *জব্দ* করবার জন্যে মেয়েটাকে একদিন ছোঁ মেরে নিয়ে এসে রাতারাতি ছেলের বৌ বানিয়ে ফেলল। কিন্তু প্রথম বয়সে মনে যে রঙ লাগে তা কি অত সহজে মোছে? ওদের অন্তত মোছে নি। কাদের সে কথা জানত, কিন্তু কিছু মনে করত না, বরং

মাঝে মাঝে সেটা কাজে লাগাত। তোফাজ্জলের কাছ থেকে কোনো কিছু সুবিধে আদায় করতে হলে সে ভার পড়ত ঐ দু-নম্বর বিবির ওপর। তাছাড়া তার হাত দিয়ে যখন তখন মাছটা মুরগীটা, কখনো-সখনো হঠাৎ দরকারে লুঙিটা জামাটাও আসত। ঘটনার দিন দুপুরবেলা, বেরোবার নাম করে কাদের ছোট বৌকে দিয়ে বোনাই-এর একটা লুঙি আনিয়ে নিয়েছিল। ফতিমা নিশ্চয়ই খুশী হয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়েছিল। বাঁশের সাঁকোটা পেরোতে অন্যের যদি লাগে পাঁচ মিনিট, তার হয়তো তিন মিনিটের বেশী লাগে নি। এই সুযোগে একবার কাছে আসা, দু একটা কথা, একটুখানি হাসি। সেদিন অবিশ্যি তার কোনোটাই হয় নি। তোফাজ্জল তখন বাড়ি ছিল না। ফতিমা কাউকে কিছু না জানিয়ে বাইরের উঠোনে দড়ির ওপর থেকে লুঙিটা টেনে নিয়ে তেমনি ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছিল। কাদের দাঁড়িয়ে আছে, দেরি হলে বকুনি খেতে হবে।

ভূতনাথের কাহিনীতে এইখানে হঠাৎ একটু ছেদ পড়ল।

কারণটা বুঝতে না পেরে চোখ তুলে দেখলাম, তিনি জানালার বাইরে চেয়ে আছেন। মিনিটখানেক পরে ফিরে বললেন, আচ্ছা, মিস্টার চৌধুরী, আপনি তো একজন লেখক। বলুন তো, লুঙি নিয়ে ফিরে আসতে আসতে কী ভাবছিল ফতিমা?

আমি হেসে বললাম, লেখকরা কি হাত গুণতে জানে?

—হাত গুণতে হবে কেন, মন গুণে বলুন।

—আমি এখনো তত বড় লেখক হতে পারি নি।

—আমি কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্ছি, মৃদু এবং অনেকটা আবেশময় সুরে বললেন ভূতনাথবাবু, লুঙিটা পাড়তে গিয়ে মেয়েটার ঠোঁটের কোণে একটু দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠেছিল। মাথা নেড়ে মনে মনে বলেছিল, বেশ মজা হবে। বাড়ি এসে খুঁজে পাবে না, ভাববে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। একে ডাকবে, ওকে বকবে, তারপর যখন জানতে পারবে কে সেই 'চোর', তখন?…পরের অবস্থাটা মনে

মনে কল্পনা করে তার মুখখানা নিশ্চয়ই রাঙা হয়ে উঠেছিল। হয়তো একা একা খিল খিল করে হেসে উঠেছিল সেই নির্জন খালের ধারে। কী বলেন ?

আমি উত্তর দিলাম না। আমার চোখের সামনে যে নতুন ভূতনাথ দারোগা বসে আছেন, নিজের চোখে দেখেও যার এই রূপান্তর অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছিল, তারই মুখের পানে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম।

তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন, এমনি ভাবে অনুচ্চ সুরে বললেন, নিতান্ত সরল ছেলেমানুষ মেয়েটা। সে কেমন করে জানবে, সামান্য একটা লুঙির মধ্যে কত বড় সর্বনাশ সেদিন লুকিয়েছিল। একদিন যাকে সে মন দিয়েছিল এবং তার পরেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি, তাকে নিয়ে এই ছোট্ট লুকোচুরির রঙিন লোভটুকু সে ছাড়তে পারে নি। এ যদি পাপ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত সে নিজের জীবন দিয়ে করে গেছে।

অজ্ঞাতসারে চমকে উঠলাম, কী করেছিল ? আত্মহত্যা ?

—তার কথা যখন আসবে, তখন বলবো। আপাতত আসুন, কাদেরের কাছে ফিরে যাওয়া যাক।

মরা-কান্না শুনে আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এসে দেখল, কাদের মোল্লা মায়ের পায়ের ওপর পড়ে মাথা খুঁড়ছে। দু-দুটো বিবি তাকে ধরে রাখতে পারছে না। বুড়ির ঘাড়ের বাঁ দিকের প্রায় আদ্ধেকটা নেমে গেছে। বালিশ বিছানা রক্তে লাল। রামদাটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে শিয়রের কাছে। শোকের বেগটা একটু পড়ে এলে কাদেরের মুখ থেকে যে বয়ান বেরোল তার থেকে জানা গেল, পাশের গাঁয়ে কোন্ দোস্তের বাড়ি তার দাওয়াৎ ছিল। বাড়িতে মায়ের অসুখ, তাই খেয়ে উঠে আর দাঁড়ায় নি। জোরে পা চালিয়ে, যখন ফিরবার কথা, তার আগেই ফিরে এসেছে। বাড়ি ঢুকে, মায়ের কান্না আর তার সঙ্গে পুরুষ

মানুষের গলায় চাপা ধমকানি শুনে তাড়াতাড়ি দরজার সামনে এসে যা দেখল, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। তার নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারে নি। যতই দুশমনি থাক, তাই বলে শাশুড়ি, আর ঐ রকম বুড়ো মানুষ, অতদিন থেকে ভুগছে, তাকে কেউ খুন করতে পারে! নিজের চোখে তাই তাকে দেখতে হলো। ঐখানে হাঁটু গেড়ে বসে তার মায়ের মাথার ওপর দা উঁচিয়ে ধরেছে তার বোনাই! দেখেই মাথাটা ঘুরে গেল। চেঁচাতে চেষ্টা করেছিল, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় নি। ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতেই বসিয়ে দিল কোপ। ছুটে গিয়ে দুহাতে কোমর জাপটে ধরেছিল। রাখতে পারবে কেন? 'শালা তো মানুষ নয়, দাঁতাল শুয়োর।' এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

কে একজন জানতে চাইল, বৌ দুটো ছিল কোথায়?

বড়টি বলল, সে রসুইখানায় ছেলেকে ভাত খাওয়াচ্ছিল। ছোট কিছু বলল না। তার হয়ে কাঁদুনে সুরেই জবাব দিল কাদের, ও ঘাটে গিয়েছিল। ওরা দুজনে আসবার আগেই পালিয়েছে হারামজাদা।

পাঁচ মাইল দূরে থানা। দুজন প্রতিবেশীর কাঁধে হাত দিয়ে সমস্ত পথ একটানা বিলাপ করতে করতে কাদের গিয়ে লুটিয়ে পড়ল বড়বাবুর পায়ের ওপর। এজাহার লিখে নিয়েই তিনি ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন। লাশ চালান দিয়ে সেই রাত থেকেই শুরু হলো তদন্ত। তোফাজ্জলকে বাড়ি পাওয়া গেল না। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না। কাদেরের বাড়ি আর খালের পুলের মধ্যে রশি চারেক ব্যবধান। সেই পথে এবং সাঁকোর বাঁশে তিন চার জায়গায় রক্তের দাগ দেখা গেল। তোফাজ্জলের বাড়ির উঠোনেও খানিকটা। খানাতল্লাশে বাড়ি ঘরে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। পেছনে ছিল পুরনো খড়ের গাদা। যাবার সময় দারোগার হঠাৎ খেয়াল হতেই সেটা ভেঙে ফেলবার হুকুম দিলেন। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল রক্ত-মাখা লুঙি।

ভোর বেলা বাজারের পাশে একটা মেয়েমানুষের ঘর থেকে বেহুঁশ অবস্থায় তোফাজ্জলকে গ্রেপ্তার করা হলো।

ভূতনাথবাবুর দেশলাই-এর কাঠি ফুরিয়ে গিয়েছিল। চাকরকে ডেকে তার ব্যবস্থা করবার পর তিনি পকেট থেকে একটি বিশাল সিগার বের করে ধরালেন। মিনিট কয়েক নিঃশব্দে ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করলেন ঃ—

আমি তখন সদরে। ডি. এস. পি. ভবতোষ সেন ছুটি নিয়েছেন, তাঁর জায়গায় কাজ করছি। কয়েকটা ডিপার্টমেণ্টাল প্রসিডিংস্ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এস. পি. ডেকে বললেন, 'ও-সব থাক। আপনি এই কেসটা দেখুন।' ও. সি.'র রিপোর্ট পড়ে তাঁর বোধ হয় কোনো সন্দেহ হয়ে থাকবে। আমার কাছে অবিশ্যি কিছুই ভাঙলেন না।

পরদিন থেকেই লেগে পড়লাম। সদর থেকে অনেকটা দূরে। প্রায় সন্ধ্যা হলো থানায় পৌঁছতে। গিয়ে দেখি, কাদের বসে আছে। চোখ দুটো লাল, চুল উস্কখুস্ক। কী ব্যাপার? কাল রাত থেকে ফতিমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ও. সি.'র মুখ গম্ভীর। ইংরেজীতে বললেন, 'কোনো গোলমাল আছে মনে হচ্ছে। দুদিন চেষ্টা করেও মেয়েটাকে মিট করতে পারি নি। রোজই শুনি, অসুখ।'

কয়েকজন সিপাই নিয়ে তখ্খনি দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। সারারাত খোঁজাখুজির পর কাদেরের বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে ঐ খালের মধ্যেই পাওয়া গেল। একটা বাঁশ ঝাড় কবে উপড়ে জলে পড়ে গিয়েছিল। ভাঁটার টানে ভেসে এসে তার সঙ্গে আটকে গেছে।

ভূতনাথবাবু আবার জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেরালেন। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, কতদিন হয়ে গেল! মুখখানা এখনো স্পষ্ট মনে আছে।

ঐ সম্বন্ধেই বোধহয় কোনো প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই ওঁর গলা শোনা গেল। বললেন—

ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে আমাদের দেশের চাষীদের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা পড়েছি। লোকগুলো কী সরল উদার!

একজনের বিপদে দশজন বুক দিয়ে এসে পড়ে। এক বাড়ীর উৎসব মানে গোটা গাঁয়ের উৎসব। এসব যারা লিখেছেন, সম্ভবত তাঁরা শহরের লোক। গ্রাম্য জীবনের স্বাদ দূরে থাক, কাছ থেকে দেখবার সুযোগও বোধহয় হয় নি। হলে বুঝতেন, একের বিপদে অন্যেরা এসে পড়ে ঠিকই, তবে সেটা অন্য উদ্দেশ্যে। যে লোকটা পড়েছে তাকে সবাই মিলে চেপে ধরবার জন্যে, যাতে করে আর সে মাথা তুলতে না পারে। তোফাজ্জলের ব্যাপারেও তাই হলো। একে তো ফেবেঝাজ লোক বলে কেউ তার ওপব খুশী ছিল না। কখন কার পেছনে লাগে এই ভয়েই তটস্থ। তার ওপরে নানা কাণ্ড করে হঠাৎ অবস্থাটা ফিরিয়ে ফেলবার পর অনেকের মনেই জ্বালা ধরেছিল। এই সুযোগ তারা ছাড়ল না। একগাদা সাক্ষী জুটে গেল কাদেরের পক্ষে। কেউ কেউ সেদিন তোফাজ্জলকে সন্দেহজনক ভাবে বুড়ির ঘরে ঢুকতে দেখেছে, কেউ দেখেছে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে। তাব নিজের চাকরটা পযন্ত বলে বসল, মনিব যখন বাড়ি ঢোকে, তার গায়ে আর লুঙিতে রক্তের দাগ ছিল। কারণটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ধমক খেয়ে আর সাহস করে নি।

আমাদের ও. সি.-টিও কোনো কারণে লোকটার ওপর নারাজ হয়ে থাকবেন। এবার বাগে পেয়ে এঁটে ধরলেন। মামলাখানা যা তৈরী হলো, তার মধ্যে দাঁত ফোটাবার মত এতটুকু নরম জায়গা কোনোখানে খুঁজে পাওয়া গেল না।

হ্যাঁ, ফতিমার মৃত্যুটা নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে ছাড়ি নি। কিন্তু কাদেরের মুখে ঐ এক কথা—'জানি না, হুজুর। মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে দেখলাম ঘরে নেই। যেখানে যেখানে যেতে পারে কোথাও না পেয়ে থানায় গিয়েছিলাম খবর দিতে।'

পাড়ার লোকের বিশ্বাস—দু-চারজন মুখ ফুটে বলেও ফেলল—তোফাজ্জলের সঙ্গে মেয়েটার যে গোপন সম্পর্ক ছিল তার থেকে অন্য ভাবে না হলেও খবরাখবর দিয়ে হয়তো কিছুটা সাহায্য করে থাকবে। পাছে সে কথা বেরিয়ে যায় সেই ভয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

একটি সদ্য-গোঁফ-ওঠা কলেজে পড়া ছোকরা কথাটাকে একটু অ্যামেণ্ড্ করে দিল, ভয়ে নয় স্যর, লজ্জায়, ঘেন্নায়। তোফাজ্জলকে সে সত্যিই ভালবাসত।

ইনভেস্টিগেশন শেষ করতে লেগে গেল ছ' মাস। আমরাই তারিখে তারিখে দরখাস্ত করে সময় নিয়েছি। সাহেব এস. পি.; তার ওপরে দারুণ একরোখা মানুষ। ঐ যে একবার মাথায় ঢুকেছিল এর মধ্যে মিস্ট্রি আছে, ব্যস, গোঁ চেপে গেল, যেমন করে হোক সেটা বের করতেই হবে। নিজেও কম চেষ্টা করেন নি ভদ্রলোক। তারপর হাল ছেড়ে দিলেন।

আসামী গোড়া থেকেই জেল হাজতে। এস. ডি. ও. জামিন দেয় নি। বড় ব্যারিস্টার লাগিয়ে প্রথমে সেশন্স, তারপর হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়েও কাজ হয় নি। আমরা বরাবর অপোজ করে গেছি। জোরালো প্রমাণ রয়েছে ওর বিরুদ্ধে। জামিন দিলেই সাক্ষী ভাগাবার চেষ্টা করবে। অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক, সুতরাং এ ঝক্কি নেওয়া যায় না—এই ছিল সরকার পক্ষের যুক্তি। সব কোর্টই সেটা মেনে নিয়েছিলেন।

ওর পক্ষে মামলা চালানো, উকিল ব্যারিস্টার লাগানো এবং অন্যান্য তদ্বির তদারকের ভার ছিল বড় ভাই-এর ওপর। দুহাত দিয়ে লুটছিল লোকটা। এমন সুযোগ কে ছাড়ে? ও-অঞ্চলের চাষী গেরস্তের হাতে নগদ টাকা-কড়ি বড় একটা থাকে না। যা ছিল গোড়াতেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর টান পড়েছিল জমিজমায়। ওর নিজের যা ছিল, তাছাড়া এক বছরে কাদেরকে ঠকিয়ে যা কিছু হাত করেছিল, কিছু বাঁধা পড়ল, বেশীর ভাগ জলের দামে বিক্রী হয়ে গেল। হালদারদের পোয়া বারো। মামলা যখন উঠল, তখন আর বিশেষ কিছু বাকী নেই। কাদেরের খুশি আর ধরে না। এক একখানা জমি যায় আর তার ফুর্তি বাড়ে। তার বাড়ির লাগোয়া সেই তেঁতুলতলার বাগানটা যেদিন গেল, সেদিন আনন্দের চোটে একেবারে ক্ষেপে যাবার মত অবস্থা। বৌ-এর গলায় ছিল একটা

রুপোর হাঁসুলি। ভুলিয়ে ভালিয়ে কিংবা এক রকম কেড়ে নিয়েই বলতে পারেন, স্যাকরার দোকানে বাঁধা রেখে, সেই টাকায় মস্ত বড় এক খাসী কিনে এনে লাগিয়ে দিল ভোজ। প্রায় গাঁ সুদ্ধ নেমন্তন্ন!

প্রতি তারিখে কোর্টে যাওয়ার ওর কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু সক্কলের আগে গিয়ে হাজির হতো। কাছারিব সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, তোফাজ্জলকে কখন নিয়ে আসবে জেল থেকে, চোর ডাকাত গাঁটকাটাদের সঙ্গে একটা দড়িতে বেঁধে, একই হাতকড়ায় গেঁথে। মামলা যখন চলত, সাক্ষীর জবানবন্দি বা উকিল ব্যারিস্টারের সওয়াল জবাব—এসব দিকে তার নজর ছিল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত আসামীর কাঠগড়ার পানে। দলের লোকের কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলত, ছাখ ছাখ, বোনাই আমার কত আরামে আছে জেলে গিয়ে। মুখখানা একেবারে আমসি হয়ে গেছে।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে না? মিসফরচ্যুন নেভার কাম্স্ অ্যালোন। কপাল যখন ভাঙে, নদীর মত এক পাড় ভাঙে না, দু'পাড়ে একসঙ্গে ভাঙন লাগে। তোফাজ্জলেরও তাই হলো। একটা মাত্র ছেলে, বছর সাতেক বয়স, বাপের ভীষণ ন্যাওটা। জন্ম থেকেই রোগা, বাপ জেলে যাবার পর থেকে আরো শুকিয়ে যাচ্ছিল। তারপর পড়ল জ্বরে। যেদিন রায় হবার কথা, তার আগের রাত্রে হঠাৎ মারা গেল। কাদেরের কাছে খবর এল। সে গেল না। মনে মনে হয়তো খুশী হবার চেষ্টা করেছিল। তাও পারল না। হঠাৎ কী রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার কেউ কেউ পরে তার বৌ-এর মুখে শুনেছিল, সে রাতটা নাকি সে ঘুমোতে পারে নি। বার বার উঠে উঠে তামাক খেয়েছিল।

পরদিন ভোরেই সদরে রওনা দেবার কথা। বৌকে আগেই বলে রেখেছিল। রাত থাকতে উঠে ভাতে ভাত নামিয়ে স্বামীকে ডাকতে এসে দেখে, পুব পোতার ঘরে তার মাকে যেখানে খুন করা হয়েছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে শূন্য মেঝের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। দেখে কী রকম ভয় পেয়েছিল বৌটা। কাছে

সরে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, কী দেখছ! কাদের কোনো জবাব দেয় নি। আরো খানিকক্ষণ তেমনি ভাবে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত গলায় থেমে থেমে বলেছিল, মা নিশ্চয়ই সব আগে থেকে জানতে পেরেছিল। তা না হলে অমন জোর দিয়ে কইল কেমন করে—তুই দেখে নিস, কাদের, এর কিছুই ওদের বরাতে সইবে না? তাই তো হলো। শেষকালে ছেলেটাও গেল···। বলেই, হঠাৎ বৌ-এর দিকে ফিরে তাড়া দিয়েছিল, ভাত দিবি চল।

কোর্টে সেদিন ভীষণ ভিড়। আমিও দলবল নিয়ে উপস্থিত। রায় সম্বন্ধে আমরা একদম নিশ্চিত ছিলাম। হাতিয়াঙ্গাদি জজ; না ঝুলিয়ে ছাড়বে না, তাও একরকম জানা কথা। চার্জ বোঝানো শেষ হতেই জুরিরা যখন ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন, হাকিমের সঙ্গে আমরাও উঠে পড়লাম। এক পেয়ালা কড়া চা-এর প্রয়োজন বোধ করছিলাম। হরিশ পাইন ছাড়া সে জিনিস কেউ দিতে পারবে না। কোর্ট কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে দু'পা গেলেই তার দোকান। গেট পেরোতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, বটগাছের নীচে কাদের মোল্লা গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে। আশ্চর্য! উল্টোটাই বরং আশা করেছিলাম। অন্য দিন দেখেছি, খুশী মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখতে পেলেই ছুটে এসে সেলাম করেছে মামলার হালচাল সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছে, আজ চোখোচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল। ব্যাপার কী? বোনাই-এর জন্যে মন কেমন করছে? অসম্ভব। কাদের মোল্লার মন অত কাঁচা—এ অপবাদ তার পরম শত্রুও দিতে পারবে না। তবে কি ওর সন্দেহ হচ্ছে তোফাজ্জল ছাড়া পেয়ে যাবে? তেমন কোন সম্ভাবনা যে নেই, একটা ছোট ছেলেও তা বুঝতে পারছে, আর ওর মত ঝানু মামলাবাজ পারবে না? তাহলে ওর কিসের চিন্তা? ভাবলাম, চা খেয়ে ফিরবার পথে জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু তখন আর ওকে দেখতে পেলাম না।

পরিষ্কার কেস্। কোথাও কোন প্যাঁচ ঘোঁজ নেই। জজ অবিশ্যি জুরিদের বোঝালেন, যেমন বোঝাতে হয়, 'ফ্যাক্ট সম্বন্ধে আপনারাই

মাস্টার, আপনাদের মত আমি মেনে নিতে বাধ্য, যেমন আইন সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা আপনাদের মানতে হবে।' কিন্তু সেই ফ্যাক্ট-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে আসল জায়গাগুলোয় এমন সব প্রচ্ছন্ন কিন্তু সুগম ইঙ্গিত দিলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে থ্রু সাম ক্লিয়ার হিন্ট্স, যাতে করে তাঁর মত সম্বন্ধেও জুরিদের কোন সন্দেহ না থাকে। ফলে যা আশা করা গিয়েছিল তাই হলো। একেবারে ইউন্যানিমাস ভারডিক্ট্—গিলটী। ৩০২ ধারার মামলা; জুরিরা একমত; চরম শাস্তি না দেবার কোন কারণ নেই। কোনো কোনো বয়স্ক জজ এ রকম ক্ষেত্রেও, দুটো একটা, আইনের ভাষায় যাকে বলে, এক্সটেনুয়েটিং ফ্যাক্টর্ খাড়া করে ফাঁসিটা এড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাতিয়াঙ্গাদি সে দলে পড়েন না। ভদ্রলোক একে সিভিলিয়ান, তায় বয়স অল্প। সুতরাং বুঝতেই পারছেন।

এই পর্যন্ত এসে ভূতনাথবাবুর বাক্যস্রোত হঠাৎ মন্থর হয়ে এল। যেন কোনো দূর-নিরীক্ষ্যমাণ বস্তুর দিকে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে বললেন, সেদিনকার সেই দৃশ্যটা আজও চোখের ওপর ভাসছে। খুনী মামলার বিচার তো একটা দুটো দেখি নি, ফাঁসির হুকুমও সেদিন প্রথম শুনলাম, তা নয়। কিন্তু আগে বা পরে যা দেখেছি এবং শুনেছি, সেদিনের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। অত বড় সেশন্স কোর্ট লোকে লোকারণ্য। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। সব যেন একসঙ্গে বোবা হয়ে গেছে। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, লাল শালু ঘেরা উঁচু প্লাটফর্মের পেছনে যিনি বসে আছেন, তাঁর মুখের দিকে। জজসাহেব শান্ত গম্ভীর গলায় তাঁর রায় পড়ে চলেছেন।

ফাইণ্ডিং শেষ করে একটুখানি দম নিলেন, মাথা তুলে একবার তাকালেন আসামীর দিকে; তারপর এল সেনটেন্স্। কয়েকটি মাত্র কথা, যার ফলে একজন সুস্থ সবল রোগ-ব্যাধিহীন মানুষকে অকালে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের সেই চরম শব্দ কটি তখনো পুরোপুরি উচ্চারণ করেন নি

জজ সাহেব। সবে মাত্র বলেছেন, আই দেয়ারফোর অর্ডার ছাট্ দি সেড্ তোফাজ্জল হোসেন বি হ্যাংগ্ড্ বাই—

হঠাৎ সারা আদালতের মাথায় যেন বাজ পড়ল। কোন্ একটা কোণ থেকে ছুটে এল একটি মাত্র শব্দ—'না'! হাকিম থমকে থেমে গেলেন। অতগুলো লোক—প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। ভিড়ের ভিতর একটা চাঞ্চল্য দেখা দিতে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল একটি মাত্র লোকের মুখের উপর। লোকজন ঠেলে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মামলার ফরিয়াদী কাদের মোল্লা। জজ কিছু বলবার আগেই সেলাম করে জানাল, গোস্তাকি মাপ করবেন, হুজুর। ও হুকুম ভুল। তোফাজ্জল বেকসুর। আমার মাকে খুন করেছি আমি।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সবাই যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। মায় হাকিম পর্যন্ত। তোফাজ্জলের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। ঠোঁট দুটো কাঁপছে; কী যেন বলতে চায়, স্বর ফুটছে না। ধীরে ধীরে আবার সাড়া জাগল। একটা চাপা গুঞ্জন উঠল—যারা জানে না, জানতে চাইছে, কে লোকটা? কেউ বলছে, হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জজ সাহেব হাত তুললেন, অর্ডার, অর্ডার। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে কাছে যাবার ইঙ্গিত করলেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেই বললেন, 'ডিটেন্ ছাট্ ম্যান্।' বলেই, পাব্লিক প্রসিকিউটরকে ডেকে নিয়ে খাস কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। বাকী রায় আর পড়া হলো না। ফাঁসির হুকুম মুলতবী রইল। বলতে পারেন, শেষ ধাপে এসে আটকে গেল।...একটু চা আনতে বলুন।

চাকরকে ডেকে চা-এর অর্ডার দিলাম। আমি যথারীতি এক কাপের কথাই বলেছিলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন প্রস্তাব যোগ করলেন—দু'কাপ এবং বেশ কড়া করে।

চা আসবার আগেই ভৃত্যের হাতে এল একখানা ভিজিটিং কার্ড। দেড় ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি চওড়া সেই বৃহৎ আপদটাকে

ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম। কোনো রকমে নিজেকে সংবরণ করে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কে ? কী চায় ?

ভূতনাথ হেসে বললেন, সে কথা ও বেচারী জানবে কেমন করে ? আজ এই পর্যন্ত থাক। আরেকদিন এসে—

—আপনি ক্ষেপেছেন ! একটু বসুন, আমি কার্ডওয়ালাকে ভাগিয়ে দিয়ে আসি। আপনার চা শেষ হবার আগেই এসে পড়বো।

ভূতনাথবাবু আর বেশীক্ষণ বসতে চান নি। তাঁর 'নাটক'ও শেষ অঙ্কে এসে গিয়েছিল। বাকী দৃশ্যগুলোর যে বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন, তার একটা সংক্ষিপ্তসার পরিবেশন করে আমিও এগিয়ে যেতে চাই।

কিছুক্ষণ পরেই জজসাহেব এজলাসে ফিরে এলেন। তোফাজ্জলের মামলার আবার তারিখ পড়ল। কাদের মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হলো। ওয়ারেন্টের মাথায় লাল কালি দিয়ে বড় বড় হরফে লিখে দিলেন পেশকারবাবু, 'কনফেসিং অ্যাকিউজ্‌ড্‌; টু বী কেপ্ট্‌ সিগ্রিগেটেড্‌।' একরারী আসামীকে আলাদা করে রাখাই রীতি। সব জেলেই সে ব্যবস্থা আছে। এর বেলায় সে নিয়মে যেন কোনো রকম শৈথিল্য না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ দিলেন জজসাহেব। ভূতনাথবাবু জেলরের সঙ্গে দেখা করে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে এলেন। আসামীর স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবার ভার পড়ল একজন দক্ষ ও সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটের উপর। নির্জন খাস কামরায় ডেকে নিয়ে তিনি তাকে ভেবে দেখবার যথেষ্ট সময় দিলেন, বারংবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন, পুলিস বা শত্রুপক্ষের ভয়ে, কোনো দিক থেকে কারো প্রভাব বা প্ররোচনায়, ঝোঁকের মাথায়, কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি এই স্বীকারোক্তির প্রবৃত্তি তার মনে জেগে থাকে, সে যেন এই বিপজ্জনক কাজ থেকে নিরস্ত হয়। একরার করবার কোনো দায় তার নেই। জজের আদালতে কি বলেছে

ঐ

না বলেছে, আইনত সেটা মূল্যহীন, এবং এখন যদি সেকথা প্রত্যাহার করে, সেটা কোনো অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

কিন্তু কাদের মোল্লা নিরস্ত হয় নি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার হুবহু বর্ণনা দিয়ে মাতৃহত্যার গুরুতর অপরাধ অকপটে স্বীকার করেছিল। শত্রুর প্রতি যে দুর্জয় আক্রোশ তাকে এই কাজে প্ররোচিত করেছিল, তাও কিছুমাত্র গোপন করে নি।

আবার মামলা শুরু হলো। একই মামলার পুনর্বিচার কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না। সাধারণ কোনো আইন-ঘটিত কারণে বিচারকার্য যেখানে অসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন হয়, সেইখানে রিট্রায়াল বা পুনর্বিচারের প্রয়োজন ঘটে। সেই পুরনো আসামীকে আবার নতুন করে দাঁড়াতে হয় কাঠগড়ায়। একই অভিযোগের পুনরুক্তি। আরেকবার সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়—তুমি দোষী না নির্দোষ। এ ক্ষেত্রে অভিযোগ তাই রইল, ঘটনাও এক, বদল হলো শুধু আসামীর। নাটকের প্রথম কয়েক অঙ্কে যে ছিল ফরিয়াদী, শেষ অঙ্কে তাকেই দেখা গেল আসামীর ভূমিকায়। অভিযোক্তা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত পদক্ষেপে অভিযুক্তের আসনে গিয়ে উঠল।

এবারেও সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠবে—কেন? আসামী তো নিজে এগিয়ে এসে তার কৃত অপরাধ স্বীকার করেছে, আদালতে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছে, 'আমি দোষ করেছি ধর্মাবতার, আই প্লিড্ গিল্টী টু দি চার্জ', তা সত্ত্বেও তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে বাধা কোথায়? আছে বাধা। আপাত-দৃষ্টিতে না থাকলেও আইনের দৃষ্টিতে আছে। একমাত্র আসামীর উক্তির উপর নির্ভর করে তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না—এই হলো ফৌজদারী দণ্ডবিধির সুস্পষ্ট নির্দেশ।

আইনের প্রসঙ্গে অনেকদিন আগেকার অন্য একটা ঘটনা মনে পড়ছে। মামলার দিক থেকে এর সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। অতি সাধারণ কেস্। আসামীটি তার চেয়েও সাধারণ। একটা চৌদ্দ পনর বছরের ছেলে। কোথায় দেখেছিলাম? সম্ভবত

কৃষ্ণনগর জেল-হাজতে। নাম ছিল পটল দাস।

সপ্তাহান্তে একদিন আমার রাউণ্ড। লাইনবন্দী লোকগুলোর সামনে দিয়ে সদলবলে জোর কদমে ঘুরে যাওয়া। বিশেষ কারো উপর নজর পড়বার কথা নয়। হঠাৎ একবার কেমন করে যেন খেয়াল হলো, এই ছেলেটাকে এই বিশেষ জায়গায় অনেকদিন থেকে পুরোপুরি অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। হাত থেকে ওর হিস্ট্রী টিকেটখানা নিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, তাই বটে, প্রায় ছমাস ধরে আছে এখানে। অথচ কেস্‌টা সামান্য। খুন, ডাকাতি, ঘরে আগুন দেওয়া বা ঐ জাতীয় কিছু নয়, ৩৭৯ ধারা— চুরি। জিজ্ঞাসা করলাম, কী চুরি করেছিস ?

উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। আশে পাশে যারা দাঁড়িয়ে, তাদের মুখেও চাপা হাসি। একজন বলে উঠল, পটল চুরি, হুজুর।

হাসি আর চাপা রইল না। পটলের মাথাটা আর একটু নুয়ে পড়ল ; লজ্জায় নিশ্চয়ই, তবে তার মূলে চুরিটা যতখানি তার চেয়ে বেশি বোধহয় চোরাই মাল। চোরেরও জাতিভেদ আছে। কে কুলীন আর কে হরিজন, নির্ভর করে অপহৃত দ্রব্যের উপর। 'লুটি তো ভাণ্ডার' যারা, তারা সম্ভ্রমের পাত্র, ছিঁচকের প্রাপ্য শুধু উপহাস।

ঘটনার বিবরণও পাওয়া গেল। দিদির বাড়ি থেকে ফিরছিল। জলঙ্গীর চরের উপর দিয়ে পথ। সারি সারি পটলের ক্ষেত। বেশ ভাল ফলন হয়েছে সেবার। পাতার ফাঁকে ফাঁকে নধর কচি ফলগুলোকে উঁকি মারতে দেখে লোভ হলো। বাড়ি নিয়ে ভেজে খাবার চেয়ে তুলবার আনন্দটাই বেশী। এখান সেখান থেকে কয়েকটা ছিঁড়ে নিয়ে কোঁচড়ে ভরে ফেলল। সবসুদ্ধ সেরখানেক হবে। কয়েক পা যেতেই দেখল সামনে থেকে একজন লোক আসছে। কাছাকাছি গাঁয়ের কোনো মোড়ল চাষী বা কৃষাণ হবে হয়তো। বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করতে লাগল। কোনো দিকে

না চেয়ে যদি গটগট করে এগিয়ে যেত, লোকটা হয়তো লক্ষ্যই করত না। কিন্তু পটল দাসের মনটা তখন তার কাপড়ে বাঁধা পটলগুলোর মতই একেবারে কাঁচা। এক পা যায়, আর ভয়ে ভয়ে তাকায় সেই লোকটার মুখের পানে। গাঁয়ের মানুষ এমনিতেই একটু সন্ধিৎসু। অচেনা লোক দেখলে খোঁজখবর না নিয়ে ছাড়ে না। তার উপরে ছেলেটার হাবভাব অনেকটা সন্দেহজনক।

দূর থেকে হেঁকে বলল, 'এই, বাড়ি কোথায় তোর?'

জবাব দিতে গিয়ে পটলকে বারকয়েক ঢোক গিলতে হলো। তারপরেই দ্বিতীয় প্রশ্ন—'কোঁচড়ে কী?'

এবার আর জবাব নয়, তার বদলে সোজা দৌড়। কিন্তু গ্রহ বিরূপ। একখানা জমি পেরোবার আগেই পটলের লতায় পা বেধে সজোরে ভূমিসাৎ। পটলগুলোও কোঁচড় ছেড়ে মাটিতে লুটোপুটি।

হাতেনাতে চোর ধরার মধ্যে একটা উত্তেজনা আছে, তা সে যে রকম চুরিই হোক না কেন। একজন সামান্য গ্রাম্য কৃষক হাতের কাছে এত বড় সুযোগ পেয়েও বীরত্ব প্রকাশে বিরত হবে, আশা করা যায় না। গাঁটের পয়সা খরচ করে চোরকে কোনো দূরবর্তী থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিসের হেফাজতে পৌঁছে দেবার ব্যাপার যদি হ'ত, হয়তো ততটা উৎসাহ দেখা যেত না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেদিকেও সুবিধা ছিল। কী একটা তদন্ত উপলক্ষে থানার জমাদারবাবু তখনও পাশের গ্রামে উপস্থিত। পটলকে মাল সমেত তাঁরই হাতে সঁপে দেওয়া হলো। তাঁর সঙ্গে সে প্রথমে গেল থানায়, তারপর কাছারি হয়ে জেলখানায়। তার বিরুদ্ধে যে-মোকদ্দমা দায়ের হলো, তার আলামত্ বা এক্‌জিবিট হিসাবে সেই পটল কটি সযত্নে তোলা রইল কোর্টের মালখানায়। আদালতে দাখিল করবার সুযোগ আর এল না। আই, ও. অর্থাৎ তদন্তকারী অফিসার তারিখে তারিখে একই রিপোর্ট দিতে লাগলেন—কম্‌প্লেনেণ্ট নট্ ট্রেসেব্‌ল্। ফরিয়াদী নিখোঁজ। কার ক্ষেত থেকে পটল তুলেছিল পটল দাস, তার পাত্তা পাওয়া গেল না। নানাভাবে চেষ্টা করেও পুলিস সেই চোরাই

মালের কোনো দাবিদার খাড়া করতে পারল না। মামলার যে একমাত্র সাক্ষী, সেই গ্রামের লোকটি, তার নামও 'পত্তা' জমাদার সাহেবের নোটবুকের এক কোণে পেন্সিলে লেখা ছিল। তিনি নিজেই তার পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। পটল দাসের হাজত-বাস বেড়ে চলল। তারিখের পর তারিখ পড়তে লাগল।

অনেককে দুঃখ করতে শুনি, মানুষের যেটা সব চেয়ে বড় গুণ—পরোপকার-প্রবৃত্তি সংসার থেকে তার ক্রমশ বিলোপ ঘটছে। তা যদি হয়, আমার মতে সেটা শুভলক্ষণ। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, পৃথিবীর যত জটিল সমস্যা, তার বেশির ভাগের মূলে রয়েছে পরের ভালো করবার চেষ্টা। তুমি না চাইলে কি হয়, আমি তোমার উপকার না করে ছাড়বো না—একদল মহৎ মানুষের মনে যদি এই উগ্র মহত্ত্বের প্রাদুর্ভাব না ঘটত, সাধারণ মানুষ সুখে থাকতে পারত, অন্তত আজকের তুলনায় তাদের দুঃখের ভার অনেক লঘু হয়ে যেত। সুসভ্য শ্বেতকায়ের অন্তরে যেদিন সভ্যতা-বিস্তারের মঙ্গলেচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল 'অসভ্য' ও 'অর্ধসত্য' কৃষ্ণাঙ্গের জীবনে সেটা ছিল প্রথম দুর্দিন। বহু শতাব্দী ধরে বহু রক্ত দিয়ে সেই মহোপকারের ঋণ তাদের শোধ করতে হয়েছে এবং কারো কারো এখনো হচ্ছে।

শুভাকাঙ্ক্ষী শক্তিমানের কল্যাণ-হস্ত কখন, কী ভাবে, কার মাথায় এসে পড়বে, এই ভয়ে দুর্বলেরা সর্বদা তটস্থ। তাদের মনোভাব হলো—কাজ নেই আমার ভালোয়, এই বেশ আছি। বলা বাহুল্য, বৃহতেরা সে কথায় কর্ণপাত করেন না। ক্ষুদ্রের সরব ও নীরব বাধা অগ্রাহ্য করে তার মঙ্গলার্থে কাজ করে যান। দুনিয়ার সর্বত্র এই রীতি। প্রবল রাষ্ট্র যখন তার হীনবল প্রতিবেশীর 'লিবারেশান' বা উদ্ধারের জন্যে 'মুক্তি ফৌজ' পাঠিয়ে দেন, সেই অজস্র অর্থ ও লোকক্ষয়ের মূলেও এই পরহিতৈষণা।

পটল দাস ভালোই ছিল জেলখানায়। বিনা পরিশ্রমে নিয়মিত তিন বেলা দক্ষিণ-হস্তের নিশ্চিত ব্যবস্থা। নতুন কোঠাবাড়ির দক্ষিণ-

খোলা বারান্দায় লোভনীয় কম্বলশয্যা। কলের জলে আশ মিটিয়ে স্নান, বেলা পড়লেই হাডুডুডু, মাঝে মাঝে বাড়ির বা গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখাশুনো। মন কেমন করলে এখানেও সঙ্গী সাথীর অভাব নেই। এ আরাম চিরস্থায়ী নয়, জেল হলেও বড় জোর একমাস। তার পরে আবার তো সেই জলপড়া খড়ো ঘর, পচা পুকুর, পান্তা ভাত আর দুপুর রোদে জনখাটার কঠিন জীবনে ফিরে যেতে হবে। তার আগে যে ক'টা দিন পারা যায়, এই স্বাদটুকু নিয়ে যাওয়া মন্দ কী? এই বোধহয় ছিল তার মনোভাব। গোড়াতে না থাকলেও অভিজ্ঞ বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং মামলার আশু ফয়সালা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না।

মাথাব্যথা হলো আমার। সে না চাইলেও আমি তার ভালোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। একজন অল্পবয়সী আসামী অনির্দিষ্ট কালের জন্যে হাজতে বসে পচবে, জেলখানার পুরনো চাঁইদের সঙ্গে মিশে অধঃপতনের পথ ধরবে, এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। দায়িত্বশীল কারা-শাসক হিসাবে আমার প্রথম কর্তব্য হলো যত শীঘ্র সম্ভব ওর বিচারের ব্যবস্থা করা। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হলো, সামান্য এক সের পটল চুরি, তার জন্য আবার সাক্ষী সাবুদের কী দরকার? দোষ কবুল করলেই তো সব হাঙ্গামা চুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাজা হয়ে যাবে। কতদিন আর? বড় জোর মাসখানেক। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

পটল দাসকে ডেকে এনে সেই পরামর্শ দিলাম। বললাম, এবার যেদিন কোর্টে যাবি, ডকে উঠেই হাকিমকে বলবি, আমি দোষ স্বীকার করছি।

সে বলল, হাকিমের কাছে নেয় না, হুজুর।

ব্যাপারটা আমার অজানা ছিল না। নির্দিষ্ট তারিখে অর্থাৎ চৌদ্দদিন অন্তর বিচারাধীন আসামীকে বিচারকের সামনে হাজির করতে হবে, এটা তার আইন প্রদত্ত অধিকার। কিন্তু বেশির ভাগ মফঃস্বল কোর্টে যে আসামীর কেস্ 'তৈরী' হয়নি, যাকে

বলে রেডি ফর্ হিয়ারিং, তার দৌড় কোর্ট-হাজত বা 'লক-আপ' পর্যন্ত। কাঠগড়ায় তার ডাক পড়ে না। কোর্ট্‌বাবুর মর্জি না হলে হাকিমের মুখ সে দেখতে পায় না। প্রথম জীবনে অর্থাৎ যতদিন রক্ত গরম ছিল, এই নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক গরম গরম নোট পাঠিয়েছি। সরকারী কাগজ ও বেসরকারী কালি-কলমের কিঞ্চিৎ অপব্যয় ছাড়া, আর কোনো ফল হয় নি।

এবার আর লেখালেখির পথ দিয়ে গেলাম না। পটলকে আশ্বাস দিলাম, আচ্ছা, আমি কোর্ট্‌বাবুকে বলে দেবো। আসছে তারিখে তোকে হাকিমের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে।

পটল মাথা নাড়ল, অর্থাৎ মাথাটা একদিকে কাৎ করল। কিন্তু কতটা খুশী হয়ে, আর কতটা আমাকে খুশী করবার জন্যে, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়ে গেল। তার সদিচ্ছার উপর নির্ভর না করে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলাম।

বন্দীদের চিঠি, পত্র, আপীল ইত্যাদি লিখে দেবার জন্যে একজন কনভিক্ট রাইটার বা কয়েদী মুন্সী ছিলেন। জেলে আসবার আগে তিনি ওকালতি করতেন। মক্কেলের কিছু গচ্ছিত অর্থ নিজস্ব আমানতে পরিণত করার দরুন বছর দুয়েকের জন্য সরকারী আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাকে দিয়ে পটলের জবানিতে একখানি চোস্ত দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবর পাঠিয়ে দেওয়া হলো। প্রার্থনা রইল—'অধীনের এই অকপট স্বীকারোক্তি গ্রহণ পূর্বক তাহার অপরাধের আশু বিচারের ব্যবস্থা হউক।'

পরপর দুটো তারিখ অর্থাৎ আটাশ দিন চলে গেল, কোনো ব্যবস্থা হলো না। প্রতি সোমবার রাউণ্ডে গিয়ে দেখতে পাই, পটল দাস সেই বিশেষ জায়গাটিতে বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। 'প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ'। আমাকে দেখলেই মুচকি হেসে মাথা নীচু করে। জিজ্ঞাসা করি, দরখাস্তের কোনো জবাব এসেছে কিনা, হাকিমের এজলাসে ডাক পড়েছে কিনা। দুদিকে মাথা নাড়ে, অর্থাৎ 'না'।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে একটা ডি, ও, অর্থাৎ আধা সরকারী চিঠি লিখব কিনা ভাবছি, এমন সময় 'জেল-ভিজিট্'-এর পালা সারতে তিনি নিজেই একদিন এসে উপস্থিত। পটল দাসের কেস্‌টা কি অবস্থায় আছে জেনে নিয়ে আমাকে জানাবেন, বলে গেলেন। পরদিনই তাঁর টেলিফোন পেলাম। সেইদিন থেকে সাবধান হয়ে গেছি। পরোপকার-আকাঙ্ক্ষা যখনই মাথা তুলে ওঠে, পটল দাসের নজির দেখিয়ে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত করি।

কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করেছে—ল' ইজ নাথিং বাট কমন্ সেন্স? আসল কথা হলো—ল' ইজ কণ্ট্রারি টু কমন্ সেন্স। মানুষের সুস্থ সহজ সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী বা বিপরীত যদি কিছু থাকে, তার নাম আইন। জোনাথান সুইফ্‌ট্ ঠিকই বলেছিলেন—সাত পুরুষ ধরে যে সম্পত্তি তুমি ভোগ দখল করে আসছ, আইনের এক খোঁচায় হঠাৎ একদিন সাব্যস্ত হতে পারে, তুমি সেখানে অনধিকারী বা ইউজার্পার। তার চেয়েও তাজ্জব বাৎ ভেসে এল টেলিফোনের তার বেয়ে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জানালেন, যথেষ্ট সময় নিয়েও পুলিস যখন পটল দাসের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী হাজির করতে পারল না, প্রমাণাভাবে হাকিম তাকে বেকসুর খালাস দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময় তার দরখাস্ত গিয়ে হাজির। দোষ কবুল করবার পর আর তাকে ছাড়া যায় না। কিন্তু শাস্তি তো দিতে পারেন। না, তাও পারেন না। আইন বলছে কেবলমাত্র স্বীকারোক্তির বলে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। তার সমর্থনে অন্য সাক্ষ্য বা প্রমাণ চাই। কন্‌ফেশান অব্ দি অ্যাকিউজ্‌ড্ মাস্ট বি করোবোরেটেড্ বাই আদার এভিডেন্স। যতদিন সেই আদার এভিডেন্স বা অন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ করা না যাবে, অর্থাৎ কেউ এসে সেই মালখানায় গচ্ছিত পচা পটলগুলো দেখিয়ে না বলবে, হ্যাঁ, এই আসামীকে এই পটল আমি ক্ষেত থেকে তুলতে দেখেছি, ততদিন পটল দাসও পচতে থাকবে জেলখানায়।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, কেন মরতে দোষ কবুল করতে

গেল ছেলেটা ? এমনিতেই খালাস হয়ে যাচ্ছিল। খালি খালি আটকে গেল।

কেমন করে বলি, সে যায় নি, আমি তার ভালো করতে গিয়েছিলাম ?

তারপর কী হলো, অর্থাৎ কোন্ উপায়ে সেই একসের পটল চুরির জটিল মামলাব ফয়সালা হলো, সে কথা এখানে অবান্তর। অন্তত একটা সাক্ষী যেমন করে এবং যেখান থেকে হোক পুলিসকে জুটিয়ে আনতে হয়েছিল নিশ্চয়ই।

কাদেরের বেলাতেও সরকার পক্ষের অর্থাৎ পুলিসের উপর সেই দায়িত্ব এসে পড়ল। এবারে ভূতনাথবাবু স্বয়ং তার ভার নিলেন।

কাজটা সহজ নয়। খুন করতে কেউ দেখেনি। অর্থাৎ চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল না। কাদেরের বড় বৌ সেই এক কথাই ধরে রইল—সে কিছু জানে না, রসুই ঘরে ছেলেকে ভাত খাওয়াচ্ছিল, স্বামীর চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে। আগের বারে এর উপর আরেকটা কথা যোগ করেছিল—ঘর থেকে কাউকে পালাতে দেখে নি তবে পুলের উপর দিয়ে একজন কাউকে বেশ জোরে জোরে পা চালিয়ে চলে যেতে দেখেছিল ; অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারে নি, কে ; কিন্তু চলবার ধরনটা তোফাজ্জলের মত।

এবারকার সাক্ষ্যে এ শেষের অংশটা উল্লেখ করল না। পুলিসও তার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না। ভূতনাথবাবু জিজ্ঞাসাবাদ করে অন্য একটা মূল্যবান সূত্রের সন্ধান পেলেন। ও পাড়ার এক বুড়ী। মাঝে মাঝে কাদেরের মাকে দেখতে আসত। বেশ ভাব ছিল দুজনের মধ্যে। সেদিনও সন্ধ্যার আগে বেশ কিছুক্ষণ রোগীর কাছে কাটিয়ে গিয়েছিল। কী কথা হয়েছিল বড় বৌ জানে না, সেদিকে খেয়ালও করে নি। শুধু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিল। অন্যান্য বারে, বুড়ী যখন আসে তার শাশুড়ীর কাছে, মাঝখানে কোনো কারণে বৌয়েরা এসে পড়লে দুই বুড়ীর কথাবার্তায় কোনো

ছেদ পড়ে না। সেদিন কী একটা কাজে বড় বৌ হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই তুজনে যেন কেমন চকিত হয়ে উঠল। কথা হচ্ছিল চাপা গলায়, অনেকটা ফিস্‌ফিস্ করে। তাও বন্ধ হয়ে গেল।

'কথাটা নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে। পাড়ার লোকের কাছে বৌয়ের নিন্দে করছিলেন তোমার শাশুড়ী। তোমার কানে যায় সেটা চান নি।'—হালকা সুরে এমনি ধারা একটা মন্তব্য করেছিলেন ভূতনাথবাবু। পিছনে কোনো পুলিসী মতলব থেকে থাকবে। সাক্ষীকে চটিয়ে দিয়ে যদি কিছু তথ্যোদ্ধার ঘটে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। বৌটি দৃঢ়স্বরে বলেছিল, তার শাশুড়ী সে রকম লোক ছিলেন না। তাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসতেন। সেও পারত পক্ষে তাঁর কোনো অযত্ন করে নি। বলতে বলতে তার চোখ তুটি জলে ভরে উঠেছিল।

ভূতনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, তাহলে কী এমন কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে, তোমার সামনে যা বলা যায় না।

—তা কেমন করে জানবো ?

অতঃপর সেই বুড়ীর শরণ নিলেন ভূতনাথ। প্রথমটা সে কিছুই বলতে চায় নি। ঐদিন যে কাদেরের মাকে দেখতে গিয়েছিল, তাও অস্বীকার করে বসল। পুলিস পক্ষ উৎসাহিত হয়ে উঠল। এই সত্য গোপনের পথ ধরে বুড়ীর উপর চাপ দেবার সুবিধা হলো। ফলও পাওয়া গেল আশাতীত।

ছেলের সেই ভয়ংকর প্রস্তাব কাদেরের মাকে প্রচণ্ড ভাবে বিচলিত করেছিল, সহজেই বোঝা যায়। সপত্নী-পুত্রটিকে চিনতে বৃদ্ধার বাকী ছিল না। বিদ্বেষের জ্বালা মেটাতে গিয়ে যে কোনো অমানুষিক নৃশংসতার চরম পথ সে বেছে নিতে পারে, দয়া মমতা ভয় সঙ্কোচ বা বিবেক সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, এর প্রমাণ সে আগেও দিয়েছে। প্রাণ নামক বস্তুটির উপর তার দরদ অতি সামান্য, শুধু পরের নয় নিজেরও, শিশুকাল থেকে তার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। প্রাণ নিতে সে অনভ্যস্ত নয়,

দিতেও অ-প্রস্তুত ছিল না। এই কার্যটি সম্পন্ন করতে গিয়ে দু-একবার যে চরম বিপদের ঝুঁকি তাকে নিতে হয়েছে, তার তুলনায় বৃদ্ধা রোগজীর্ণা বিমাতার ঘাড়ে একটা রামদার কোপ বসিয়ে দেওয়া কিছুই নয়। এই বকম একটা অকেজো অনাবশ্যক জীবন—(যার মেয়াদ আপনা থেকেই শেষ হয়ে এসেছে) বলি দিয়ে যদি শত্রু নিপাতের মত মহৎ উদ্দেশ্য সাধন কবা যায়, সে প্রলোভন ত্যাগ করবার মত মহত্ত্ব বা দুর্বলতা কাদের মোল্লার কাছে আশা করা যায় না।

ভূতনাথবাবু বলছিলেন, বেচারীর অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। মরণ একেবারে শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, অথচ করবার কিছু নেই। উঠবার চলবার শক্তি নেই যে পালিয়ে বাঁচবে, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে হলে যতটুকু গলার জোর দরকার তাও তার ছিল না। শেষের দিকে লোকজনও বড় একটা আসত না তার কাছে। ঐ বুড়ী হঠাৎ এসে পড়েছিল। সে আবার ওর চেয়েও অসহায়। কেউ কোথাও নেই। লোকের দোরে চেয়ে চিন্তে কোনরকমে পেট চলে। তবু, ডুববার আগে মানুষ যেমন একগাছা খড় কুটো পেলে তাই আঁকড়ে ধরে, কাদেরের মাও তেমনি ঐ বুড়ীটাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল, ওর হাতদুটো চেপে ধরে বলেছিল, আমাকে বাঁচাও।

তৃণখণ্ডের সাধ্য কি ডুবন্ত মানুষকে টেনে রাখে? নিজেকেই যে তাহলে ডুবতে হয়। তাই গা বাঁচিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়া ছাড়া তার আর কি উপায় আছে? বুড়ীও সরে পড়েছিল, কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ থাকতে পারে নি। মুখ খুলেছিল এমন একজনের কাছে, যে তারই মত নিরুপায় কিংবা তার চেয়েও অক্ষম। কাজীপাড়ার খোঁড়া আব্দুল। চলতে পারে না। উরুতের উপর নাটাই ঘুরিয়ে সারাদিন পাটের সুতুলি পাকায় আর নিজের মনে গুন গুন করে গান গায়। এই তার কাজ। বুড়ীর বিচারে সে-ই বোধহয় ছিল সবচেয়ে নিরাপদ শ্রোতা। তাই ঘরে না ফিরে সোজা চলে গিয়েছিল খোঁড়া আব্দুলের

কাছে। সে কিন্তু ব্যাপারটাকে তেমন আমল দেয় নি। হয়তো খোদার সৃষ্টি মানুষের উপর তখনো তার কিছুটা বিশ্বাস ছিল। বলেছিল, দূর তাই কখনো হয়? বুড়ীকে মিছিমিছি ভয় দেখিয়েছে কাদের। গোঁয়ার হলেও মানুষটার দিল্ সাদা।

সাক্ষী বলতে এই দুজন। যেটুকু জানে, শুধু সেইটুকুই বলেছিল। জেরার পাল্লায় পড়ে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করতে হয় নি। জেরা পর্বটাই ছিল অনুপস্থিত। আসামী কোনো উকিল দেয় নি। খুন-মামলার আসামী যদি অক্ষম হয়, সরকারী খরচে তার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা আছে। কাদেরের কাছেও যথারীতি সে প্রস্তাব এসেছিল। সে আমল দেয় নি। একজন জুনিয়ার উকিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, তোমাকে কোনো ফী দিতে হবে না। আমি এমনই—

'কী বললেন!' গর্জন শুনে থতমত খেয়ে থমকে গিয়েছিলেন উকিলবাবু, 'দরকার হলে আপনার মত এক ডজন উকিল কাদের মোল্লা ফী দিয়েই রাখতে পারে। কিন্তু দরকার নেই। আপনি এবার আসুন। আদাব।'

দেখাটা হয়েছিল জেলখানায়। কাদেরের সেল্-এর সামনে। সঙ্গে যে জেল-অফিসারটি ছিলেন, মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এর নাম অনুতাপের জ্বালা।

'অনুতাপ!' এবারে হো হো করে হেসে উঠেছিল খুনের আসামী।

পরের তারিখেই কাদের মোল্লার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তোফাজ্জলের মুক্তির আদেশ। খালাস পেয়েই সে শ্যালকের সঙ্গে দেখা করতে ছুটেছিল। পুলিসের আর কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু কাদের রাজী হয় নি। জেলখানার সেই জালে ঘেরা কালো গাড়িটার দরজার সামনে ভূতনাথবাবুর দিকে নজর পড়তে বলেছিল, লোকগুলো কি বলছে, জানেন বড়বাবু?

আমি নাকি আপসোসের জ্বালায় থাকতে না পেরে খুন কবুল করেছি। হাঃ হাঃ হাঃ !

হঠাৎ হাসি থামিয়ে অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর দুচোখের তারায় আগুন ছড়িয়ে কেমন ভাঙা ভাঙা গলায় বলেছিল, ফাঁসি হলে তো বেঁচে যেত হারামজাদা। এক নিমিষে সব খতম। এবার সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরুক।

বলতে বলতে সহসা তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ থেকে উপচে পড়েছিল খুশির জোয়ার—'একছিটে জমি নেই কোনখানে। বসত বাড়িটা পর্যন্ত হালদারবাবুদের সেরেস্তায় বাঁধা। একটা ছেলে, তাকে তো আগেই নিয়ে নিয়েছে খোদাতাল্লা। আমার বোনটা কেন কষ্ট পাবে খালি ভিটেয় পড়ে? রহিম তালুকদারের সঙ্গে নিকে দিয়ে দিলাম। বাড়ি গিয়ে দেখুক না একবার। সব খাঁ খাঁ করছে। মিঞা সাহেবকে এবার পরের জমির ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে পেট চালাতে হবে। হাঃ হাঃ হাঃ।'

জেলের গাড়ি চলে গেল। তারপরেও অনেকক্ষণ সেই হাসিটা যেন এক বীভৎস উল্লাসের জ্বালা ছড়িয়ে চারদিকে গম্ গম্ করতে লাগল।

হাসি, বলছি বটে, বললেন ভূতনাথবাবু, কিন্তু সে যে কী, আমি বলতে পারবো না। মানুষ অমন করে হাসে না।

ভূতনাথবাবুর ট্রেন ধরবার তাড়া ছিল। কিন্তু ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। দীর্ঘ কাহিনী যখন শেষ হলো তারপরেও কেমন আচ্ছন্নের মত নিঃশব্দে বসে রইলেন। তাঁর স্পেশাল সিগারের আধখানা টেবিলের উপরে পড়ে ছিল। আমি দেশলাইটা এগিয়ে দিলাম। সেদিকেও নজর পড়ল না। মিনিট কয়েক পরে বললাম, একটু চা আনতে বলি? সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, প্রতিহিংসার তাড়নায় মানুষ কত কী করতে পারে! অনেক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আমি নিজের চোখে দেখেছি, আপনিও দেখে

থাকবেন। কিন্তু শত্রুর ওপর এতবড় প্রতিশোধ এমন করে বোধহয় কেউ কোনদিন নেয় নি।

তিনি চলে যাবার পর আমি সেইখানেই বসে রইলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো, ফতিমার কথা তো কিছু বলে গেলেন না। সে কি সত্যিই জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, না—। উনি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন। বলতে ভুলে গেছেন। আবার যখন আসবেন, জেনে নেবো। তারপর মনে হলো, থাক। ভূতনাথ দারোগার কঠিন পুলিসী-হৃদয়ের কোণে কোন্ একটা তুচ্ছ দ্বিচারিণী গ্রামের মেয়ে যদি একটু স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে থাকে, তাকে রূঢ় আলোয় টেনে এনে কী লাভ? অনেক কিছুই তো জানা গেল। ঐ একটা জায়গায় থাক না একটুখানি গোপনতার অন্তরাল।

॥ তিন ॥

দূরত্বের একটা নিজস্ব মহিমা আছে। কাছে থাকতে যার দিকে একবারও ফিরে তাকাই নি, দূরে গেলে তাকেই মনে হবে অপরূপ। সামনে বসে যে আমার মনকে কোনোদিন নাড়া দিল না, একদিন দেখলাম, নাগালের বাইরে গিয়ে, সে কখন মন জুড়ে বসে আছে।

কথাটা নতুন নয়, ভূতনাথবাবুকে দেখে নতুন করে অনুভব করলাম। জীবনের সাড়ে তিন ভাগ যাদের মধ্যে কাটিয়ে এলেন, আজ সেখান থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেবার পর যখন পিছন ফিরে তাকাবার অবসর হলো, তাদের দেহে তখন নতুন রং লেগেছে। আসলে তারা যা ছিল, তাই আছে, বদলে গেছে ওঁর চোখের রং।

তাঁর সঙ্গে যেদিন হঠাৎ দেখা, তারপর কয়েক মাস কেটে গেছে। ফতিমা-তোফাজ্জল আমার মনে ঝাপসা হয়ে এসেছে। এমন সময় আবার একদিন তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব।

ভূতনাথবাবুকে ঠিক মেজাজে পেতে হলে একা পাওয়া দরকার। আগের দিন তাই পেয়েছিলাম। এদিন আর হলো না। আমার কাছে অন্য এক ব্যক্তি বসে ছিলেন। আমাদের দুজনেরই চেনা। দুর্ধর্ষ বাঘ-শিকারী কালু চৌধুরী। বাদা-অঞ্চলের লোক। একদিন বহু রয়াল বেঙ্গলের প্রাণ নিয়েছেন। তারাও চেষ্টার ত্রুটি করে নি। নেহাৎ বরাত জোরে বেঁচে গেছেন। অক্ষত দেহে নয়; হাতে, পায়ে, পিঠের ডান দিকে প্রখর নখর ও তীক্ষ্ণ দংশনের গৌরবচিহ্ন অক্ষয় হয়ে আছে। বৈঠকখানার সংলগ্ন দক্ষিণের বারান্দায় বসে সেই সব ইতিহাস শুনছিলাম।

আষাঢ় অপরাহ্নের আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার বর্ষণ শুরু হয়েছে। সবুজ ছাওয়া প্রশস্ত 'লন' এবং তার তিন দিক ঘিরে কৃষ্ণচূড়া, বকুল ও আমগাছের নীচে অকাল সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার। একটানা জল পড়ার শব্দ। সিক্ত

বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ। সব মিলে, শিকার-কাহিনীর যে একটা নিজস্ব নেশা আছে, তাকে আরো গাঢ় করে তুলেছিল।

শুধু শিকারে নয়, তার বর্ণাঢ্য বর্ণনায় কালু চৌধুরীর জুড়ি মেলা ভার। তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ভারী জুতোর শব্দ এবং তার সঙ্গে এক ঝলক কড়া সিগারের গন্ধে সচকিত হয়ে উঠলাম।

কালু চৌধুরী এক সময়ে ছোটখাটো জমিদার ছিলেন। ব্যসন হিসাবে শিকারে যেমন বেরোতেন, তেমনি মাঝে মাঝে দু-চারটা দাঙ্গা ডাকাতি, নারী-হরণ ইত্যাদি অভিযানের অভ্যাসও ছিল। সেই দিক দিয়ে তিনি ভূতনাথ দারোগার পুরনো মক্কেল। আজ যদিও দুজনের ভিতরকার সে সম্পর্ক বদলে গেছে, একজন করছেন পেনসন ভোগ, আরেক জনের জীবনে এসেছে উদ্বাস্তু জীবনের অসংখ্য দুর্ভোগ, তবু ওঁকে দেখে চৌধুরীর মধ্যে একটুখানি আড়ষ্টতা দেখা দিল। ভূতনাথবাবু সেটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বেশ সহজ ও দরাজ গলায় বললেন, কিসের গল্প হচ্ছে? শিকারের? তা, থামলেন কেন? চলুক না।

আমিও তাঁর প্রতিধ্বনি করে সময়োপযোগী উৎসাহ দিলাম। চৌধুরী একটু নড়ে-চড়ে বসে পূর্ব সূত্রে ফিরে গেলেন—'একটা জিনিস বরাবর দেখেছি। বাঘ আর বাঘিনী যখন জোড়ে থাকে একটাকে কোনো রকমে শেষ করতে পারলে, বাকীটার জন্যে আমাদের আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না।'

বললাম, কী রকম? বাকীটার তো আরো সাবধান হবার কথা।

—ঠিক উল্টো। সে তখন প্রতিশোধ নেবার জন্যে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। নিজের প্রাণের দিকে তাকায় না, কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। হিংস্র প্রাণী মাত্রেই রিভেঞ্জফুল, ভয়ানক প্রতিহিংসা-পরায়ণ। তার মধ্যে সব চেয়ে বেশী, বাঘ।

—না।

প্রতিবাদের সুরটা এমন জোরালো, যে আমরা দুজনেই একসঙ্গে বক্তার মুখের দিকে তাকালাম। ভূতনাথবাবু তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে যোগ

করলেন, তাকেও ছাড়িয়ে যায় মানুষ। যাক, আপনি বলুন!

চৌধুরী আবার শুরু করলেন—জোড়ার একটাকে মারবার পর শিকারীকেই বরং সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়। আর একটা যদি তখন ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে থেকে থাকে (প্রায়ই তাই থাকে), যে মেরেছে তাকে চিনে রেখে দেয়। বাগে পেলে আর রক্ষা নেই। তাকে যদি হাতের কাছে না পায়, আক্রোশ গিয়ে পড়ে, যারা তার আপন জন, তাদের ওপর। বৌ, ছেলে, মেয়ে, কিংবা সঙ্গী সাথী ··

ব্যাপারটা আমার কাছে আশ্চর্য মনে হলো। বললাম, আমার ধারণা ছিল, বাঘের কাছে সব মানুষই সমান শত্রু। তার মধ্যে আবার বাছ-বিচার করে নাকি?

—করে বৈকি? অবিশ্যি অন্য লোককে যে একেবারেই ছোঁয় না, তা নয়। বিশেষ করে যেগুলো ম্যান-ইটার, মানুষের রক্তের স্বাদ যারা আগেই পেয়েছে। তবে, প্রায়ই দেখা যায়, ক্ষতি যে করেছে, তার ওপরেই শোধ নেবার চেষ্টা করে। তার জন্যে এমন মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে বসে, অন্য সময়ে, মানে স্বাভাবিক অবস্থায়, যা কখনো নিত না। এই, সেবারে যেমন হলো—

সুন্দরবনে ওঁর নিজেরই একটা শিকার-কাহিনী শোনালেন চৌধুরী। মানুষখেকো বাঘ নয়, অন্তত গোড়াতে ছিল না। কিন্তু ভীষণ দুর্দান্ত। মাসখানেকের মধ্যে গোটা সাতেক গরু-মোষ চলে গেল তার পেটে। এতটা সাহস বেড়ে গেল যে, দিনে-দুপুরে যেখানে সেখানে হানা দেয়। সাত-আট মাইল জুড়ে একটা মস্ত বড় অঞ্চল—সবাই তার ভয়ে তটস্থ। চাষ-বাস, হাট-বাজার বন্ধ হবার যোগাড়। খবর পেয়ে কালু চৌধুরী দুজন পুরনো সাকরেদ নিয়ে রওনা হলেন। এক গ্রামে শুনলেন, তার আগে আরো তিন-চার জন শিকারী পনেরো-ষোল দিন ধরে এখানে-ওখানে চেষ্টা করে গেছে। গাছের ডালে মাচা বেঁধে রাতের পর রাত কাটিয়েছে। বাঘের টিকিও দেখা যায় নি। অথচ ভোর হতে না হতেই খবর এসেছে, মাচা থেকে

কয়েক পা দূরে কার উঠোন থেকে দুধেল গাই নিয়ে পালিয়ে গেছে বাঘ। তার বিশেষত্ব হলো, 'কিল'-এর ধারে-কাছেও ঘেঁষে না। সে দিক দিয়ে অত্যন্ত নির্লোভ।

কালু চৌধুরী কয়েকটা গ্রাম ঘুরে, বেছে বেছে ক'টা নাদুস-নুদুস মোষের বাচ্চা সংগ্রহ করলেন। ওদিকে তখন ভয়ানক জলাভাব। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দু-একটা ডোবা খুঁজে বের করা হলো। তার চারদিকে ব্যাঘ্র মহারাজের বহু পদচিহ্ন। অর্থাৎ খাদ্য যেখান থেকেই জুটুক, পানীয়ের জন্যে ওখানে তাকে ঘন ঘন আসতে হয়। একটি সুবিধাজনক জায়গায় মোষশাবককটিকে বেঁধে, যতটা দূরে সম্ভব, অর্থাৎ, রাইফেলের পাল্লার প্রায় শেষ সীমায় ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে মাচা বাঁধলেন। বাইরে থেকে যেন কোনো রকমে বোঝা না যায়। কাঁটা-ডাল-পালার শেষ টুকরোটা পর্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেওয়া হলো। পর পর দু-রাত গেল। বাঘ এল না।

আস্তানায় ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে পরের রাতটাও দেখবেন স্থির করে সবে দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন, এমন সময় এল এক মর্মান্তিক সংবাদ। গরু-মোষ-ছাগল নয়, বাঘের শেষ এবং সদ্যোলব্ধ শিকার ঐ গ্রামেরই একটি বাইশ-তেইশ বছরের দুঃসাহসী জোয়ান ছেলে। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। একা নয় যথারীতি দল বেঁধে। সঙ্গীরা ছিল অপেক্ষাকৃত ফাঁকার দিকে, ও একটু গভীর বনে ঢুকে পড়েছিল। বিশেষ কারো নজরে পড়ে নি। হঠাৎ তাদের কানে এল প্রথমে সেই ছেলেটির চিৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গর্জন। সবাই মিলে হৈ-হল্লা করে ছুটে গিয়ে দেখল একটা আদ্ধেক-কাটা গাছের গুঁড়ির খানিকটা দূরে ছেলেটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। প্রথমে ডাকাডাকি, তারপর নাড়া দিয়ে দেখা গেল, সব শেষ।

কালু চৌধুরী যখন গিয়ে পেঁছিলেন, তখনো ছেলেটার ঘাড়ের পাশ থেকে অঝোরে রক্ত ঝড়ছে। পিছন দিকের এক তাল মাংসই শুধু উড়ে যায় নি, হাড়গুলোও গুঁড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ, আঘাত আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান বোধহয় কয়েক সেকেণ্ড।

শিকারীর অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লাশ এবং তার আশপাশটা পরীক্ষা করলেন চৌধুরী। উরুর পিছনে আর একটা জখম চোখে পড়ল। সেটা দাঁতের। বাঘ যে অমিতশক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার উপরে নররক্তের কিঞ্চিৎ আস্বাদন তার রসনায় পৌঁছে গেছে। তবু দেহটাকে ফেলে গেল কেন? চারিদিকটা আরো ভাল করে দেখা দরকার। এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ লোক-গুলোর পিছন থেকে একটা আর্ত তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ তাঁকে বাধা দিল। সবাইকে ঠেলে ফেলে ঝড়ের মত ছুটে এসে মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে মেয়েটি, তার বয়স বোধহয় ষোল পেরোয় নি। কালো রং, নিটোল স্বাস্থ্য, বড় বড় দুটি চোখ। কয়েক মাস আগে ওদের বিয়ে হয়েছে। জল আনতে গিয়েছিল বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ফিরবার পথেই খবর পেয়েছে। কাঁখের কলসী ফেলে দিয়ে মাঠ-ঘাট-জঙ্গল পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছে। সঙ্গিনীরা ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিল, পারে নি। স্বামীর পিঠের উপর লুটিয়ে পড়ে তাদের স্বল্পস্থায়ী বিবাহ-জীবনের স্মৃতিভরা কত তুচ্ছ কথা বলে বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। মাথার আঁচল খুলে পড়েছে, একরাশ এলো চুল ছড়িয়ে গেছে পিঠময়। মুখে কপালে, চোখের কোণে অশ্রুধারার সঙ্গে মিশে গেল রক্ত। এ কান্নার যেন শেষ নেই। এ শোকের কোনো তুলনা নেই। একটা গোটা গ্রামের এতগুলো নরনারী তাদের সব কলরব, সমস্ত উত্তেজনা ভুলে গিয়ে স্তব্ধ পাথর হয়ে গেছে।

কালু চৌধুরীও কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন জঙ্গলের দিকে। শুকনো পাতার উপর খানিকটা রক্ত। এক জায়গায় নয়, মাঝে মাঝে ফাঁক রেখে রক্তের একটা লাইন চলে গেছে। অর্থাৎ, আততায়ী অক্ষত দেহে যেতে পারে নি। তখন খোঁজ পড়ল, ছেলেটার হাতে যে টাঙ্গী ছিল, সেটা কোথায়? টাঙ্গী নেই। ভিড়ের মধ্যে একটা কলরব উঠল। এই গভীর শোকাবহ দৃশ্য এতগুলো লোককে মুহ্যমান করে রেখেছিল। শুকনো মুখগুলো হঠাৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সকলের কণ্ঠেই একটা স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

সাবাস জোয়ান! প্রাণ দিয়েছে বটে, কিন্তু প্রাণ নিতে যে এসেছিল, তাকেও ঘায়েল না করে ছাড়ে নি। কী কব্জীর জোর! টাঙ্গীটা এমন মোক্ষম জায়গায় বসিয়েছে, অতবড় বাঘের সাধ্য হয় নি খসিয়ে ফেলে। বাছাধনকে সেটা ঘাড়ে করেই পালাতে হয়েছে। *

এরা সুন্দরবনের লোক। বাঘ, সাপ, কুমীর আর বুনো শুয়োর এদের নিত্যসঙ্গী। তার উপরে মাঝে মাঝে আসে বন্যা, মহামারী। উঠতে বসতে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী। যমের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। সেই লড়াইয়ের উত্তেজনা প্রিয়জন-বিয়োগের বেদনাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে দেয় না। এই লোকগুলোও যখন দেখল, এই মৃত্যুটা যত বড় করুণই হোক, কাপুরুষের মৃত্যু নয়, মুহূর্তমধ্যে নিজেদের টেনে তুলে চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

কয়েকজন যুবক এগিয়ে এসে শিকারীকে ঘিরে ধরল—টাঙ্গী নিয়ে বাঘ খুব বেশী দূর যেতে পারে নি। জখমের ফলে অনেকখানি কাবু হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। সবাই মিলে ধাওয়া করলে এখনই ধরে ফেলা যায়। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। চৌধুরী তাদের নিরস্ত করলেন। বহুদর্শী শিকারী। আহত বাঘ যে কী বস্তু, তাঁর জানা আছে। ধরা হয়তো যাবে, শেষপর্যন্ত মারাও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু প্রাণ দেবার আগে আরো দু-একটা প্রাণ সে না নিয়ে ছাড়বে না। তিনি মনে মনে অন্য কথা ভাবছিলেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা কঠিন। করলেও এরা রাজী হবে না, বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজন। তবু এই উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে প্রস্তাবটা করে ফেললেন।

ছেলেটার বাপ বসেছিল ভিড় থেকে খানিকটা তফাতে একটা গাছের নীচে। তার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দও এতক্ষণ শোনা যায় নি। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারই কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন চৌধুরী। বললেন, দেহটাকে যদি একটা রাত যেমন আছে ঠিক তেমনি ভাবে রেখে দেওয়া যায়, তিনি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বাপ বিস্ময়ে বেদনায় মুখ তুলে তাকাল, কোনো উত্তর দিল না। এদিক-ওদিক চেয়ে প্রতিবেশীদের উদ্দেশে

বলল, তোরা এখনো বসে আছিস ? বেলা আর নেই, খেয়াল আছে ?

তাই তো ! আশেপাশে অনেকে সজাগ হয়ে উঠল। সৎকারের আয়োজন এখনই শুরু করা দরকার। শ্মশান নেহাৎ কাছে নয়। সামনে অন্ধকার রাত। কয়েকজন প্রৌঢ় ও যুবক উঠে পড়ল। এক জন বয়স্ক লোক চৌধুরীকে একপাশে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় বলল, সে হয় না বাবু। মড়া বাসী করতে নেই। দোষ হয়। ওটা আমরা পারবো না।

অনেকেই যাবার পথে পা বাড়িয়েছে, মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ বৌটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে এগোতে যাবে, এমন সময় কানে গেল তার দৃঢ় এবং স্পষ্ট কণ্ঠস্বর—'দাঁড়াও।'

সকলে থমকে দাঁড়াল।

কালু চৌধুরীও অবাক হয়ে দেখলেন, মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখে জল নেই, সমস্ত মুখখানায় যেন একটা স্থির সংকল্পের কাঠিন্য। ধীরে ধীরে তাঁরই কাছে সরে এসে তর্জনী তুলে বলল, ওকে এখানে রেখে দিলে এই রাতের মধ্যে বাঘটাকে মারতে পারবে ?

ঐটুকু মেয়ের কাছ থেকে এ রকম প্রশ্নের জন্যে চৌধুরী প্রস্তুত ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই থতমত ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন, পারবো কি না ঠিক করে কি বলা যায় ? যদ্দূর পারি, চেষ্টা করবো।

'চেষ্টা !' হঠাৎ চমকে উঠলেন কালু চৌধুরী। তাঁর মুখের উপর যেন একতাল কাদা এসে পড়ল। 'চেষ্টা না ছাই, চেষ্টা করলে কি আজ আমার—'

বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত কান্নায় মেয়েটি ভেঙে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে। সেইদিকে চেয়ে চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী বলবেন, কোন্ কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেবেন, ভেবে পেলেন না।

সহসা আবার তড়িৎস্পৃষ্টের মত সে উঠে দাঁড়াল। দু'চোখে আগুন ছড়িয়ে বলল, কিসের শিকারী তুমি ? একটা বাঘই যদি না

মারতে পারলে, এতগুলো বন্দুক দিয়ে কি কর ?

ওর গুরুজন যারা ছিল, উঠে এসে মেয়েটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কেউ মৃদুকণ্ঠে তিরস্কার করল—ছিঃ ছিঃ, অমন করে বলতে হয়।

চৌধুরী যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। বললেন, ঠিকই বলেছে। ওর কোনো দোষ নেই। তোমাদের কাছে আমি একটিমাত্র ভিক্ষা চাইছি। আজকের মত আমাকে একটা শেষ সুযোগ দাও। সমস্ত রাত রাখতে হবে না। ভোর চারটে পর্যন্ত থাক। তারপর এসে নিয়ে যেও।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি বাড়ি যাও। কথা দিলাম, এ বাঘ না মেরে আমি ঘরে ফিরব না।

মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল। চৌধুরী দেখলেন, তার ভিতর থেকে উপ্‌চে পড়ছে সরল কৃতজ্ঞতা। কি যেন বলতে গিয়ে বলল না। বোধহয় লজ্জা হলো। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। পরক্ষণেই সকলের দিকে চেয়ে অনেকটা যেন নির্দেশের সুরে বলল—চলে এস তোমরা।—বলে আর দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। লোক-গুলোও যেন মন্ত্রচালিতের মত তাকে অনুসরণ করল।

কালু চৌধুরীর অনুমান, বাঘ এখানে বিশ্রাম করছিল, ছেলেটাকে আক্রমণ করবার কোনো মতলব হয়তো তার ছিল না। ও-ই হঠাৎ দেখতে পেয়ে টাঙ্গী চালিয়ে থাকবে। ক্ষেপে গিয়ে লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড় মটকে দিয়েছে, এবং ছেলেটার মরণ-চিৎকার আর লোকজনের শোরগোল শুনে লাশ না নিয়েই পালিয়ে গেছে। টাঙ্গীটা তার দেহের কোনোখানে বিঁধে রয়েছে। পরে যদি খুলেও গিয়ে থাকে, এই আঘাতের জ্বালা সে ভুলতে পারবে না। লোকজন সরে গেলে নিশ্চয়ই একবার শোধ নিতে আসবে। তাছাড়া মানুষের উষ্ণ রক্ত ক্ষণেকের জন্যে হলেও তার রসনা স্পর্শ করেছে। সে টানও কম নয়। তার চেয়েও প্রবলতর আকর্ষণ—প্রতিহিংসা। সে যে আসবেই সে সম্বন্ধে চৌধুরী প্রায় নিশ্চিত ছিলেন।

মুশকিল হলো মাচা বাঁধা নিয়ে। বাঘ যদি সন্দেহ করে, ধারে

কাছে কোনোখানে শিকারীর বন্দুক ওৎ পেতে বসে আছে, প্রতিহিংসার তাড়না যত বড়ই হোক, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়তো তাকে বাধা দেবে। সুতরাং একটা ক্যামোফ্লেজ দরকার, শিকারের চোখে ধুলো দেবার মত খানিকটা গাছ-পালার অন্তরাল। হাতে সময় অতি অল্প। তার মধ্যে কোনোরকম করে একটা মাচা খাড়া করা হলো। ত্রুটি রয়ে গেল অনেক। তখনকার মত আর কোনো উপায় ছিল না।

রাতের মত সামান্য কিছু মুখে দিয়ে একজন হুঁশিয়ার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এবং রাইফেল, টর্চ ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে সন্ধ্যার পর থেকেই মাচায় চড়ে বসলেন। সময় আর কাটতে চায় না। মুহূর্তগুলো যেন ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে, ঠেলে সরানো যায় না।

মাচায় বসে রাত কাটানো কালু চৌধুরীর জীবনে এই প্রথম নয়। সুন্দরবনের মশার পরিচয় আগেও অনেক পেয়েছেন। কাঠপিঁপড়ার দলবদ্ধ দংশন যে কি বস্তু, তার আস্বাদও জানা আছে। ওগুলোর কোনোটাই তাঁর গায়ে লাগে না। আজও লাগল না। শিকারকে তিনি শিকারীর দৃষ্টি দিয়েই দেখে এসেছেন। এল তো ভাল, না এলে সমস্ত রাত্রির ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত বা উত্ত্যক্ত হন নি। নিতান্ত সহজ ভাবেই নিয়েছেন, কিন্তু আজ তিনি অধীর, অস্থির, অসহিষ্ণু। ঐ আশ্চর্য মেয়েটা তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। কখনো সেই দুটি দীপ্ত চক্ষু, কখনো সেই অশ্রুসিক্ত করুণ মুখখানা থেকে থেকে চোখের উপর ভেসে উঠছিল। নিজের মুখে তাকে কথা দিয়ে এসেছেন, তার স্বামীহন্তাকে শেষ না করে এখান থেকে তাঁর ছুটি নেই। আর মাত্র কয়েকঘণ্টা সময় তাঁর হাতে। যদি ব্যর্থ হন, কোন্ মুখ নিয়ে দাঁড়াবেন তার সামনে?

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। সহকারীর মৃদু স্পর্শে সচেতন হয়ে উঠলেন। সামনের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, দূরে ঐ দুটো বড় গাছের মাঝখানে অন্ধকারটা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছিল, হঠাৎ আবার গাঢ় হয়ে উঠল। শুধু গাঢ় নয়, সচল। ধীরে ধীরে

অত্যন্ত সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। চৌধুরী রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সহসা সেই জমাট অন্ধকারের বুক চিরে দুটো অগ্নি-গোলক দপ করে জ্বলে উঠল। তারই মাঝখানে নিশানা নিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংহত করে তৈরি হয়ে রইলেন কালু চৌধুরী। এখনো পাল্লার বাইরে। আর একটু, আর শুধু এক ধাপ এগিয়ে এলেই গর্জে উঠবে রাইফেল। অব্যর্থ তার সন্ধান, অমোঘ তার শক্তি।

…হলো না। অন্ধকার হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

অস্ফুটকণ্ঠে একটা কুৎসিত গালাগালি উচ্চারণ করে (বোধহয় নিজেরই উদ্দেশে) কপালের ঘাম মুছলেন চৌধুরী। সমস্ত মন ক্ষোভে নিরাশায় ভরে গেল। আর আশা নেই। যেমন করে হোক, টের পেয়ে গেছে।

ভোরের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এখনই লোকগুলো লাশ নিতে আসবে। ঘায়েল বাঘকে বিশ্বাস নেই। কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে, কে জানে? যে আশা নিয়ে আসছিল, তার এই ব্যর্থতা হয়তো তাকে আরো মরীয়া করে তুলেছে। একটা ফাঁকা আওয়াজ করে তাড়িয়ে দেবেন কিনা ভাবছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে জঙ্গলের বাইরে থেকে একটা ভয়ার্ত শোরগোল কানে এল। তৎক্ষণাৎ গাছ থেকে নেমে পড়ে দুজনে ঊর্ধ্বশ্বাসে রাইফেল হাতে ছুটলেন। গিয়ে যা দেখলেন, শুধু করুণ, বীভৎস ও মর্মস্পর্শী নয়, অতবড় বিস্ময় তাঁর বহুদর্শী শিকারী-জীবনে কোনোদিন চোখে পড়ে নি, কোথাও ঘটেছে বলেও শোনেন নি। বাঘ নামক জানোয়ারকে দেখবার চিনবার বহু সুযোগ তাঁর হয়েছে। তিনি জানেন, প্রতিহিংসা তার রক্তজ ধর্ম। তার বহু দৃষ্টান্ত তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর চেয়েও অভিজ্ঞ অনেক শিকারীর মুখে শুনেছেন। কিন্তু সে যে এমন একটা আশ্চর্য নিপুণ রূপ নিতে পারে, একথা তাঁর জানা ছিল না।

চার-পাঁচজন সশস্ত্র পুরুষ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি যুবতী মেয়ে, এখান থেকে কয়েক শ'গজ ব্যবধানে জঙ্গলের মধ্যে যেমন করে পড়ে আছে একটি

বলিষ্ঠ যুবক। এর কাঁধের উপরেও সেই একই নখর-চিহ্ন, মাথাটা ঠিক তেমনি ভাবে এক দিকে ঝুলে পড়েছে।

চৌধুরীকে দেখে লোকগুলো যেন সংবিৎ ফিরে পেল। সকলে মিলে একই সঙ্গে ভয় ও উত্তেজনা মিশিয়ে যে বর্ণনা দিল তার থেকে বোঝা গেল, সমস্ত রাত মেয়েটা একবারও হুচোখের পাতা এক করে নি। কান পেতে বসেছিল, কখন বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে দেখবে, বাঘটার চোখহুটো উড়ে গেছে, কিংবা সোজা বুকের মধ্যে ঢুকে গেছে বন্দুকের গুলী। ভোরের দিকে ওরা যখন খাটিয়া নিয়ে রওনা হলো, কিছুতেই তাকে ধরে রাখা গেল না। ওকে মাঝখানে রেখে, টাঙ্গী হাতে সামনে হুজন, আর পিছনে তিনজন চারদিকে চোখ রেখে বেশ হুঁশিয়ার হয়েই আসছিল। হঠাৎ এক ঝলক চোখ-ধাঁধানো বিহ্যৎ-চমকের মত কোথা থেকে কী যেন ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড মেঘ-গর্জন। কী যে হলো, ঠাহর করবার আগেই দেখতে পেল, তারা যেমন ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখান থেকে শুধু একজন পড়ে আছে, মুখ থুবড়ে।

এতক্ষণ একটানা বলে যাচ্ছিলেন কালু চৌধুরী। এবারে হঠাৎ থেমে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে মুখ তুলে বললেন, ঠিক চার দিনের মাথায় সেই বাঘ আমারই হাতে মারা পড়ল। ঘাড়ের উপর মস্ত বড় একটা ঘা। তাতে পচ ধরতে শুরু করেছে। আমাকে ঘিরে সবাই মিলে যখন বাহবা দিতে লাগল, আমি লজ্জায় মরে গেলাম।

অতটুকু একটা মেয়েকে যে কথা দিয়েছিলাম, রাখতে পারি নি। তাকেও রাখা গেল না।

ভূতনাথ এতক্ষণ নিঃশব্দে বসেছিলেন। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল, জানোয়ারটা নিশ্চয়ই বাঘিনী?

চৌধুরী মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ। আপনি কেমন করে জানলেন স্যর?

—জানবো আর কেমন করে? আন্দাজ করছি।

সুরটা 'আন্দাজে'র নয়। ওটা যে বাঘিনী, সে বিষয়ে মনে মনে নিশ্চিত হয়েই যেন প্রশ্নটা করেছিলেন। আমরা দুজনেই একটু বিস্মিত হলাম।

ভূতনাথ সেটা লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা যা ভাবছেন, তা নয়। কালুবাবুর বিদ্যা আমার জানা নেই। বনের বাঘিনীর খবর রাখি না। লোকালয়ে যে দু-একটি দেখেছি, তার থেকেই অনুমান করে নিয়েছিলাম।

ব্যাপারটা আরো রহস্যময় হয়ে উঠল। সে সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করবার আগেই কালু চৌধুরী ক্ষান্ত-বর্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে উঠবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যে-কারণে বহুকাল অদর্শনের পর তিনি আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলেন, তার সঙ্গেও শিকারের যোগ ছিল। অতগুলো বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে খানিকটা অসুবিধায় পড়েছিলেন। আমার সাহায্যে যদি কর্তৃপক্ষের অনুদার মনোভাব দূর হয়, সেই আশা নিয়েই আসা। আমার যতটা সাধ্য, সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলাম। তিনি ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলেন।

চৌধুরীকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে ভূতনাথের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, কি দেখছেন? আজ আর কোনো মতলব নিয়ে আসি নি। এমনিই এলাম।

—গাড়ি ধরবার তাড়া নেই তো?

—না, রাতটা মেয়ের বাড়িতে থেকে যেতে হবে। সেদিন থাকি নি বলে ভয়ানক রেগে গেছে।

—তাই বুঝি ছুটে আসতে হলো?

—কী আর করি বলুন? তাছাড়া, আপনার সঙ্গে বসে পুরনো দিনগুলোকে উল্টে-পাল্টে দেখা, সে লোভটাই বা কম কিসে?

বলে হেসে উঠলেন।

আমি বললাম, তাহলে শুরু করুন। মুখপাত, মানে ইনট্রোডাকশন তো হয়েই আছে।

—কিসের ?

—কেন, বাঘিনী ?···বনের নয়, লোকালয়ের।

—ও, কিন্তু সে তো শিকার-কাহিনী নয়। তার মধ্যে আর যাই থাক, থ্রিল পাবেন না।

—থ্রিলের চাইতে গভীর কিছু পাবো। কালু চৌধুরীকে তখন যে প্রশ্ন করলেন, তার থেকে মনে হচ্ছে উনি যে বাঘিনীর কথা শুনিয়ে গেলেন, আর আপনি যাদের দেখেছেন, দুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো মূলগত মিল আছে।

—আমার তো তা-ই বিশ্বাস। আপনি হয়তো মানতে চাইবেন না। সাহিত্যিক মানুষ। আপনার, শুধু আপনার কেন, সংসারে অনেকের চোখেই পুরুষের তুলনায় মেয়েজাতটা অনেক বেশী কোমল, স্নেহে, করুণায়, মমতায় অতি সহজে গলে যায়, ইত্যাদি। তাদের আরেকটা রূপ হয়তো আপনারা দেখেন নি। বুকে যখন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে, তখন ওরা যা পারে বা করে বসে, কাদের মোল্লারাও সেখানে হার মানবে।

অর্ধবিস্মৃতির ধূলি-মলিন আবরণ ভেদ করে একটি অস্পষ্ট নারী-মূর্তি আমার চোখের উপর ভেসে উঠল। বললাম, এই জাতের একজনকে আমিও চিনি। তবে বাঘিনীর চেয়ে নাগিনীর সঙ্গেই তার মিল বেশী।

—আপনার কাশিম ফকিরের রূপসী বিবি কুটী বিবির কথা বলছেন তো ? কিন্তু কাদেরের মত সে-ও শেষ রক্ষা করতে পারে নি।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে চেয়ে কথাটা আর একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন,—কাদের তবু নিজেকে অন্ততঃ বোঝাতে চেয়েছিল, ফাঁসির দড়ি গলায় পরে সে তার বোনাইয়ের ওপর চরম প্রতিশোধ নিয়ে গেল। কুটী বিবির তো সে সান্ত্বনাও নেই। একদিন যার ওপরে 'শোধ নেবো' বলে বাইশ মাইল ছুটে গিয়ে থানার বারান্দায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, আরেকদিন তারই 'গলা বাঁচাবার' জন্যে উকিলের হাতে সর্বস্ব তুলে দিতেও তার বাধে নি।

—বোধহয় সে-ও এক ধরনের শোধ নেওয়া, নিজের ওপরে নিজের প্রতিশোধ।

—তাই যদি হয়, সেখানে তার নাগিনীর খোলশ খুলে পড়ে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে, আপনারা কাব্য করে যাকে বলেন, 'চিরন্তনী নারী'। কিন্তু আমি যার কথা বলছিলাম, সে একেবারে জাত-বাঘিনী। যে প্রতিশোধ সে নিয়েছিল, সেটাও নিছক এবং নির্জলা জৈব প্রতিহিংসা।

বলতে বলতে ভূতনাথবাবুর চোখদুটি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। হঠাৎ আবার প্রবল বেগে শুরু হলো ধারা-বর্ষণ। আমি আমার চেয়ারটা আর একটু কাছে টেনে নিলাম। বর্ষামুখর অন্ধকারের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে তিনি অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, তার নাম ছিল,—থাক, আসল নামটা না-ই বা বললাম। তার চেয়ে আপনি একটা নতুন নাম দিন।

বললাম, বনানী।

—বড্ড আধুনিক হয়ে গেল না?

—তা হোক, ওর মধ্যে একটা রহস্যের অন্ধকার আছে। আপনি শুরু করুন।

—বেশ।

ভূতনাথবাবুর প্রায় সব কাহিনীর গোড়াতেই একটা করে প্রারম্ভিক প্রশ্ন থাকে। ঠিক প্রশ্ন নয়, বলা যেতে পারে, কোনো অ্যাসাম্প্‌শন বা কিছু একটা ধরে নেওয়া, যার আকারটা প্রশ্নের।

—ছেলেবেলায় ভূগোল পড়েছিলেন নিশ্চয়ই?

বললাম—পড়েছিলাম। মানে, পড়তে হয়েছিল। পরীক্ষা নিতে চাইলে মুশকিলে পড়ে যাব। ইস্কুলে থাকতে ঐ ভূগোলটা বড় গোল বাধাত।

—তা হলেও, বাংলাদেশের ম্যাপটা মোটামুটি মনে আছে তো? গোটা বাংলার কথা বলছি, আপনারা যাঁকে বলেন, আনডিভাইডেড্‌

বেঙ্গল। কথাটা আমি একেবারেই সইতে পারি না। ওর মধ্যে একটা রাজনৈতিক মতলব আছে। ইংরেজদের ঐ 'ডিভাইড্' নামক কীর্তিটাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তা না হলে, অংশ দিয়ে গোটা জিনিসের পরিচয়, এ কোন্ দেশী নিয়ম ?

যাই হোক, সেই পুরনো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ম্যাপটা মনে করবার চেষ্টা করুন। বাঁ দিক দিয়ে নেমে এসেছে ভাগীরথী, আর ডান দিক দিয়ে পদ্মা-মেঘনা। দুটো ধারাই পড়েছে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে। মাঝখানে একটা বৃহৎ ব-দ্বীপ। আমাদের ভূগোলের মাষ্টার বলতেন, 'বদ্ দ্বীপ। মানুষগুলো সব বদ্। তোদের দিয়েই তো দেখতে পাচ্ছি।' তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের লোক। ঐ 'ব'-এর মধ্যে পড়েন না। আমরা সকলেই 'ব'। রসিকতার ছলে বললেও কথাটা আমাদের লাগত। আমরা সামনে কিছুই বলতাম না, আড়ালে বলতাম ঘটি-মাস্টার।

এই ত্রিভুজের তলার দিকে অনেকগুলো সরু সরু সবুজ রেখা দেখতে পাবেন। সব গিয়ে মিশেছে বে অব্ বেঙ্গলে। যত দক্ষিণে যাবেন, ততো বেশী। ওগুলো সব বড় বড় নদী। কোনো কোনোটা পদ্মা-মেঘনার চেয়েও বড়। এ পারে দাঁড়ালে ওপার চোখে পড়ে না। কিন্তু ম্যাপে বা ভূগোলে কোনো নাম নেই। কাছাকাছি যারা থাকে, কিছু একটা বলে ডাকে। গাঁয়ের লোকের দেওয়া গেঁয়ো নাম। আপনার পছন্দ হবে না। ওরই একটা নাম-না-জানা নদীর ধাবে সুপুরি নারকেল, মাদার আর ঢাকাই ভেরেণ্ডার ঘন বনের আড়ালে খানকয়েক টিনের চালা নিয়ে একটি ছোট পরিবার। জনচারেক লোক। মাঝবয়সী বাপ, জোয়ান ছেলে, ছেলের মা আর বৌ। সে-ই হল আপনার বনানী।

হেসে বললাম, আমার বনানী হল কেমন করে ?

—বাঃ, নামকরণের একটা প্রাপ্তি আছে তো। তার ওপরে অমন সুন্দর নাম। বাপ ছেলের নাম দুটোও কি আপনি দেবেন ?

—না, ওখানে আমার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই।

—বুঝেছি। তাহলে আমিই দিচ্ছি। ধরুন গোপী আর সুবল। সুখী গেরস্তই বলা চলে। অবস্থা সচ্ছল। নদীর চরে বিঘেকয়েক ধান জমি, তাতে সোনা ফলে। বছরের খরচ স্বচ্ছন্দে চলে যায়। তার ওপরে সুপুরি-বাগান, ওদেশের যেটা প্রধান খন্দ। এ ছাড়া গোপী বর্মনের কিছু কারবারও ছিল। চালানি কারবার। কখনো সুপুরি-নারকেল, কখনো ধান-চাল বোঝাই দিয়ে কয়েকজন বাঁধা লোক নিয়ে বড় বড় ছই-ওয়ালা নৌকোয় (ও অঞ্চলে বলে ঘাসি নৌকো) পাল তুলে চলে যায় শহরের দিকে। ফিরতে দু-তিন মাস লেগে যায়, কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী।

এই চালানি ব্যাপারটা আসলে ছিল শিকারীর 'ক্যামোফ্লেজ', কালু চৌধুরী যার আড়ালে বসে বাঘের চোখে ধুলো দেয়। গোপীর বাহাদুরি আরো বেশী; সে দিত পুলিসের চোখে। আদত কারবারটা ছিল তার পিছনে, শিকারীর মাচার মত অন্ধকারে ঢাকা। সেও এক ধরনের চালানি। তফাৎ শুধু এই, মাল রওনা হবার খবরটা পাওয়া যেত, সে মাল কোথায় গিয়ে পৌঁছল, তার হদিশ মিলত না। তাছাড়া, কারবারী লোকটি সব সময়েই নেপথ্যে। এই ধরুন, পানসি সাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে বর চলেছে বিয়ে করতে। সঙ্গে দামী দামী জিনিস-পত্তর। তারপরে যে কি হল, কোনো পাত্তা নেই। এক গা গয়না পরে পাঁচটা তোরঙ ভর্তি দান-সামগ্রী নিয়ে কনে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। শুভ লগ্নে নৌকো ছাড়ল, কিন্তু ঘাটে আর ভিড়ল না। জমিদারের নায়েব্ লাটের কিস্তির টাকা বোঝাই দিয়ে সদরের পথে বজরা ভাসালেন। সঙ্গে লাঠি-সোঁটা, বন্দুক, পাইক-বরকন্দাজ। সব সুদ্ধ কোথায় কেমন করে তারা অদৃশ্য হল, সে খবর এপারে ওপারে কোথাও গিয়ে পৌঁছল না।

পুলিসের জানা ছিল, এই সব ঘটনার প্রায় সবগুলোর পেছনেই রয়েছে একখানা ছিপ, তীরের মত তার গতি, তার মধ্যে কয়েকটা মাত্র লোক এবং তাদের যে চালায় তার নাম গোপী বর্মন। কিন্তু রিভার পুলিসের লঞ্চ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। তাড়া

করলেই চোখের উপর ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যায়। লঞ্চের সারেঙ্ আর খালাসিদের বিশ্বাস, লোকটা মস্ত বড় গুণিন, অদৃশ্য হবার মন্ত্র জানে। জল-পুলিসের সিপাই জমাদার, এমন কি কয়েকজন দারোগাবাবুকেও সেই কথা বলতে শোনা গেছে। ভূতশুদ্ধি, প্রেতশুদ্ধি সব রকম বিদ্যাই নাকি তার জানা আছে। তা না হলে বন্দুকের গুলি এড়ায় কি করে? একশ গজ দূর থেকে পাকা নিশানা নিয়ে রাইফেল ছুঁড়ে দেখেছে, লাগে নি।

একবার একখানা কাঁঠালের নৌকো মাল বিক্রী করে দেশে ফিরছিল। ধোপাডাঙার খাল পেরিয়ে বড় গাঙে পড়তেই কোত্থেকে একখানা ছিপ যেন বাজের মত উড়ে এসে ছোঁ মারল।

আমার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, কাঁঠালের নৌকো! তাতে আর কত টাকা ছিল?

তা কম কি? তিন-চার হাজার তো বটেই।

—বলেন কি! কাঁঠাল বেচে অত টাকা!

—সে সব কাঁঠাল আপনি দেখেন নি তাহলে। তার নাম ভাটির কাঁটাল। এক একটার ওজন আধমণ, ত্রিশ সের। কোয়াগুলো পাক্কা এক পো, পাঁচ ছটাক। গালা নয়, মানে, গালিয়ে রস করে দুধে মিশিয়ে খাবার জিনিস নয়। খাজা; কচ কচ করে চিবিয়ে খায়। ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনায় ভাটির কাঁঠালের ভারী খাতির। তার কাছে রসগোল্লা কোন্ ছার। দেশী কাঁঠালের খন্দ শেষ হবার পর, অর্থাৎ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে হাটে হাটে বড় বড় নৌকোর ভিড় লেগে যায়। ছোট্ট ছইটুকু বাদ দিয়ে বাকী জায়গা জুড়ে এক একটা কাঁঠালের পাহাড়। গেরস্তের হাতে তখন পাট বিক্রীর চকচকে নোট। এদিকে আউষ ধানও ঘরে উঠে গেছে। দু-চার মাসের মত খোরাকির ভাবনা নেই। ব্যস, আর কি চাই। হাট-ফেরতা প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে রাম কাঁঠাল, আর হাতে একসের দেড়সের ওজনের ইলিশ মাছ।...থানায় থানায় পুলিসের ক্রাইম বেড়ে যায়।

—কেন ? এর মধ্যে আবার পুলিস এল কোথেকে ?

—খালি খালি কি আর আসে ? ঐ কাঁঠাল আর মাছের টানে আসতে হয়। ঐ নিয়ে প্রথমে বাধে মানের লড়াই, দেখতে দেখতে সেটা আসল লড়াইতে গিয়ে ঠেকে।

—মানের লড়াইটা কি রকম ?

—কি রকম ? এই ধরুন, মাঝের-পাড়ার মুন্সীসাহেব ইলিশ মাছ দর করছেন। জেলে বলেছিল, তিন টাকা, উনি পাঁচসিকে থেকে সাতসিকে পর্যন্ত উঠেছেন, এমন সময় দক্ষিণ-পাড়ার চৌধুরী সাহেব ওধার থেকে বলে বসলেন, দু-টাকায় দিবি ? ব্যস্, লেগে গেল।

'টাকার গরম দেখাচ্ছ নাকি মিঞা-সাহেব ?'

'মনে কর তো, তাই। টাকা থাকলে তার গরমও থাকে।'

'বটে ?' দু-পক্ষেই লোক জড়ো হলো। মুখোমুখী থেকে হাতাহাতি, তারপর লাঠি, সড়কি, বল্লম। আধঘণ্টার মধ্যে পাঁচটা জখম, একটা খুন্।

—এ সব তো জানা ছিল না।

—কেমন করে জানবেন ? গাঁয়ে তো আর থাকতে হয় নি আমাদের মত। ডিস্ট্রিক্ট্ টাউনের বাইরে কোনোদিন পা দেন নি।

—তা দিই নি, তবে ঐ সব চীজ নিয়ে আমাকেও তো ঘর করতে হয়েছে।

—আপনি পেয়েছেন তৈরী ফসল। তার পেছনে যে জটিল ক্রিয়া-কলাপ—বীজ-সংগ্রহ থেকে ঘরে তোলা—তার আঁচটুকুও গায়ে লাগে নি। সে সব এই পুলিসের ঘাড়ে। যাক, এবার শুনুন।

ছিপের লোকগুলো যখন বড় নৌকোয় লাফিয়ে উঠল, ব্যাপারীরা লাঠি, সড়কি, ল্যাজা নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বড় বড় গাঙ্ পাড়ি দিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে হলে ওসব সরঞ্জাম সঙ্গে রাখতে হয়। কিন্তু ডাকাতরা দলে ভারী, হাতিয়ারগুলোও মারাত্মক। ফলে, এদের একজন সঙ্গে সঙ্গে সাবাড় আর দু-তিনটা জখম। বাকী যারা ছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর মধ্যে। তারই একজন কোন রকমে

সাঁতরে গিয়ে ডাঙায় উঠেছিল। গোপী বর্মনের বাড়ির কাছাকাছি তার বাড়ি। রং-টং মাখা থাকলেও গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পেরেছিল। পুরো একদিনের পথ হেঁটে কোন রকমে থানায় গিয়ে খবরটা জানিয়েছিল।

গোপীকে তখন পাওয়া যায় নি। পুলিস তাকে তাকে ছিল। দিন পনের পরে বাড়ি ফিরতেই ধরে নিয়ে হাজতে পুরে দিল। মাল-পত্তর টাকা-কড়ি কিছুই পাওয়া গেল না। যে-লোকটা খবর দিয়েছিল, সেও কদিন পরে পিছিয়ে গেল। গাঁয়ের লোকে ভয় দেখিয়েছিল, গোপীর বিরুদ্ধে 'সাক্ষী দিলে' সে 'বাণ মারবে'। 'বাণ-মারা' কি, জানেন তো?

—কথাটা শুনেছি, ব্যাপারটা যে কী, ঠিক জানি না।

—এক রকমের মন্তর। যাকে লক্ষ্য করে উচ্চারণ করা হবে, তার আর রক্ষা নেই, তেরাত্তির পেরোবার আগেই গুষ্ঠীশুদ্ধ মুখে রক্ত উঠে মারা যাবে।...কাজেই ফরেদীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

সাক্ষী নেই, মাল নেই, মামলা দাঁড়াবে কিসের ওপর? আসামীকে আর হাজতে আটকে রাখা চলে না। রিভার পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টর কালীপ্রসাদ মুখুজ্যে নিজেই তদন্ত চালাচ্ছিল। সবে প্রমোশন পেয়েছে। আশা করেছিল, গোপী বর্মনকে গেঁথে তুলতে পারলে রাতারাতি কনফারমেশন। আশাটা শুধু মনে মনে রাখে নি, একটা সাক্ষী হাতে পেয়েই বন্ধু-মহলে ছড়াতে শুরু করেছিল। কাজেই বুঝতে পারছেন, ওকে একেবারে আদাজল খেয়ে নামতে হলো। হাকিমের হাতে-পায়ে ধরে কোনো রকমে আর চৌদ্দটা দিন জামিন বন্ধ রাখবার ব্যবস্থা করল। তারপর সেই রাত্রেই লঞ্চ্ নিয়ে রওনা হলো আসামীর গাঁয়ের দিকে।

প্রথম কদিন নানাজনের কাছে খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা চলল। দেখা গেল, বর্মনদের উপরে আশে-পাশের লোকজন কেউ বিশেষ খুশী নয়। কিন্তু আসল ব্যাপারে সব মুখ বন্ধ। তন্ত্র-মন্ত্রের কাছে পুলিস কোন্ ছার। ইন্টারোগেশনের নাম করে কালীপ্রসাদ বেছে

বেছে কারো কারো ওপরে দু-চারটা ডোজ যা চালাল, তাকে হালকা বলা চলে না। কিন্তু হাজার হলেও বাপ-মারার তুলনায় সেগুলো কিছু নয়। আর কোথাও কোনো সুবিধে করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ধরল গিয়ে সুবলকে। সে আবার দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। বাপের ধারা একেবারেই পায় নি। ছেলেবেলা থেকেই একটু বোষ্টম-বোষ্টম ভাব। গলায় তুলসীর মালা, মাথায় লম্বা চুল। দিনের বেলা চাষ-আবাদ নিয়ে কাটে, সন্ধ্যার পর নামকীর্তন। বাপ তাকে ঘাঁটায় না। সেও বাপের কোনো খোঁজ রাখে না। মনে মনে বরং ঘৃণাই করে। শুধু ছেলে নয়, স্ত্রীর সঙ্গেও গোপীর যোগাযোগ অতি সামান্য। সে বেচারা তার নানা রকম অসুখ-বিসুখ নিয়ে বিব্রত। সারা বছর প্রায় শুয়েই থাকে। সংসার দেখে ছেলের বৌ, আপনার বনানী। শ্বশুরের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্ক তারই, যদিও তার আসল ব্যবসাটা যে কী, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানে না।

কালীপ্রসাদ গিয়ে প্রথমটা চেপে ধরল সুবলকে, তোর বাপ টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটি রাখে কোথায় ?

সে আকাশ থেকে পড়ল, আমি কেমন করে বলবো ?

—কোথায় পোঁতা আছে দেখিয়ে দে। কাউকে কিছু বলবো না।

—জানলে তো দেখাবো ?

—তাহলে জেনে রেখে দে, তোর বাপ আর ফিরবে না।

সুবল চুপ করে রইল। বাপের ফেরা বা না ফেরা নিয়ে তার বিশেষ দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হলো না। কালীপ্রসাদ বলল, তুই না জানিস, তোর মা নিশ্চয়ই জানে।

—মা! রোগ-ব্যামো নিয়েই বাঁচে না। টাকা পয়সার খবর রাখবে কখন ?

—বেশ, তোর বৌকে ডাক। তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।

বনানীকে ডেকে আনা হলো। লম্বা ঘোমটার ভিতর থেকে মাথা নেড়ে জানাল, সে কিছুই জানে না।

কালীপ্রসাদ এদিকে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। এস. পি.-কে কথা দিয়ে এসেছে, যেমন করে হোক, গোপীটাকে ফাঁসাবার মত মাল-মশলা যোগাড় করে তবে ফিরবে। চৌদ্দ দিন মাত্র সময়। তার মধ্যে সাত আট দিন চলে গেছে। আইন বাঁচিয়ে আর কাঁহাতক চলে? এবারে শেষ অস্ত্র ছাড়ল। পাড়ায় কারো কারো কাছে শুনেছিল, ছেলের চেয়ে বৌয়ের সঙ্গেই বুড়োটার যোগাযোগ বেশি। এদের চোখে দেখেও মনে হলো, বোষ্টম-মার্কা হাবা ছোকরাটা আসলে ভালমানুষ, বৌটা বদমাশ। সেই হলো মাথা। কাজেই কান টানলে মাথা আসে, এই থিওরী খাটিয়ে বৌয়ের সামনেই সুবলকে নিয়ে পড়ল। শুরু হলো ধোলাই। পরের ঘটনা কালী-প্রসাদের নিজের কথায় বলি।

"এসব তো আমাদের কাছে নতুন ব্যাপার নয়। আপনিও করেছেন, আমিও কম করি নি। বরাবর দেখেছি, বাড়ির পুরুষ-গুলোকে দুচার ঘা লাগালেই মেয়েগুলো হয় পালায়, নয়তো ঘরের দরজা বন্ধ করে মড়াকান্না কাঁদতে বসে। এই রকম সামনে থাকতে বাধ্য করলে ছুটে এসে পা জড়িয়ে ধরে—আর মেরো না বাবু। এখানেও তাই আশা করছিলাম। কিন্তু যা দেখলাম সত্যিই তাজ্জব লেগে গেল দাদা। খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যে কাণ্ডটা করল, আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। এক লাফে এগিয়ে এসে ছোকরাকে আড়াল করে দাঁড়াল। কোথায় গেল ঘোমটা! একেবারে আমার নাকের উপর আঙুল উচিয়ে, যেন হুকুম দিচ্ছে এমন ভাবে বলল, মারধোর করবেন না। দোষ করে থাকে চালান দিয়ে দিন।"

কালীপ্রসাদ একেবারে 'থ'। সত্যিই ধারণা করা যায় না। সময়টা দেখতে হবে তো? সতের আঠার সালের কথা। তখনো গান্ধী-যুগ শুরু হয় নি। ইংরেজ সরকারের পুলিসী-যুগ। আর ঐ

মেয়েটাও লেখাপড়া জানা শহুরে মেয়ে নয়, অজ পাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর চাষী-গেরস্তের বৌ। বাদা অঞ্চলের পাড়াগাঁ। ম্যাপে বাংলা দেশ হলেও, আসলে তার সঙ্গে কোন যোগ নেই। স্বদেশী-ওয়ালাদের ছায়াও সেখানে কেউ দেখে নি। তাদের কার্যকলাপের একটা ছোট ঢেউও গিয়ে পৌঁছায় নি ওর ধারে কাছে।

কালীপ্রসাদের চরিত্রে আর যাই থাক, মেয়েমানুষের ওপর কোনো পক্ষপাতের বালাই ছিল না। দুর্বলতা তো নয়ই। 'থ'-ভাবটা কেটে যেতেই এক ধাক্কায় বৌটাকে সরিয়ে দিয়ে সুবলকে ঘাড় ধরে টেনে আনল সামনের দিকে। মুচকি হেসে বলল, 'চালান? বেশ তাই দিচ্ছি। তোমার সামনেই দিচ্ছি।'

দুটো সিপাইকে দাঁড় করিয়ে দিল বনানীর দুপাশে, যাতে চলে না যায়, আর একজন আড়াইমণী জমাদারকে একটা বিশেষ ইশারা করে হুকুম দিল, 'লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌ চালাও।' জমাদার সুবলকে ঠেলে দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে নাল-লাগানো বুট দিয়ে তার বাঁ পা'টা চেপে ধরল। চিৎকার করে উঠতেই সেটা ছেড়ে দিয়ে বুট তুলে দিল ডান পায়ের উপর। এরই নাম লেফ্‌ট-রাইট্‌।

ভূতনাথ দারোগার 'কবিরাজী মুষ্টিযোগ'গুলো আমার জানা ছিল। 'লেফ্‌ট্‌-রাইট্‌'এর কথা এই প্রথম শুনলাম। বললাম, এটাও কি আপনার আবিষ্কার?

—না, এটা কালীপ্রসাদ মুখুজ্যের পেটেন্ট্‌।

—আপনাকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছেন ভদ্রলোক। যাক, তারপর কি হলো, বলুন।

—একবার বাঁ পা, সেটা ছেড়ে দিয়ে আবার ডান—এলোপাতাড়ি নয়, দস্তুর মত মার্চের তালে। সুবল পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিতরের কোন্ একটা ঘর থেকে চেঁচিয়ে চলেছে তার মা। বুড়ী বাতে পঙ্গু; নড়বার ক্ষমতা নেই। বনানীর মুখে শব্দ নেই, একফোঁটা জল নেই চোখের কোণে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে স্বামীর দুটো পায়ের দিকে। থেঁতলে ফেটে রক্তে মাখামাখি।

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। দুচোখের ভেতর থেকে ঠিকরে এল আগুনের হল্‌কা। দুপাশের সিপাই দুটো টের পাবার আগেই তীরের মত ছিটকে পড়ল। তারা দুদিক থেকে টেনে ধরতে বেশি দূর এগোতে পারল না। সেখান থেকেই বাঁ পাটা বাড়িয়ে যত জোরে পারে আড়াইমণীর উরুর পেছনে বসিয়ে দিল লাথি।

কালীপ্রসাদের কাজটা এতক্ষণ ছিল এক তরফা। প্রভোকেশনের অভাবে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। এবারে আর কোনোদিকে কোনো বাধা রইল না। চালান দেবার প্রস্তাবটা বনানীই তুলেছিল। তারই উপরে সেটা প্রয়োগ করা হলো। যে-সে ব্যাপার নয়। 'অ্যাসল্‌টিং এ পুলিস অফিসার'! তার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ —'সরকারী কর্মচারীকে কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে বাধা প্রদান'! ৩২৩ এর সঙ্গে ৩৫৩।

গোপী বর্মনের ঘাট থেকে খানিকটা দূরে রিভার পুলিসের লঞ্চ আগে থাকতেই নোঙর করা ছিল। বনানীকে অ্যারেস্ট করে আপাতত সেখানে নিয়ে তোলা হলো। ঐ রকম ডেঞ্জারাস আসামী, এতগুলো পুলিসের চোখের ওপর যে তাদেরই একজনকে লাথি মারতে পারে, আর্মড্ পুলিসের হেফাজত ছাড়া তাকে অন্যত্র রাখা নিরাপদ নয়। বিশেষ করে বর্ষারাত। বাড়িটাও গ্রামের এক ধারে। দুপাশে বাগান, পেছনে মাঠ, সামনে নদী। পালিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

জনমানবহীন বিশাল নদীর মধ্যে কালীপ্রসাদের লঞ্চে সেই রাতটা তার কেমন করে কেটেছিল, সে কথা আর নাই বা বললাম। সে ইতিহাস, আপনি ওর নামকরণ প্রসঙ্গে যে কথাটি বলেছিলেন, 'রহস্যের অন্ধকার,' তারই তলায় ঢাকা থাক।

কী মনে করে জানি না, আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, আপনি তাকে দেখেছেন?

—কেমন দেখতে, জানতে চাইছেন তো। এ ক্ষেত্রে সেটা

অবান্তর। সে নারী এবং তার দেহে যৌবন আছে, স্ত্রী-জাতির চরম সর্বনাশের পক্ষে এই দুটো ফ্যাক্টরই কি যথেষ্ট নয়?

এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমি দিতে পাবি নি, ভূতনাথবাবু তাঁর কাহিনীর ছিন্ন সূত্রে ফিরে গেলেন—

'পথি নারী বিবর্জিতা'—উক্তিটা বোধহয় চাণক্য পণ্ডিতের। কালীপ্রসাদ এবার এই শাস্ত্র বাক্যের আশ্রয় নিল। অর্থাৎ যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, তারপরে আর এই আপদটাকে সদরে টেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে তখন মাথা বাঁচাবে কে? তাই ভোর না হতেই দুজন সিপাই ধরাধরি করে বনানীকে তার বনালয়ের এক কোণে ফেলে রেখে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, জাঁদরেল জল-পুলিসের দল সামান্য একটা মেয়েমানুষেব বাঁ পায়ের লাথি বেমালুম হজম করে পুরো স্পীডে লঞ্চ ছুটিয়ে ভেসে চলেছে শহরের দিকে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল কালীপ্রসাদ, যে মামলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার স্বপ্ন দেখেছিল, দুটোকেই মাঝপথে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে হলো।

কালীপ্রসাদ ভুল করেছিল। তার আশঙ্কা ছিল, বনানী তাকে ফাঁসিয়ে দেবে। এ যে আলাদা জাত তা বুঝতে পারে নি। এরা নালিশ করে না। নিজের লাঞ্ছনার কথা অপরের কাছে তুলে ধরে দয়া ভিক্ষা এদের ধাতে নেই। আইনের আশ্রয় নেয় না, আইন তুলে নেয় নিজের হাতে। অত্যাচারের একটা মাত্র প্রতিকার ওরা জানে, তার নাম প্রতিশোধ। সদরে নিয়ে গেলেও সে উপরওয়ালার দরবারে কাঁদুনি গাইতে বসত না কিংবা বিচারপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াত না ফরিয়াদীর কাঠগড়ায়।

এখানেও সে কোনো আত্মীয় বা প্রতিবেশীর দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল না। রাতের অন্ধকারে কী ঘটেছে না ঘটেছে, তার ওপরে আর একটা মোটা কালো পরদা টেনে দিল। নিজের লাঞ্ছনা তো বটেই, দৈহিক যন্ত্রণাও চেপে রাখল বুকের তলায়। যেন কিছুই

হয় নি, এমনি ভাবে নিজের দুটো হাতের উপর দুটো কঠিন রুগীর ভার তুলে নিল। শাশুড়ী তো আগে থেকেই অচল। এবার স্বামীও পড়ল সেই দলে। পায়ের ঘা রোজ রোজ বেড়ে চলল। তার সঙ্গে জ্বর। ডাক্তার বলতে যা বোঝায়, সে রকম কিছু ও তল্লাটে কোথাও নেই ; মানে, তখন ছিল না। কবরেজ গোছের একজন ছিল। তার গাছ-গাছড়াই একমাত্র সম্বল। শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথাই ওঠে না। গাঁয়ের লোক জানত, সেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না। তা ছাড়া নিয়েই বা যায় কে ? পুরোদমে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। নদীর দিকে তাকানো যায় না। নৌকা চলাচল বন্ধ।

—কাছে ধারে ওদের আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না ?

—ছিল হয়তো, মুচকি হেসে বললেন ভূতনাথ, তবে আগেই বলেছি, গোপীর সঙ্গে কারোরই তেমন ভাব-সাব ছিল না। তার ওপরে আবার সেদিন যে কাণ্ড ঘটে গেল। গাঁয়ের লোক আপনার আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তারা জানে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিসে ছুঁলে তিন আঠারোং চুয়ান্ন। সুতরাং শতহস্তেন—

বনানী সারাদিন কাজ করে যায়। রাত হলেই কান দুটো পেতে রাখে দরজার বাইরে, কখন শ্বশুর এসে চুপি চুপি ডাকবে। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, ঐ বুঝি এল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দেখে, কেউ না। এমনি করে দিনের পর দিন কেটে গেল। গোপী এল না। জেল থেকে ছাড়া পেল কি না, সে খবরটাও কেউ দিয়ে গেল না।

প্রায় মাস দেড়েকের মাথায় সুবল মারা গেল। ঘায়ে পচ ধরেছিল, দুর্গন্ধে ধারে-কাছে যাওয়া যেত না। তার কয়েকদিন পরেই গোপী এসে হাজির। পুলিস মামলা চালায় নি। বেকসুর খালাস। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারে নি। 'দরকার' ছিল। কী 'দরকার', এরা কেউ জানতে চাইল না।

এখানকার খবর সম্বন্ধে বনানী প্রায় চুপ করেই রইল। বুড়ি যা বলল তাও ভাসা-ভাসা। সুবলের প্রসঙ্গে কালীপ্রসাদের কথা উঠতে গোপী বলে উঠল, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। শালা আমার যেমন সর্বনাশ করে গেল, নিজেও তেমনি সহজে রেহাই পায় নি। ঘুষের মামলায় পড়েছিল। চাকরি নিয়ে টানাটানি। শেষটায় ডিগ্রেড হয়ে গেছে। জল-পুলিসের নেস্‌পেক্টর থেকে কোতোয়ালীর দারোগা। শাঁস বলতে কিচ্ছু নেই। স্রেফ ডাঁটা বলে বুড়ো আঙুলটা তুলে ধরেছিল বুড়ির সামনে। বনানী কাছেই কি একটা করছিল। কথাটা কানে যেতে হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কোন্ কোতোয়ালী ?

বৌয়ের জ্ঞানের বহর দেখে গোপীর ভারী মজা লাগল। হেসে বলল, কোতোয়ালী আবার ক'টা থাকে রে বেটী ? শহরের ওপর যে সদর থানা, তারই নাম কোতোয়ালী।

—ও, বলে বনানী চলে গেল। কথাটা তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

দিন কয়েক পরে মাঝরাত্রে গোপীকে একবার উঠতে হয়েছিল। বাগানের দিক থেকে ফিরে আসতে গিয়ে চমকে উঠল, ছেলের বৌয়ের ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে কেউ নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, মনে করল হয়তো বাইরে গেছে। তারপর লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে বেরোল—বাগানে, মাঠে, নদীর ধারে। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

পরদিন আর ব্যাপারটা চেপে রাখা গেল না। যে সব প্রতিবেশী অত্যন্ত দুঃসময়ে ভুলেও একবার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায় নি, তারাই এবার দলে দলে আসতে শুরু করল। গবেষণা চলল নানারকম। জলে ঝাঁপ দেবার সম্ভাবনাটা দু-একজনে তুললেও, বেশির ভাগ সরাসরি নাকচ করে দিল। অনেক মুখরোচক গল্পও তৈরী হলো—কোথায় কবে কার সঙ্গে তাকে দেখা গেছে, কতদিন থেকে এই কাণ্ড চলছে—ইত্যাদি। গোপী চুপ করে রইল। খুঁজতে বেরোবার

কথাটা যে একবারও মনে হয় নি, তা নয়। কিন্তু পঙ্গু স্ত্রীকে একা ফেলে যাওয়া অসম্ভব বলেই হোক, কিংবা যে বৌ ঘরে থাকতে চাইল না, তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে কী লাভ, এই ভেবেই হোক, বেরোনো আর হলো না।

এখানে কিঞ্চিৎ বিরতি, নাটকের মাঝখানে যেমন ইন্টারভ্যাল। এরপর ভূতনাথবাবুর ভূমিকাও বদলে গেল। এতক্ষণ ধরে এ কাহিনীর সঙ্গে তাঁর যে সংযোগ, সেটা প্রত্যক্ষ নয়। পুলিস ক্লাবে বসে সিগার টানতে টানতে কালীপ্রসাদ মুখুজ্যের বাহাদুরি জ্ঞাপনচ্ছলে যেটুকু প্রকাশ পেয়েছিল, তার থেকে গোড়াপত্তন। তারপর বিভিন্ন সূত্র থেকে যে বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলো তাঁর কানে এসেছিল, তাই মনে মনে জোড়া দিয়ে আমাকে শুনিয়ে গেছেন। পরবর্তী পর্ব তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ। সেখানে তিনি তদন্তকারী পুলিস অফিসার। ঘটনাচক্রের কোন্ বিবর্তনে তাঁকে এই ভূমিকায় নামতে হয়েছিল সে কথা যথাস্থানে প্রকাশ পাবে। আপাতত একটা কথা বলা দরকার। সরকারী দপ্তরখানায় কী রিপোর্ট তিনি দাখিল করেছিলেন, তা আমি জানি না। আমি যেটা পেলাম, তার সুর ও প্রকৃতি আলাদা। তার মধ্যে তথ্যের সঙ্গে মেশানো এমন অনেক কিছু আছে, যা সরকারী রেকর্ডে নিশ্চয়ই স্থান পায় নি। এগুলো হয়তো তোলা ছিল তাঁর নিজস্ব রেকর্ড-রুমের কোনো নিভৃত অন্তঃস্থলে। এতদিন পরে সেখান থেকে ধুলো ঝেড়ে বাইরে আনবার পর ধরা পড়ল, মানুষের মন নামক ব্যক্তিটি শুধু সংগ্রাহক নয়, স্রষ্টা। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে তথ্যের বোঝা বয়ে এনে সাজাতে গিয়ে কখন যে তাতে হৃদয়ের রং লেগে যায়, সে নিজেই হয়তো জানে না। সুতরাং যদি কেউ প্রশ্ন করে বসেন, এটা তিনি কেমন করে জানলেন, ওটা কোথা থেকে পেলেন, আমাকেও বাধ্য হয়ে ঐ একটিমাত্র উত্তরের আশ্রয় নিতে হবে—আমি জানি না।

বনানী নদীগর্ভে ঝাঁপ দেয় নি, দিয়েছিল তার চেয়েও বিপদসঙ্কুল অনিশ্চয়ের মধ্যে।

দশ-এগারো বছর বয়সে সে একবার মাসীর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। শহরে। তার মেসো সেখানে মুদিখানার দোকান করত। তার কাছেই একটা পুলিসের আস্তানা। অত পুলিস এর আগে সে একসঙ্গে দেখে নি। মাসী বলত 'ওটা কোতোয়ালী থানা। ওদিকে কখনো যাস নে।' নিরাপদ দূরত্ব থেকে ভয়ে ভয়ে সেই নিষিদ্ধ জগতের দিকে চেয়ে থাকত। বিয়ে হলো অনেক দূর, সাত সমুদ্র না হলেও তেরো নদীর পার। শহর-বাসের সেই ক'টা দিন এবং তার সঙ্গে জড়িত সেই অদ্ভুত বাক্যটা—কোতোয়ালী—মনের তলায় কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শ্বশুরের মুখে আবার নতুন করে শুনবার পর ঐ নামটা তার রক্তে যেন দোলা দিয়ে গেল। এবারকার কোতোয়ালী তাকে একেবারে আলাদা এবং অনেক বেশি চড়া সুরে ডাক দিল। শুধু ডাক দিল না, দূর পল্লীপ্রান্তে নদীর ঘাট আর বাগানের বেড়া ঘেরা গৃহস্থ বধূর স্নেহ-ভক্তি-কর্তব্যের বন্ধনময় একান্ত পরিচিত জীবনের মাঝখান থেকে উপড়ে টেনে নিয়ে এল। কোথায়, সে কথাটাও ভাববার অবসর দিল না।

মেসো নেই, মাসী তখনো আছে। বোনঝিকে দেখে সে বিশেষ খুশী হলো না। একটা বাড়তি মেয়েমানুষকে পুষবার মত অবস্থাও তার নয়। সেদিক দিয়ে বনানী তাকে ভরসা দিল। একেবারে খালি হাতে সে আসে নি। নগদ বিশেষ কিছু না আনলেও কিছু গয়না ছিল। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। তার জন্যে তৈরীই ছিল সে। আশ্রয় পাওয়া গেল।

সেই কোতোয়ালী তেমনি আছে, আরো হয়তো বেড়েছে খানিকটা। দশ বছর বয়সে তাকে ঘিরে যতটা বাধা-নিষেধ ছিল, আজ তার গণ্ডিটা অনেক বেশি প্রশস্ত। তখন সে দু-চোখ মেলে যত খুশি দেখত, তাকে দেখবার কারো গরজ ছিল না। আজ অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়ান বড় কঠিন। তবু যখনই সুযোগ

পায়, গিয়ে দাঁড়ায়, একটি বিশেষ মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করে। এমনি করে ক'দিনের মধ্যেই বুঝল বনানী, যে তীব্র জ্বালা বুকে করে সে ঘর ছেড়েছিল, তাকে মেটাবার পথ তার সামনে খোলা নেই। তার চোখ দুটো যাকে এত কাছে থেকে অহরহ অনুসরণ করছে, আসলে সে অনেক দূরে। তবু মন মানে না। মাঝে মাঝে যখন নিরাশায় ভেঙে পড়ে, ঠিক তখনই হয়তো চোখে পড়ে তার প্রায় সামনে দিয়ে সে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে ওঠে। হাতখানা আপনা হতেই চলে যায় জামা-কাপড়ের তলায়। স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে লেপটে আছে একটি বস্তু—কয়েক বছর আগে শ্বশুর এনে দিয়েছিল, তাব কোন্ কামার বন্ধুর নিজের হাতে গড়া। বলেছিল, 'আমাকে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়, ছেলেটা তো হাবা বোষ্টম, ওকে আমার ভরসা নেই। জঙ্গলে ঘেরা বাড়ি, কার মনে কী আছে, এটাকে হাতের কাছে রেখো। দিনে বা রাতে শোবাব সময় বালিশের তলায় রেখে শুয়ো।'

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রেও ওটা বালিশের তলাতেই ছিল। একবারটি যদি যেতে পারত সে ঘরে! পুলিস দুটো পথ আগলে ছিল, যেতে দেয় নি। নিষ্ফল আক্রোশে বুকটা আবার জ্বালা করে ওঠে চোখের উপর ভেসে ওঠে থেঁতলে পিষে যাওয়া দুখানা ক্ষত-বিক্ষত পায়ের পাতা। তার ওপর লাফিয়ে চলেছে একটা দাঁতাল শুযোর। মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসছে। সে আর সইতে পারে নি। তারপর?

পরের দৃশ্যগুলো ভাবতে গেলে মাথার ভিতরে আগুন ধরে যায়। লঞ্চের ভিতরে আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা সেই ছোট্ট কামরাটা। চারদিকে একপাল শকুন। সে নিশ্চয়ই মরে গিয়েছিল, আর সেই মরা দেহটাকে নিয়ে—আর ভাবা যায় না। মাথার ভিতরকার শিরাগুলো যেন জট পাকিয়ে যায়। তার মধ্যে হাতুড়ির ঘায়ে বাজতে থাকে তিনটি কথা—শোধ নিতে হবে, শোধ নিতে হবে। ··

মাসী সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, এবং দিন দিন বেড়ে চলল সে সন্দেহ। কাঁচা বয়সে কপাল পুড়িয়ে বসে আছে মেয়েটা; একা একা কোথায় যায়, কোথায় জড়িয়ে পড়বে কে জানে? বাড়ি ফিরে এলেই বনানীকে একগাদা কৈফিয়তের মুখে পড়তে হয়। এটা সেটা বলে সে এগিয়ে যায়। একদিন সেই খাপে মোড়া জিনিসটা মাসীর নজরে পড়ে গেল, বেরোবার মুখে কোমরে গুঁজে আচল চাপা দিতে যাবে, ঠিক এমনি সময়। বুড়ি চেপে ধরল, 'এটা কি?' বনানী ব্যাপারটাকে হাল্কা করবার চেষ্টা করল, 'তোমাদের দেশে যে-রকম গুণ্ডার উৎপাত, সাবধান হয়ে চলতে হয়।'

—'ও সব বাজে কথা রাখ।' খেঁকিয়ে উঠল মাসী।

বনানীকে স্বীকার করতে হলো, একটি বিশেষ জন ওর লক্ষ্য। কে সেই একজন সেটা অবশ্য ভাঙ্গল না। মাসী শিউরে উঠল, 'কি সব্বোনাশী মেয়ে গো!' তাবপর স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিল, ওসব মতলব নিয়ে তার আশ্রয়ে থাকা চলবে না।

এ ছাড়া আর একটা মুশকিল কিছুদিন আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল। মাসীর দোকানের ক'জন খদ্দের (তার মধ্যে থানার লোকও ছিল দুজন), তার এই বোনঝিটির উপর বড় বিশেষ নজর দিতে শুরু করেছিল। এখানে থাকা আর সত্যিই সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু কোথায় যাবে, আর তার অভীষ্ট ব্রতই বা সফল হবে কেমন করে?

মাসীর বাড়ি থেকে চলে যাওয়া স্থির, কেবল দিন-ক্ষণটা স্থির হয় নি, এমন সময় একদিন বিকালে নদীর ঘাটে গা ধুতে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ভাবও হল খানিকটা। দিন দুই পরে পিছন থেকে হঠাৎ কানে গেল, সেই মেয়েটি গা রগড়াতে রগড়াতে তার এক সঙ্গিনীকে বলছে, কালীদারোগার কাণ্ড শুনেছিস? ময়নাকে তালাক দিয়ে সুধাটাকে ধরেছে। ধন্যি মানুষ বাবা! দুদিন অন্তর মুখ না বদলালে চলে না।

—ভালোই তো। তোর পালাও একদিন আসবে।

বলে হেসে উঠল সঙ্গিনী। সে আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিল, বনানীকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল। বনানী বুঝল, ওরা কী মেয়ে। তবু যেটুকু সন্দেহ ছিল, পুরোপুরি মেটাবার জন্যে প্রস্তাব করল, নতুন সখীর সঙ্গে তার বাড়িটা একবার ঘুরে আসবে। সখী রাজী হলো না, নানা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেল। তারপর গা ধোয়া শেষ করে ওরা দুজনে যখন খানিকটা এগিয়ে গেছে, বনানী অলক্ষ্যে তাদের অনুসরণ করল। গৃহস্থ-বসতি ছাড়িয়ে বাজার, তার শেষ প্রান্তে সরু গলির মধ্যে একটা বস্তি। তার মধ্যে ঢুকে গেল মেয়ে দুটো। তখন সেখানে ভিড় নেই। কিন্তু বনানীর বুঝতে বাকী রইল না, আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই দেখতে পাবে, সকালবেলার ছেড়ে রাখা দোমড়ানো শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে মুখে পালিশ আর চোখে কালি মেখে গলির ধারে সারি সারি এসে দাঁড়িয়েছে শুধু তারা নয়, তাদের সঙ্গে আরো অনেকে। আরো রাত হলে হয়তো দেখা হয়ে যাবে সেই দুদিন-অন্তর-মুখ-বদলানো-বিলাসী মহামান্য ব্যক্তিটির সঙ্গে, তার জীবনে আজ যে একক, তার সমস্ত বাসনা যার দিকে উদগ্র।

বাসায় ফিরে এসে সে রাত্রে সে কিছু খায় নি, সমস্ত রাত দু-চোখের পাতা এক করে নি, বারবার উঠে শুধু জল গিলেছিল গেলাসের পর গেলাস। পরদিন ভোরেই কাপড়ের পোঁটলাটা হাতে করে গিয়ে বলেছিল, মাসী, আমি চললাম।

—কোন্ চুলোয় শুনি?

—দেখি কোথায় কোন্ চুলো জোটে।...বলে আর দাঁড়ায় নি।

সেই মেয়ে দুটো নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। হয়তো বোঝাবার চেষ্টাও করেছিল, 'এখনো বলছি, ফিরে যাও। এ বড় কষ্টের জীবন'। তবে বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনার অভাব হয় নি। কয়েকখানা গয়না তখনো ছিল। তার বলে ওরই মধ্যে বেশ ভাল ঘরেই জায়গা পেয়েছিল, তার সঙ্গে এক সেট ভালো জামা কাপড়ও জোটাতে পেরেছিল।

মাসী খোঁজ না নিয়ে ছাড়ে নি। তার দোকানের যে ছোকরাটির মনে রং লেগেছিল, খবরটা এনেছিল সে-ই। বুড়ীর কঠিন অসুখের নাম করে একদিন ছুপুর বেলা ডেকে এনে দেখাটাও করিয়ে দিয়েছিল। মাসী দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, তোর মরণ হলো না কেন ?

'মরণ তো হয়েছে মাসী', বনানীর মুখে মৃছ হাসির রেখা, 'অনেক আগেই হয়েছে।'

মাসী বুঝতে পারে নি, তার মানে ?

—মানে তুমি বুঝবে না। মরেছি আমি সেইদিনই। এটা তার জ্বালা।···বলতে বলতে চোখ ছুটোর ভিতর থেকেও একটা তীব্র জ্বালা ঠিকরে পড়েছিল।

একদিন ছুদিন নয়, পুরো তিনটে মাস। সে কি কঠিন পরীক্ষা ! মুখে রং ঘষে প্রতি সন্ধ্যায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় দরজার সামনে। কখন এসে অন্য ঘরে গিয়ে ঢুকবে, কে জানে ? কিন্তু সে আসে না, আসে অন্য লোক। তাদের ঠেকানো যায় না। ভিতরে ডেকে নিয়ে হাতে পায়ে ধরে কত কাণ্ড করে আত্মরক্ষা করতে হয়। সঙ্গিনীরা মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'আদিখ্যেতা ! নাচতে নেমে আবার ঘোমটা' ! বাড়িওয়ালী বলে, 'অত বাছাবাছি করলে তোর চলবে কেমন করে ?'

বনানী চুপ করে থাকে। তার কথা যে কাউকে বলবার নয়। কেমন করে বলবে, সকলের চোখে সে বারনারী হলেও সংসারে শুধু একটি মাত্র পুরুষকেই তার প্রয়োজন !

এর মধ্যে ছু-একদিন যে সে না এসেছে তা নয়। কিন্তু হয় বনানীর ঘর পর্যন্ত পৌঁছায় নি, নয়তো তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই অন্য ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

অবশেষে, দীর্ঘ তিন মাস প্রতীক্ষার পর দেখা দিল সেই 'শুভরাত্রি' ! বাঞ্ছিত জন মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

বনানীর বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল, যদি চিনতে পারে ? জোর করে হাসি টেনে এনে বলল, দাঁড়িয়ে কেন ? ভেতরে আসুন।

—তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি, মনে হচ্ছে।

—সে কপাল আর আমার হলো কৈ? এতদিন ধরে আছি, একবারও তো গরীবের ওপর নজর পড়ল না।···ওমা, সারারাত ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?···বলে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

—তুমি তো বেশ কথা বলতে পার। হাসিটাও ভারী মিষ্টি।

বনানী স্মিতমুখে মাথা নুইয়ে পিছনে সরে গেল। সে-ও ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-শিখার মত ঝলকে উঠল একখানা খাপ-খোলা ছোরা। নেমে আসবার আগেই সতর্ক পুলিসের ক্ষিপ্র সবল মুষ্টি সেটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিরুপায় নারী তখন তার বিধাতা-দত্ত দুটি অস্ত্র—দাঁত আর নখ নিয়েই সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের উপর।

অনেক রাত্রে সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টর ভূতনাথ ঘোষাল পুলিস হাসপাতালে গিয়ে দেখলেন, কালীপ্রসাদ চোখ বুজে পড়ে আছে। মুখে একটানা গোঙানির শব্দ। কপালে গণ্ডে, চিবুকে, কাঁধে গভীর আঁচড়ের রেখা। তার থেকে রক্ত ঝরছে। ডাক্তার আস্তে আস্তে বুকের কাপড়টা তুলে দেখালেন। অনেকটা জায়গা জুড়ে তীক্ষ্ণ দাঁতের চিহ্ন, মাঝখানে খানিকটা মাংস নেই।

সরকারী ব্যবস্থায় সব রকম চিকিৎসা সত্ত্বেও কালীপ্রসাদকে সুবলের পথ ধরতে হলো। ঘা-গুলো সেপ্‌টিক হয়ে গিয়েছিল। মরবার কদিন আগে ভূতনাথবাবুকে বলেছিল, ‘দাঁতে আর নখে নিশ্চয়ই বিষ মেখে রেখেছিল রাক্ষুসী।’ ভূতনাথ মুখে কিছু বলেন নি, মনে মনে বলেছিলেন, ভুল করছ ভায়া, ওরা বাঘিনীর জাত, বিষ নিয়েই জন্মায়, মাখতে হয় না।

দেশলাই জ্বালাবার শব্দে চমকে উঠে দেখলাম, ভূতনাথবাবু

সিগারে আগুন দিচ্ছেন। আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, বৃষ্টিটা ধরে গেছে ; এবার ওঠা যাক। ক'টা বাজে ?

আমি জবাব দিলাম, বনানীর কী হলো ?

—জানি না। অনেক খুঁজেছি। খুঁজতে হয়েছে। তদন্তটা আমার হাতেই দিয়েছিলেন সাহেব।·· পাই নি।

একটু থেমে বললেন, পেলে কালীপ্রসাদের শেষ খবরটা জানিয়ে দিতাম। সুবলের মৃত্যুর ক্ষোভ হয়তো খানিকটা মিটত।

আমি বললাম, আমার মনে হয় সে বেঁচে নেই।

—এখন সেই প্রার্থনাই করি। শুনেছি মৃত্যুর পরে মানুষ প্রেতলোক থেকে সব কিছুই জানতে পারে। তাহালে সেও জেনেছে। আত্মার কিছুটা তৃপ্তি হয়ে থাকবে, অবিশ্যি বাঘিনীদের যদি আত্মা বলে কিছু থাকে।

॥ চার ॥

আমার এই পুরনো-চিঠির ঝাঁপিটা যখন খুলে বসি, সকলের আগে যে জিনিসটা চোখে পড়ে এবং দেখে বিস্ময় লাগে, সেটি হচ্ছে এই চিঠিগুলোর বৈচিত্র্য। একটা হাতের-লেখা থেকে আরেকটা হাতেব-লেখা যেমন আলাদা—কোনোটা বাঁকা ছাঁদের, কোনোটা সোজা—সেই লেখার পিছনে যারা রয়েছে, তাদের তফাৎ আরো বেশি। প্রশ্ন উঠবে, তাতে আর বিস্মিত হবার কী আছে? বৈচিত্র্যই তো জীবনের আসল রূপ। জানি। মোহমুদ্গরের দর্শনও আমার জানা আছে। এই সংসার শুধু বিচিত্র নয়, 'অতীব বিচিত্র'। তবু বিস্ময় জাগে বৈকি! ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ, হিংসায় উদ্বেলিত কত বিভিন্ন রংয়ের, কত মিশ্র সুরের মন আমার এই ছোট্ট পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে।

নানা পার্থক্য সত্ত্বেও একটি জায়গায় এরা এক—এই নিবন্ধের প্রথমেই যার উল্লেখ করেছি—সকলেরই কিছু জিজ্ঞাসা আছে। যতই ভিতরে ঢুকছি, দেখতে পাচ্ছি, সেটা এদের বহিরাবরণ। তার অন্তরালে আর একটি প্রচ্ছন্ন রূপ আছে—সকলেই কিছু শোনাতে চায়। একে আত্মপ্রচার না বলে বলব আত্মপ্রসার, নিজেকে মেলে ধরা, কিংবা আরেক ধাপ বেশি, খুলে ছড়িয়ে দেওয়া। তার মধ্যে আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক কিছু নেই। মানুষ মাত্রেই স্রষ্টা। এক বললেন, আমি বহু হব—এইটাই তো সৃষ্টির মূল তত্ত্ব।

কমবয়সী কয়েদীদের একটা আলাদা জেল আছে। সরকারী সেরেস্তায় তার নাম 'বর্স্টাল স্কুল'। শুনেছি, তার এক বাতিক-গ্রস্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (তাঁর নাকি কিঞ্চিৎ লেখক-খ্যাতিও ছিল) গাঁটের পয়সায় একঝুড়ি নোট-বুক আর ডজন কয়েক পেন্সিল কিনে এনে ছেলেগুলোর হাতে হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলো সরকারী নয়, তোদের নিজের জিনিস। যা ইচ্ছে হয় লিখবি, ছবি আঁকতে চাস আঁকবি, মাস্টারমশাইদের দেখাতে হবে না।'

ছেলেদের আনন্দ দেখে কে! কথাটা যখন উপর-মহলের কানে গেল, একজন কর্তাব্যক্তি কথায় কথায় রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কি বলুন তো? বাছাধনদের বুঝি এখন থেকেই "লেখক" বানিয়ে তুলতে চান?'

—'আজ্ঞে, না,' সবিনয়ে উত্তর দিলেন সুপার, 'লেখক ওরা আগে থেকেই আছে। লেখার কিছু সরঞ্জাম চাই তো, সাধ্যমত তারই যোগান দিচ্ছি।'

কথাটা ও-তরফে ঠিক বোধগম্য হল না দেখে আরেকটু পরিষ্কার করে বললেন, 'এ দুনিয়ায় লেখক নয় কে স্যার? আপনি আমি, রাম শ্যাম, যদু মধু সবাই বর্‌ন্‌-রাইটার, এক একটি পকেট-এডিশন রবিঠাকুর। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লিখছি—কাগজে কলমে পাথরে কিংবা ক্যানভাসে না হোক, মনে মনে, মুখে মুখে। নিজেকে কোনো না কোনো প্রকারে প্রকাশ করে চলেছি। ওরাই বা তার থেকে আলাদা হবে কেন?'

আমার এই পত্রগুচ্ছের যাঁরা লেখক, তাঁরাও নিজেকে প্রকাশ করতে চান। শুধু আমার কাছে নয়, আমার ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করে, অপরের কাছে। সে অপর কোথাও 'অপর-সাধারণ', কোথাও বা কোন 'বিশেষ অপর', কোনো বিশেষ জন।

অপর্ণা চ্যাটার্জির কথা মনে পড়ছে। সেই ক্লান্তিভারানত মুখখানি শুধু নয়, একটি একুশ-বাইশ বছরের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে তার বহু-বিড়ম্বিত জীবনের যে কাহিনী জেলখানার অফিসে বসে কখনো করুণ, কখনো উচ্ছল কণ্ঠে আমার কাছে অসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছিল, তাও নয়, তার চেয়ে বেশি, সেই ঠিকানা-হীন দীর্ঘ চিঠিখানা, এই ঝাঁপির এক কোণে যা সযত্নে তোলা আছে, এবং যার প্রতিটি লাইন নানা কাজের ফাঁকে যখন-তখন আমাকে উন্মনা করে দেয়। সে লিখেছিল, 'যে-কাহিনী সেদিন আপনার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, আশা করে বসে আছি, যত তুচ্ছই হোক, আপনার স্নেহবর্ষী লেখনীর মুখে একদিন সে রূপ নেবে। শুধু আশা নয়,

এটা আমার শেষ অবেদন।'

সে-কাহিনী আর কেউ পড়ুক না পড়ুক, তা নিয়ে তার অণুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল একটি বিশেষ মানুষ। শুধু সেই একজনের কাছে নিজের কথাটি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। আমার লেখার ভিতর দিয়ে 'একটি বার তাঁর চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো।' হয়তো এ ছাড়া সেখানে যাবার আর কোনো পথ তার ছিল না। আমার রচনা যে একদিন সেই আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটির নজরে পড়বে, এবং তিনি সেটা মন দিয়ে পড়বেন, এ বিশ্বাস তার কেমন করে জন্মেছিল, আমি জানি না। যেমন করেই হোক, সেই নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে অপর্ণার মন তাকে বলে দিয়েছিল—'সেদিন ক্ষণেকের তরেও তাঁর মনে হবে, যতখানি হেয় বলে একদা তিনি যার মুখ-দর্শন পর্যন্ত করতে চান নি, ঠিক ততখানি হেয় বোধহয় সে নয়।'

অপর্ণার অনুরোধ আমি রেখেছিলাম। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে 'লজ্জার মাথা খেয়ে' আমার কাছে সে তার 'শেষ আবেদন' জানিয়েছিল, তা সফল হয়েছে, না, আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে, জানতে পারি নি। জানবার উপায়ও সে রাখে নি। নিজের ঠিকানাটা সে ইচ্ছা করেই গোপন রেখেছিল।

অপর্ণা একা নয়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জীবনের প্রকাশ্য সড়ক থেকে পিছলে পড়েছিল, এমনি আরো কতজনের মর্মবেদনা এই নানা রঙের নানা আকারের লেফাফাগুলোর মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। সে সব আজ থাক। সংসারে একেই তো দুঃখের অন্ত নেই, তার উপরে আর নতুন ভার চাপাতে চাই না। তার চেয়ে এমন দু-একখানা চিঠি খোলা যাক, যাদের বক্তব্যবিষয় পত্রলেখকের কাছে যতটা গুরুতর, পাঠকের কাছে ততটা নয়। জানি, তার মধ্যেও একটা ট্রাজেডি আছে—আমি যাকে প্রাধান্য দিতে চাই, আপনার চোখে তা অপ্রধান, আমার কাছে যেটা মর্মান্তিক, আপনার মর্মে সে কোন রেখাপাত করল না। কি করব? উপায়

নেই। আমাদের সকলের জীবনেই এ ট্রাজেডি অহরহ ঘটছে। বিশেষ করে, যারা লেখক। অভিধান ঘেঁটে বাছাবাছা শব্দ জুড়ে একটি হৃদয়দ্রাবী করুণ দৃশ্যের অবতারণা করলাম। আমার চোখে জল এসে গেল, আপনি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'জ'লো জ'লো।' মধুর হাস্যরস পরিবেশন করেছি ভেবে আমার মুখ যখন তৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল, আপনার গোমড়া মুখে হয়তো তার একটি কুঞ্চনও ফুটে উঠল না।

এই চিঠিগুলোর যারা লেখক, তাদের কারো কারো অদৃষ্টেও যদি সেই বিড়ম্বনা ঘটে, আমি নিরুপায়।

এই সাড়ে-চুয়াত্তর-চিহ্নিত বেয়ারিং চিঠিখানাই ধরা যাক। ঠিকানা নেই, কিন্তু চেহারা দেখেই বুঝতে পাচ্ছি—এর উৎপত্তি-স্থল কোন মফস্বলের জেলখানা। প্রতি রাত্রে বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে সব কয়েদী বন্ধ করা হলো, তাদের নাম লিখবার জন্যে মোটা মোটা রেজিস্টার থাকে, যার নাম 'গ্যাঙ-বুক'। চিঠির কাগজগুলো সেখান থেকে গোপনে সংগৃহীত এবং তারই একটা পাতা আটা-গোলা গঁদে জুড়ে তৈরি হয়েছে খাম। বলা বাহুল্য, এ হেন বস্তু প্রকাশ্য রাস্তায়, অর্থাৎ, সরকারী সেন্সর-এর ছাপ নিয়ে আসতে পারে নি। এসেছে গোপন পথে, এবং সেইজন্যেই ডবল রেটে ডাক-মাশুল যোগাবার ভারটা আমার ঘাড়ে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কিংবা, লেখক হয়তো টিকিটের পয়সাটা কোন সূত্রে যোগাড় করে থাকবে। চিঠি-পাচারকারী বন্ধুটি—জেলের সিপাই কিংবা কোন খালাসী-কয়েদী—সেটা পোস্টাপিসকে না দিয়ে চা কিংবা পানের দোকানে ব্যয় করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল। আমি যে নিতান্ত নির্বুদ্ধির মত কয়েক আনা পয়সা খরচ করে ফেললাম, তার কারণ ঐ গ্যাঙ-বুকের ছেঁড়া পাতা। যা কিছু নিষিদ্ধ ও গোপনীয়, যার মধ্যে কোন রহস্যের গন্ধ আছে, তার দিকেই মানুষের আকর্ষণ। কৌতূহল নামক একটি নিরীহ শব্দের আবরণে ঢাকা দিলেও আসলে

এটা লোভ। লোভ মাত্রেই পাপ ; তার দণ্ড আছে। সুতরাং ঐ পয়সা ক'টির জন্যে আমাব কোনো আপসোস করা চলে না।

সেদিন কিন্তু চিঠিখানা পড়ে সত্যিই বড় আপসোস হয়েছিল। যা আশা করেছিলাম, তার কিছুই পেলাম না। না কোন চিত্ত-চঞ্চলকারী লোমহর্ষণ ঘটনা, না কোন পদস্থলিতা নারীর মুখরোচক আত্মকাহিনী, যার সঙ্গে কিঞ্চিৎ চড়া রঙ মিশিয়ে আমি আমার পাঠক-হৃদয়ে রসসঞ্চার করতে পারি। আজ সেই ভুল-বানানে-ভরা কাঁচা হাতের লাইনগুলো আরেকবার পড়ে মনে হচ্ছে, তা না পারি, পাঠকদের কিছুটা কৌতুকের খোরাক হয়তো যোগাতে পারব। চিঠির লেখক নকুলচন্দ্র সাঁতরা অবশ্য তা চায় নি। তার দুর্ভাগ্যের বর্ণনা দিয়ে শ্রোতার মনে কিঞ্চিৎ দুঃখ বা সহানুভূতির উদ্রেক করাই বোধহয় তার কাম্য ছিল, যদিও স্পষ্ট করে সে-কথা সে কোথাও বলে নি। মনে মনে সেই অভিপ্রায় যদি তার থেকেও থাকে, আমার এবং আপনাদের কুণ্ঠার বা লজ্জার কারণ নেই। আমাদের বেশির ভাগ হাসির উৎস যে অন্যের অশ্রুজল, এ তো অত্যন্ত পুরনো কথা।

দশধারা মোকদ্দমায় নকুল সাঁতরার এক বছর জেল হয়েছিল। চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি মামলায় কোর্ট যে দণ্ড দেন, তার সঙ্গে এই দশধারার মেয়াদের তফাৎ আছে। এটা হলো জামিনের বিকল্প ব্যবস্থা। কোর্টের আদেশমত উপযুক্ত জামিন দাঁড় করাতে পারলে আর জেলে যেতে হয় না। বেশির ভাগ আসামীই তা পারে না, নকুলও পারে নি। সুতরাং জেলে গিয়েছিল।

ফৌজদারী আদালত এবং তার সংশ্লিষ্ট মহলে 'দশধারা'র চলতি নাম—বি. এল. কেস। বি. এল. মানে 'ব্যাচেলর অব্ ল' নয়, 'ব্যাড্ লাইভ্লিহুড'। জীবিকা-নির্বাহের পথটা যাদের প্রকাশ্য ও সরল নয়, বরং বাঁকাচোরা এবং তমসাচ্ছন্ন, চালচলনে চাকচিক্য আছে, কিন্তু তার রসদ-সংগ্রহের সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, তাদেরই এই বি. এল-এর খপ্পরে ফেলা হয়। কোনো স্পেসিফিক বা নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রয়োজন নেই, প্রমাণ করতে হবে না, অভিযুক্ত

আসামী অমুক জায়গায় সংঘটিত অমুক অপরাধের জন্যে দায়ী, শুধু দেখাতে হবে তার জীবনযাত্রার মান এবং জীবিকা-সংস্থানের উপায় —এ দুয়ের মধ্যে কোন সংগতি নেই; সুতরাং ঐ কার্যটির জন্যে তাকে নিশ্চয়ই কোনো অসাধু পন্থার শরণ নিতে হয়। এইটুকু সম্পর্কে নিশ্চিত হলেই হাকিম তাকে দশধারার বণ্ড্ বা মুচলেকায় বেঁধে জেলে পাঠাতে পারেন।

মনে পড়ছে, আমার এক অধ্যাপক বন্ধু একবার কোনো মহকুমা-আদালতে এই দশধারার বিচার দেখতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলেন। সাক্ষ্যগ্রহণাদি আগেই হয়ে গেছে। সেদিন ছিল সওয়াল জবাব। আসামী পক্ষের উকিল তাঁর ভগ্নীপতি। তিনিই শ্যালককে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ দেখাবার জন্যে—ছোট মফস্বল কোর্ট হলেও সেখানকার বক্তৃতার মান কলকাতার অভিজাত কলেজের চেয়ে ন্যূন নয়। বলা দরকার যে, আমার বন্ধুটির পাণ্ডিত্য যতই থাক, চেহারাটা মোটেই পণ্ডিত-জনোচিত ছিল না।

কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুরু হলো। উঠেই নাটকীয়ভাবে কাঠগড়ার দিকে তর্জনী তুলে বললেন, "সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উল্লেখ করবার আগে মহামান্য আদালতকে আমি একবার ঐ আসামীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করব। চেহারাটা একবার লক্ষ্য করুন, ধর্মাবতার। কী রকম তেল-চুকচুকে মোষের মত গায়ের রং, কত বড় বুকের ছাতি, কী জমকালো গোঁফ, সুন্দরবনের বাঘের মত ভরাট মুখ, ধম্মের ষাঁড়ের মত গর্দান···। আচ্ছা, এবার একটা ছোট্ট প্রশ্ন—

এই পর্যন্ত এসে একটু থামলেন কোর্ট্‌বাবু, ঘাড় ঘুরিয়ে দুপাশটা একবার দেখে নিলেন। তারপর আসামীর উকিলের দিকে একটা জয়-গর্বিত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করে বললেন, এতবড় একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে কিসের জোরে?

—'অব্‌জেকশন্ ইওর অনার'—তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন

আসামী পক্ষের উকিলবাবু।—'আমার বন্ধু যা বললেন সব অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক।'

হাকিম বক্তার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তিনি বলে চললেন, সুযোগ্য কোর্ট্ সাব-ইন্সপেক্টর যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে আমার মক্কেলের চেহারর বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে মনে হয় পুলিসের চাকরিতে না এসে তিনি যাত্রার দলে যোগ দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। দুঃখের বিষয় এটা আদালত। কিন্তু কী বলতে চান তিনি? চেহারাটাই যদি তাঁর মতে আসামীর অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার এই অধ্যাপক শ্যালকটিকে কোর্টের সামনে হাজির করছি—

ভগ্নীপতির অতর্কিত আক্রমণে আমার বন্ধুবর হতভম্ব। আত্ম-রক্ষার উপায় স্থির করবার আগেই উকিলবাবু তাঁকে দুহাতে টেনে তুলেছেন। পরক্ষণেই হাকিমের সামনে আরো খানিকটা ঠেলে দিয়ে বললেন, ইওর অনার মে কাইণ্ডলি হ্যাভ এ লুক। আসামীর সঙ্গে এঁর কোনো অমিল নেই। একই রঙ, একই রকম বুকের ছাতি এবং তেমনি জমকালো গোঁফ। আমার বন্ধু কি বলতে চান, সেই অপরাধে এঁকেও দশধারায় চালান দিয়ে আসামীর ডক্-এ দাঁড় করাতে হবে?

একটা হাসির রোল উঠল। হাকিমকে হাসতে নেই। সময়োচিত গাম্ভীর্য বজায় রেখেই তিনি বললেন, অর্ডার অর্ডার।

যাক। যা বলছিলাম। বি. এল. কেসে ফেলবার আগে নকুলকে প্রথমটা ডাকাতি-মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। তার সঙ্গে আরো আসামী ছিল। মাস তিনেক কোর্টে আনা-নেওয়ার পর এল এই দশধারার অভিযোগ। নকুল লিখেছে, 'এই নতুন মামলা কি করিয়া চাপিল, আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে না। আপনি তো সবই জানেন।'

সব না জানলেও চিঠির ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছি। ডাকাতি প্রমাণ করা বড় শক্ত। রাত্রির অন্ধকারে মুখোশ লাগিয়ে কিংবা

রং-চং মেখে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে একদল লোক যখন হৈ-হল্লা করে বাড়ি চড়াও করে, গৃহস্থ তখন ধন-প্রাণ সামলাবে না চিনতে চেষ্টা করবে এরা কারা ? অথচ, ডাকাতি-মামলায় জড়াতে হলে যে-সব মাল-মশলার প্রয়োজন, তার মধ্যে প্রথম নম্বর এই শনাক্ত বা আইডেন্টিফিকেশন্। যে অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে এই সনাক্ত-কার্যের আয়োজন করা হয়, তার নাম টি. আই. প্যারেড। তার ঘটনাস্থল জেলখানা।

আমার চাকরি-জীবনের প্রথম দিকে বিভিন্ন জেলে এমনি বহু টি. আই. প্যারেডের আয়োজন আমাকেই করতে হয়েছে। যে-ক'জন আসামী, তার সাত-আট গুণ অন্যান্য মামলার হাজতীদের সঙ্গে মিশিয়ে তাদের লাইনবন্দী করে দাঁড় করিয়েছি জেলখানার মাঠে। একজন জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন ছাপানো ফর্ম এবং অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে। তিনিই অনুষ্ঠানের পুরোধা। তাঁরই নির্দেশে জেলের বাইরে থেকে এক-একজন করে সাক্ষীদের ডাক পড়েছে। সাক্ষী—অর্থাৎ যার বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, সেই হতভাগ্য গৃহস্থের পরিবারবর্গ। তার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুইই আছে। আছে ক্ষীণ-দৃষ্টি বৃদ্ধ, অপোগণ্ড শিশু এবং তরুণী কুলবধূ, যে কোনদিন জেলে ঢোকা দূরে থাক, ঘরের বাইরে পা দেয় নি। হাতে ও কানে বাঁধা ব্যাণ্ডেজ—বালা এবং দুল ছিনিয়ে নেবার ক্ষতচিহ্ন। আর আছে প্রাপ্তযৌবনা কুমারী মেয়ে, যে গয়না হারায় নি, হারিয়েছে তার চেয়ে অনেক বড় জিনিস—তার দেহের সম্ভ্রম ও শুচিতা।

হাকিম নির্দেশ দিলেন,—কাছে গিয়ে দেখুন, কাউকে চিনতে পারেন কি না। আমি তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছি—সন্ত্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ; ক'দিন আগে যে দৃশ্য দেখেছে, এখনো বুকে চেপে আছে নাইট-মেয়ার বা শ্বাসরোধকারী দুঃস্বপ্নের মত। সেই আতঙ্ক ও বিহ্বলতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং ভয়াবহ পরিবেশে এক পলক যাকে চোখে দেখেছে, তাকে মনে করবার মত মানসিক স্থৈর্য ফিরে আসে নি। তাছাড়া কাকে চিনবে,

কেমন করেই বা চিনবে? জেল-হাজতে জড়ো-করা এই বিভ্রান্তিকর জটলার মধ্যে সেই মুখগুলো যদি থেকেও থাকে, এতদিনে সেখানে স্বাভাবিক ও ইচ্ছাকৃত কত অদল-বদল ঘটে গেছে। কারো গালভরা সযত্নলালিত দাড়ি, কারো মাথায় যথেচ্ছ-বর্ধিত রুক্ষ চুল। কেউ পাজামা ছেড়ে ধুতি ধরেছে, কেউ বা ধার-করা আলোয়ানে আপাদ-মস্তক জড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাসছে। কার সাধ্য চিনে বার করে কারা সেই কাল-রাত্রির ধ্বংসলীলার নায়ক? সাক্ষীরা এসেছে, আর একবার করে ঘুরে চলে গেছে। কেউ বা এতগুলো চোর-ডাকাতের কাছে ঘেঁষবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি। কোন সহৃদয় হাকিমের বারংবার আশ্বাসে ও নির্বন্ধে দু-একজন যদি বা কারো দিকে আঙুল তুলেছে, সে হয় ভুল লোক, অর্থাৎ অন্য মামলার আসামী, নয় তো নিতান্তই অ্যাকসিডেন্টের বলি।

আমি একপাশে বসে বসে দেখেছি, আর প্রতিবারেই মনে হয়েছে, ফাঁকতালে একটি চমৎকার প্রহসন দেখে নিলাম।

নকুল সাঁতরাকে টি. আই. প্যারেডের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। যথারীতি পাস করে গেছে। খানাতল্লাশে মাল-পত্রও কিছু পাওয়া যায় নি। আরো তদন্ত দরকার। সাক্ষী খুঁজে পেতে কিংবা তৈরি করতে সময় চাই। যাঁর কোর্টে মামলা, সেই হাকিমটি হয়তো বেয়াড়া ধরনের, বেশি সময় দিতে চান না। তখন পুলিসের হাতে একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র ঐ বি. এল. কেস। কিছুদিনের মত একবার গেঁথে ফেলতে পারলে তারপর ডাকাতি-মামলার সাজ-সরঞ্জাম ধীরে-সুস্থে জোটানো চলবে।

দশধারার সাক্ষী বিশেষ দুষ্প্রাপ্য নয়। হ্যাঁ, লোকটার চলাফেরা সন্দেহজনক, নেশাভাঙ করে, স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, খায়-দায় ভাল, জামা-কাপড়ের জলুস আছে, অথচ জমিজমা নেই, রুজি-রোজগারের ব্যাপারটাও রহস্যময়। কখনো রাজমিস্ত্রী, কখনো ছুতোর, কখনো বা কোথাকার কোন্ চটকলের সর্দার—এসব কথা

কোর্টে গিয়ে বলবার মত লোক জুটে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে এগুলো মিথ্যাও নয়। প্রায় সব গ্রামেই তুজন একজন এই জাতীয় ব্যক্তির দেখা মেলে, যাদের সম্বন্ধে সাধারণ শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ নিজেকে ঠিক নিরাপদ মনে করতে পারে না! এখানে-ওখানে চুরি-ছ্যাঁচড়ামি, মাঝে মাঝে তু-একটা ছোটখাট ডাকাতি, গ্রামাঞ্চলে যা ঘটে থাকে, তার পিছনে যে ঐ ক'টি লোক কলকাঠি নাড়ছে, চাক্ষুষ প্রমাণ না থাকলেও, গ্রামবাসীরা সবাই তা জানে এবং বিশ্বাস করে। এহেন চীজ যত দূরে থাকে, ততই মঙ্গল। ওদের মধ্যে কারো গায়ে যদি একবার 'জেলে'র দাগ লেগে থাকে, তাহলে তো অবশ্যই শতহস্তেন—। এই মনোভাবকে কাজে লাগাতে পুলিসের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

নকুলচন্দ্র হয়তো ঐ অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের একজন। কিংবা অন্য কোনো কারণে সে কিঞ্চিৎ আঞ্চলিক বিরাগ অর্জন করেছিল! তারই সুযোগ নিয়ে, গ্রাম্য দশজনের সাহায্যে পুলিস তাকে দশধারার জালে আটকে ফেলে থাকবে।

আসল কেস অর্থাৎ ৩৯৫ ধারা তখনো চলছে। চৌদ্দদিন অন্তর তারিখ পড়ে এবং নকুলকে তার জেলের পোশাক ছেড়ে জেলখানার ক্লোদিং-গোডাউনে তুলে রাখা তার নিজস্ব সম্পত্তি—ময়লা, ভাঁপসা গন্ধভরা ধুতি, আর তার উপরে একটা অপেক্ষাকৃত ফরসা কোঁচকানো শার্ট চাপিয়ে লোহার-জাল-দিয়ে-ঘেরা, সঙ্কীর্ণ জানালাওয়ালা কয়েদী গাড়িতে একগাদা আসামীর সঙ্গে ঠাসাঠাসি বোঝাই হয়ে কাছারিতে যেতে হয়। সমস্তটা দিন কোর্ট-লক-আপ্ নামক প্রায়-সবদিক-বন্ধ একটা ছোট্ট কামরায় কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসে জেল-গেটে। আসামী সেরেস্তার কেরানীবাবু ওয়ারেণ্ট দেখে পরের তারিখটা জানিয়ে দেন। নকুল আবার সেই সকালে-ছেড়ে-যাওয়া নম্বর-দেওয়া জাঙ্গিয়া-কুর্তা পরে ধুতি আর কামিজটা গুদামে জমা দিয়ে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে চলে যায়।

এমনি কয়েকমাস যাতায়াতের পর একদিন কেস উঠল এবং

কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী নিয়ে নিম্ন আদালত তাকে দায়রায় সোপর্দ করলেন। আবার দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা। শেষ পর্যন্ত সেসন্সে, অর্থাৎ, জজের আদালতে বিচার শুরু হলো। সেখানকার সুবিধা, একবার শুরু হলে শেষ হতে দেরি হয় না। দিনের পর দিন শুনানি চলে। নকুলকে নিয়ে মোট আসামী ছিল আটজন। বিচারে আটদিনও লাগল না। সাতদিনের দিন রায় দিলেন দায়রা জজ। সব আসামী বে-কসুর খালাস।

ডক থেকে নামিয়ে গোটা দলটাকে কোর্ট ইন্সপেক্টরের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। একজন সিপাই প্রত্যেকের হাতে বাড়ি ফিরে যাবার খরচ বাবদ কয়েক আনা করে পয়সা দিয়ে বুড়ো আঙুলের টিপ নিয়ে বলল, যা ব্যাটারা, খুব বেঁচে গেছিস।

সকলে খুশীমুখে চলে গেল, নকুল দাঁড়িয়ে রইল এক কোণে। অন্য সকলের সঙ্গে সে-ও ডাকাতি-মামলায় ছাড়া পেয়েছে, একথা সে জানে। কিন্তু জজসাহেব কি তাকে দশধারার মেয়াদ থেকেও মুক্তি দিয়েছেন? কোর্টের সিপাই অবশ্য তাকেও চলে যেতে বলেছে, টিপ নিয়েছে, পয়সা দিয়েছে, তবু কোর্টবাবুকে জিজ্ঞাসা না করে যাওয়াটা বোধহয় উচিত হবে না। কী জানি যদি ওদের ভুল হয়ে থাকে। এমন সময় একজন দারোগা ঘরে ঢুকলেন। এঁকে সে বরাবর কোর্টে হাজিরা দিতে দেখেছে এবং তার দলের আসামীরা চাপা গলায় যখন-তখন তাঁকে বাপান্ত করেছে, তা-ও শুনেছে। ইনিই এই কেসের আই. ও. অর্থাৎ তদন্তকারী পুলিস-অফিসার। নকুলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটে নি। ইনি যখন তদন্তের ভার নিয়েছেন, তার আগেই সে দশধারায় জেলে আটকে গেলে। খালাস পাবার পর যখন সে ডক থেকে নেমে আসছিল, হঠাৎ কানে গেল দুজন উকিল বলাবলি করছেন, জজসাহেব তাঁর রায়ে এই আই. ও. টিকে খুব একহাত নিয়েছেন। তার দলের ক'জন আসামীও এই নিয়ে আনন্দ করছিল। মোড়ল গোছের একজন বলছিল, শালাকে নির্ঘাত ডিগ্রেড করে দেবে দেখিস। কথায় কথায় রুলের গুঁতো,

তার মজাটা এবার টের পাবেন বাছাধন।

আই. ও. যখন ঘরে ঢুকলেন, নকুল আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, তাঁর মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত থমথম করছে। হঠাৎ তার দিকে নজর পড়তেই তেড়ে উঠলেন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?

নকুল ভয়ে ভয়ে বলল, আজ্ঞে, আমাকে কি একদম খালাস দেওয়া হয়েছে?

—ন্যাকামি হচ্ছে! মুখ ভেংচে বললেন দারোগাবাবু, 'আমাকে কি একদম খালাস দেওয়া হয়েছে?' তার মানে, কিছু একটা হাতাবার তালে আছ?

বাবুটি যে কারণে ভিতরে ভিতরে তেতে আছেন, সেটা বুঝতে পেরে নকুলেরও বোধহয় ওঁকে নিয়ে একটু মজা করবার ইচ্ছা হলো। বলল, এখানে কী এমন সোনাদানা পড়ে আছে বাবু, যে হাতাবো?

—বটে! আবার রসিকতা হচ্ছে? ছাড়া পেয়ে বড্ড তেল হয়েছে দেখছি। বলে, হঠাৎ চোখ পাকিয়ে গর্জে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে যে বাক্যটি নির্গত হলো, শোনবার পর নকুলও মেজাজ রাখতে পারল না। বেশ চড়া সুরে বলল, কেন মিছিমিছি মুখ খারাপ করছেন? আপনার সঙ্গে তো আমি—

কথাটা শেষ করবার আগেই দারোগাবাবু 'তবে রে' বলে পাশের টেবিলে যে রুলটা ছিল, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং নকুল যতক্ষণ প্রাণের দায়ে ঘর ও বারান্দা পেরিয়ে মাঠে গিয়ে না পড়ল, ততক্ষণ সেটা সমানে চালিয়ে গেলেন। ভিতরে অনেক জ্বালা জমে ছিল। তার খানিকটা বোধহয় মিটল।

নকুল লিখেছে, 'সেদিন দারোগার উপর যত না রাগ হইয়াছিল, তাহার বেশি হইল নিজের উপর। বড় বেশি সাধু হইতে গিয়াছিলাম, হাতে হাতে তাহার ফল পাইলাম। কোনরকমে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাড়ির পথ ধরিলাম। কয়েদীগাড়ি তাহার আগেই চলিয়া গিয়াছে।'

পরদিন সন্ধ্যার দিকে পুলিস গিয়ে নকুল সাঁতরাকে গ্রেপ্তার

করল। তার একটু আগেই সে বাড়ি পেঁ াছেছে। বৌ তুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দেবার আয়োজন করেছিল, তখনো নামানো হয় নি।

অপরাধটা কী? জানতে চেয়েছিল নকুল। পুলিসের জমাদার সরাসরি জবাব দেয় নি, হেসে বলেছিল, 'ব্যাটা পয়লানম্বর বুরবক! ভাগলিই যদি, তুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে কী হয়েছিল?' কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়া বেঁধে জেল গেটে যখন নিয়ে গেল, জেলের বাবুরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একজন এসকেপ্‌ড্‌ প্রিজনার, অর্থাৎ, পলাতক কয়েদী এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, তাঁরা মোটে আশা করেন নি। একটা ছিপে-গাঁথা মাছও তো ছিপওয়ালাকে খানিকক্ষণ ল্যাজে খেলিয়ে হয়রান না করে ডাঙায় ওঠে না।

ল্যাজে না খেলালেও নকুল সাঁতরার একটা কৃতিত্ব আছে। তার এই এসকেপ্‌ উপলক্ষ করে জেল আর পুলিসে বেশ খানিকটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল এবং তাতে শেষ পর্যন্ত হার হয়েছিল পুলিসের। ব্যাপারটা ঠিক কী নিয়ে বেধেছিল, নকুল স্পষ্ট করে বলতে পারে নি। যেটুকু আভাস দিয়েছে, তার থেকেই আমি বুঝতে পারছি।

কোন উপযুক্ত (আইনের ভাষায় কম্‌পিটেন্ট) কোর্টের লিখিত নির্দেশ ছাড়া জেল কাউকে আটকে রাখতে পারে না। এ নির্দেশ-পত্রটির নাম ওয়ারেন্ট্‌। যে-সব লোক বিচারাধীন, অর্থাৎ হাজতবাস করছে, তারা যখন কোর্টে যায়, তাদের ওয়ারেণ্টও ঐ সঙ্গে পুলিসের জিম্মায় গছিয়ে দেওয়া হয় এবং যখন ফিরে আসে, জেল সেটা বুঝে নেয়। যে-লোকের একটা মামলায় মেয়াদ হয়ে গেছে, আরো মামলা রয়েছে, তাদের ওয়ারেণ্টের পিঠে জেলকে বেশ স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে—'কনভিক্ট; নট টু বি রিলিজ্‌ড্‌ ফ্রম কোর্ট'—দণ্ডিত কয়েদী; সুতরাং কোর্ট থেকে ছাড়া চলিবে না।' এই উক্তিটির নীচে স্বয়ং জেল-সুপারের সই থাকবে।

নকুল সাঁতরা ছিল এই শেষের দলে। আগে থেকেই সে জেল খাটছিল। সেদিন ডাকাতি-মামলাটা ফেঁসে যাবার পর কোর্ট-পুলিসের হয়তো সেটা খেয়াল হয় নি। তাকেও তার সহ-আসামীদের

সঙ্গে বিদায় করে দিয়েছিল। সে বিদায় 'জেল হইতে বিদায়' কিনা, ভালো করে জেনে নেবার জন্যে সাঁতরার প্রতীক্ষা এবং তার পরেই আই. ও. বাবুর 'রুলে'র আক্রমণ।

সন্ধ্যার পর কাছারি-ফেরত আসামীদের সঙ্গে ওয়ারেন্ট মিলিয়ে নিতে গিয়ে জেলের কেরানীবাবু যখন হাঁক দিলেন 'নকুলচন্দ্র সাঁতরা', কারো সাড়া পাওয়া গেল না। কে একজন বলল, সে তো খালাস হয়ে গেছে।

—খালাস হবে কি হে! ও তো কয়েদী।

—তাই তো!

জেল থেকে জরুরী চিঠি গেল পুলিসের কাছে—রং রিলিজ ফ্রম্ কোর্ট। দণ্ডিত কয়েদীকে কাছারি থেকে ভুল করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোর্ট-পুলিস কেমন করে জানবে সে দণ্ডিত? কেন, ওয়ারেণ্টের পিঠে কী লেখা আছে? কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টরের অফিস থেকে প্রতিবাদ এল—ও লেখা প্রক্ষিপ্ত; আগে ছিল না। ঐ দিন খালি ওয়ারেণ্ট ফিরে পাবার পর জেল ওটা বসিয়ে দিয়েছে।

এসব বাদানুবাদের ফয়সালা হবার আগেই অবশ্য নকুল সাঁতরার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে।

নকুলের বিরুদ্ধে নতুন মামলা দায়ের হলো—এসকেপিং ফ্রম্ ল-ফুল কাস্‌টডি—আইনসঙ্গত হেপাজত থেকে পলায়ন। যথারীতি চার্জ গঠন এবং অন্যান্য পর্ব শেষ করে হাকিম প্রশ্ন করলেন—তোমার কিছু বলবার আছে?

আসামী যা যা ঘটেছিল তার আদ্যন্ত বর্ণনা দিয়ে গায়ের দাগগুলো যেমনি দেখাতে যাবে কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টর হেঁকে উঠলেন, দিস্ ইজ্ ইররেলেভেণ্ট্ ইওর অনার। আসামী যা বলছে, তার সঙ্গে বর্তমান কেসের কোন সম্পর্ক নেই। সে একজন দণ্ডিত কয়েদী, এবং তার জেলের মেয়াদ শেষ হয় নি। পুলিসের পক্ষে যদি কোনো ত্রুটি হয়েও থাকে, তার সুযোগ সে নিতে পারে না। পুলিসের গাফিলতি দ্বারা, কয়েদী হিসেবে তার যে দায়িত্ব, তার খণ্ডন হয় না।

সে দায়িত্ব-পালনের একমাত্র পথ ছিল জেলে গিয়ে ধরা দেওয়া, টু সারেনডার অ্যাট্ দি জেল-গেট।

সম্ভবতঃ এই যুক্তি গ্রহণ করেই এস. ডি. ও. তাকে 'ল-ফুল কাস্টডি' থেকে পালাবার অপরাধে ছ'মাসের জেল দিয়ে দিলেন!

নকুল সাঁতরার চিঠির শেষ অনুচ্ছেদ একটি প্রশ্ন এবং সেটি আমার উদ্দেশে।

'না পলাইয়াও যখন পলাইবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলাম, তখন পলাইতে আমার কি বাধা ছিল? কী দরকার ছিল আই. ও. বাবুর রুল্ খাইবার? ইহার পরেও কি আপনি জেলের কয়েদীদের সৎ এবং সাধু হইবার উপদেশ দিতে চান?'

॥ পাঁচ ॥

কোনো প্রসিদ্ধ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপক একবার আমার জেল 'ভিজিট' করতে এসেছিলেন। দিগ্‌গজ ব্যক্তি। যেমনি পাণ্ডিত্য, তেমনি ভূয়োদর্শন। দু-দুটো 'ওলজী'তে ডক্টর— ক্রিমিনোলজী এবং পিনোলজী। অর্থাৎ একাধারে অপরাধতত্ত্ব ও দণ্ডবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। আমার চাকরি তখন শেষ হব হব করছে। বহু জেল ঘুরে এবং ঘেঁটে 'বিশেষজ্ঞ' আখ্যা না পেলেও অভিজ্ঞতার ব্যাঙ্কে মোটা সঞ্চয়ের দাবী করতে পারি। সম্ভবত সেই কারণেই কারাবিভাগের কর্তারা তাঁকে আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও বেশ কয়েকদফা বাক্‌চক্রের জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম, সরকারী পরিভাষায় যার নাম রাউণ্ড অব টক্‌স্। বলা বাহুল্য অন্যদিকে যাই হোক, এই একটা বিষয়ে আমরা কোনো দেশের কারো চাইতে কম যাই না।

কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে রীতিমত নিরাশ করলেন। নিজেও কোনো পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করলেন না, আমাকেও তার সুযোগ দিলেন না। তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে দু-চারটি কথাবার্তার পর, প্রথম দিন থেকেই 'ফিল্ড-ওয়ার্কে' নেমে পড়লেন। 'অ্যাডমিশন রেজিস্টার' (যার মধ্যে কয়েদীদের নাম ধাম এবং যাবতীয় বিবরণের ফিরিস্তি থাকে) চেয়ে নিয়ে, তার থেকে বেছে বেছে কতগুলো নাম সংগ্রহ ক'রে তাদের সঙ্গে দেখা-শুনো, আলাপ-সালাপ শুরু করলেন।

কোন্ মন্ত্রবলে তিনি জাতি, বর্ণ, দেশ ও ভাষার বর্ম ভেদ করে 'অপরাধী' নামক প্রাণীর প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে যেতেন, সেখান থেকে কেমন করে কি তথ্য সংগ্রহ করতেন, সে-সব কথা এখানে আলোচ্য নয়। দু সপ্তাহের উপর আমার জেলে কাটিয়ে এখান থেকে কি অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলেন, যাবার আগে তারই আভাসস্বরূপ যে কথাটি বলেছিলেন, সেইটুকুই আমার বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন,

'যাকে জাত-ক্রিমিন্যাল বলে, আপনার এখানে একটাও পেলাম না। আপনার এখানে বলি কেন, যে-ক'টা ইণ্ডিয়ান জেল ঘুরলাম—তা কম ঘুরি নি—সবখানেই তাদের সংখ্যা বড় কম।'

'জাত-ক্রিমিন্যাল' বলতে তিনি বোধহয় বোঝাতে চেয়েছিলেন—'ক্রাইম্' যাদের ধর্ম এবং প্রকৃতি। হঠাৎ একদিন ঝোঁকের মাথায়, আবেগের বশে কিংবা প্রতিহিংসার তাড়নায় খুন করে বসল, বাহাদুরী দেখাবার জন্যে দল বেঁধে ডাকাতি করে এল, সহসা কোনো অরক্ষিত স্ত্রীলোককে পেয়ে কামেচ্ছা মিটিয়ে নিল, কিংবা অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু টাকাকড়ি আত্মসাৎ করে গা ঢাকা দিল—এই জাতীয় অপরাধীকে তিনি, 'ক্রিমিন্যাল' বলে যে একটা জাত আছে, তার মধ্যে ফেলতে চান নি। তাঁর মতে ওরা সব 'ক্যাজুয়্যাল অফেনডার।' আসল ক্রিমিন্যাল তারা, 'ক্রাইম্' যাদের ধ্যান জ্ঞান সাধনার বস্তু, মজ্জাগত সংস্কার কিংবা অত্যাজ্য জীবন-দর্শন।

'এখানে যাদের দেখলাম,' বলেছিলেন অধ্যাপক, 'তাদের বেশির ভাগই অবস্থার দাস, যা কিছু করেছে, লোভে বা বিপাকে পড়ে, কিংবা জীবিকার প্রয়োজনে। তার পেছনে জীবনের কোনো গভীর প্রেরণা নেই। সত্যিকার ক্রিমিন্যাল কর্মযোগীর মত নিষ্কাম, নিরুদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য হয়তো একটা থাকে, কিন্তু সেটা অজুহাত মাত্র, অনেক সময়ে ওটা নিজের মনকে ভোলাবার প্রয়াস। আসলে "ক্রাইম" তার কাছে এক ধরনের "ওয়ার্ক অব্ আর্ট," শিল্পীর সৃষ্টি। ইচ্ছা ক'রে যে করে, তা নয়, ভিতর থেকে কে একজন ঠেলে এগিয়ে দেয়। না ক'রে উপায় নেই।'

সেদিন তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ রাজাবাহাদুরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। হয়তো তার কারণ, অধ্যাপক যাদের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তাদের সঙ্গে তাঁর কোথায় যেন মিল আছে। কিংবা হয়তো, এমনিই। মন কখন কি ভাবে, কেন ভাবে তার কি কোনো হেতু

আছে? থাকলেও তাকে খুঁজতে যাওয়া নিছক বিড়ম্বনা। সে সব 'কেন'র পিছনে না ছুটে যে লোকটিকে সেদিন মনে পড়েছিল, তার প্রসঙ্গটা কিঞ্চিৎ সবিস্তারে বলবার চেষ্টা করি।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা আমার চাকরি-জীবনের প্রথম অধ্যায়ে। তখনো জেলের হাল-চাল, আইন-কানুন পুরোপুরি ধাতস্থ হয় নি। কারাবাসী ও কারাকর্মীর ভিতরে যে দুস্তর ব্যবধান, সেটা ঠিক বজায় রাখতে পারি নি। 'প্রিজনার' হিসাবে এই মানুষটিকে যতটা দূরে রাখা দরকার, তার চেয়ে একটু বেশি কাছে এসে পড়েছিলাম। তার প্রাথমিক কারণ বোধহয় তাঁর রূপ। নারীপুরুষ নির্বিশেষে রূপের যে একটি সর্বজনীন আকর্ষণ আছে, রাজা-বাহাদুরকে দেখেই সেটা প্রথম অনুভব করেছিলাম। অতুলনীয় অঙ্গ-সৌষ্ঠব। দীর্ঘ উন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট, আয়তচক্ষু। কাঁধ এবং বাহুযুগলের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল,—'বৃষস্কন্ধ' ও 'শালপ্রাংশু' বলে যে দুটি বিশেষণ কালিদাস ব্যবহার করে গেছেন, তার মধ্যে কোনো কবিজনোচিত অত্যুক্তি নেই। আর একটা কথা মনে হয়েছিল। এ দেহের প্রতিকণায় শোভাকে ছাড়িয়ে গেছে সম্ভ্রম, সৌষ্ঠবকে ছাপিয়ে উঠেছে আভিজাত্য। গিরীনদা বলেছিলেন, 'সত্যিই রাজাবাহাদুর—Every inch an aristocrat!' আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডার জোন্‌স্‌-এর উপর ভার পড়েছিল ওঁকে সেল্‌-এ পৌঁছে দেবার। ফিরে এসে বলেছিল, Bloody Mountain. বিশেষণ ও প্রকাশের ভঙ্গিটা কিঞ্চিৎ অমার্জিত হলেও, এক কথায় এর চেয়ে যথার্থ পরিচয় বোধহয় আর হতে পারত না। যখনই দেখেছি মনে হতো, লোকটা যেন গিরিশৃঙ্গের সমস্ত মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজাবাহাদুর খুন-মামলার আসামী। ভ্রাতৃহত্যা। অব্যবহিত উপায়ে বিষপ্রয়োগ। কিন্তু তার প্রক্রিয়া অত্যাশ্চর্য ও অভিনব। বিষ সংগ্রহের সুদীর্ঘ এবং জটিল ইতিহাস অনুধাবন করতে গিয়ে পুলিস যে সব তথ্য উদ্ধার করেছিল, তার থেকে চিররহস্যাবৃত মানব-

মনের একটি অনাবিষ্কৃত গোপনকক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। সবটুকু তখনো উন্মোচিত হয় নি। যেটুকু দৃশ্যমান, তাতেই আমরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। একজন মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে আর একজন মানুষের কি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, তার রূপায়ণে কি গভীর অভিনিবেশ, কি দুর্জয় নিষ্ঠা, কি ক্লান্তিহীন সাধনা! শুধু তাই নয়। যে মস্তিক সেই গুপ্ত চক্রান্তের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালিত করেছে, যে ধীর স্থির শাণিত কূটবুদ্ধি প্রতি স্তরে তার স্বাক্ষর রেখে গেছে, তা দিয়ে অনেক কম আয়াসে একটা গোটা রাজ্য ছিনিয়ে আনা যেত। আর এখানে সেই বিপুল প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল একটিমাত্র নিরীহ মানুষের প্রাণটাকে ছিনিয়ে নেওয়া!

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এই হত্যাযজ্ঞের অন্তর্নিহিত প্রেরণা সেই চিরন্তন রাজ্য-লোলুপতা, ক্ষমতা ও বিত্তেব অধিকার-লিপ্সা, অনাদিকাল থেকে ছোট-বড় রাজপরিবারে যা বহু ভ্রাতৃহত্যা পিতৃহত্যার ইন্ধন যুগিয়ে এসেছে। তাই যদি হয়, সেই ঈপ্সিত বস্তুটিকে অনায়াসে আয়ত্ত করবার পথে এখানে তো কোনো বাধা ছিল না। যাকে হত্যা করা হলো, সে তো স্বেচ্ছায় তার সব স্বত্ব ও স্বামিত্ব থেকে নিঃশব্দে সরে দাঁড়িয়েছিল। উনিশ বছরে পা দিয়েই সামান্য মাসোহারার বিনিময়ে তার অংশের সমস্ত সম্পত্তি বড় ভাইকে লিখে দিয়েছিল। পৈতৃক প্রাসাদে বাস কববার অধিকারটুকু পর্যন্ত রাখে নি। সব ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসেছিল। ব্যক্তিগত ব্যবহারের দু-চারটি তুচ্ছ জিনিস ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনে নি। কোলকাতার এক অখ্যাত গলির ছোট্ট ভাড়া-বাড়িতে লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। বিয়ে করে নি। করবার ইচ্ছাও ত্যাগ করেছিল; যাতে করে, তার কোনো উত্তরপুরুষ, সুদূর ভবিষ্যতে, সে যা ছেড়ে দিয়ে চলে এল, তারই দাবী নিয়ে সেই প্রাসাদের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে না পারে।

উত্তরাধিকারের সঙ্গে জড়িত দুটিমাত্র জিনিস সে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। একটি পিতার আমলের ভৃত্য, গঙ্গাচরণ, আর

একটি তারই মুখের ডাক—'ছোটকুমার'। প্রথমটি তাকে ছাড়ে নি, দ্বিতীয়টি সে অনেক বকাবকি করেও ছাড়াতে পারে নি। ঐ নামটুকু ছাড়া 'কুমারত্বের' আর কোনো নিদর্শন তার জীবনযাত্রার কোনো-খানেই দেখা যায় নি। স্বভাবে নিতান্ত নিরীহ, নির্বিরোধ, সরল ও অমায়িক। চালচলনে অতিশয় সাদাসিদে। বই ছাড়া আর কোনো নেশার বালাই নেই। বন্ধু-সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ অতি ক্ষীণ। যেটুকু ছিল, তার মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও দেখা দেয় নি। সে যে কোনো দিন কারো আক্রোশ বা বিদ্বেষের পাত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে, একথা কে ভেবেছিল ?

তবু তাকেই একদিন আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হলো। আকস্মিকভাবে নয়, তার পিছনে কি বিপুল আয়োজন ! সেই একই প্রশ্ন আবার আসছে—কেন ? কি প্রয়োজন ছিল এই ছেলেটিকে অত কাণ্ড করে মেরে ফেলবার ? কি উদ্দেশ্য ?

সে প্রশ্ন আজও আমার কাছে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। পুলিস কিংবা আদালত সেই নিগূঢ় সত্যে পৌছতে পারে নি। কোনো মনস্তত্ত্ববিদ হয়তো এর উপরে কিছুটা আলোকপাত করতে পারেন। কিন্তু তাঁকেও স্বীকার করতে হবে, 'এটা হয়, এই পর্যন্ত জানি, কেন হয় তা জানি না।'

আমার যেটুকু আবিষ্কার, তার মূলসূত্র রাজাবাহাদুরের নিজের উক্তি। দীর্ঘদিন পরে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তখন একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলেন। মনে আছে, সেদিন আবিষ্কারের উল্লাসে আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। এত চেষ্টা, এত সাধ্য-সাধনা, এত দীর্ঘদিনের গবেষণা ও অনুসন্ধানে যা কেউ পায় নি, আমি তাই পেলাম। কলম্বাসের চেয়েও আমি ভাগ্যবান। তারপর যেমন বয়স বেড়েছে, জীবনে অনেক কিছু দেখেছি এবং শুনেছি, ঘা খেয়ে খেয়ে অনেক কিছু শিখেছি, তখন মনে হয়েছে, রাজাবাহাদুর সেদিন যা বলেছিলেন, তার মধ্যে

কপটতা হয়তো ছিল না, কিন্তু সেইটাই যে সত্য সে-বিষয়ে কি নিজেই নিশ্চিত ছিলেন ? আমার মনে হয়, ছিলেন না। উকিল, হাকিম, পুলিস এবং আমাদের মত তিনিও একজন অনুসন্ধানী মাত্র। নিজের মনের ভিতরটা হাতড়ে দেখতে গিয়ে ঐ উত্তরটা পেয়ে গিয়েছিলেন। সেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের ভিলেন ইয়াগো মাঝে মাঝে নিজের কাছে তার চিন্তা ও আচরণের একটা কৈফিয়ত খাড়া করবার চেষ্টা করেছে। সেই সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলেছেন—motive hunting of a motiveless malignity. আমার মনে হয়েছে, কথাটা রাজাবাহাদুরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটাও motive hunting ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে খুঁজে বের করবার চেষ্টা। আত্মানুসন্ধান। আসলে হয়তো কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না। নিছক নিরুদ্দেশ্য ম্যালিগনিটি, কিংবা আর কিছু।

তবু রাজাবাহাদুরের সেই স্বীকারোক্তি আজ আর আমি গোপন রাখতে চাই না। যথাসময়ে প্রকাশ করব। তার আগে আরো কিছু বলবার আছে। বিশেষ করে আর একজনের কথা, যার বিস্ময়কর প্রতিভার সুবর্ণ-সংযোগ না ঘটলে রাজাবাহাদুরের পরিকল্পনা সার্থক হতো না। সে একজন তরুণ ডাক্তার। নাম—ধরুন, নিশানাথ লাহিড়ী।

নিশানাথ মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র। সেখানে তার প্রধান অধীত বিষয় ছিল জীবাণুতত্ত্ব। বেরিয়ে এসে তাই নিয়েই গবেষণা শুরু করেছিল। অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিন্তু মহাশক্তিধর মারীকীটের সন্ধান। উপযুক্ত সহায় ও সুযোগ পেলে এই তরুণ বিজ্ঞানী মানব-কল্যাণের এই বিশেষ ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেখিয়ে একদিন বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, সে বিষয়ে তার অধ্যাপকেরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু কোথেকে আসবে সেই সুযোগ ? কে হবে সেই সহায় ? নিজের সঙ্গতি বলতে কিছুই ছিল না। বরং পাস করে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে

বৃদ্ধ মা-বাপ, অপোগণ্ড ভাইবোন, স্ত্রী ও একটি শিশুকন্যার ভার কাঁধে এসে চেপেছিল। নিশানাথ বুঝেছিল, 'রিসার্চ'-এর বিলাস তাকে ছাড়তে হবে। ল্যাবরেটরী ছেড়ে নামতে হবে রোজগারের ধান্দায়।

সে পথও সহজ বা সরল নয়। তখনকার দিনে চাকরি মেলা দুষ্কর। আর প্র্যাকটিস্? তার পিছনেও অনেকখানি প্রস্তুতির প্রয়োজন। সেই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আনুকূল্যের আশা নিয়ে নিশানাথ একদিন হাজির হলো তার হিতৈষী মুরুব্বী এবং প্রাক্তন শিক্ষক ডাক্তার মুস্তফির কাছে। মুস্তফি নামী ডাক্তার এবং রাজাবাহাদুরের গৃহ-চিকিৎসক। লাহিড়ী যখন গিয়ে পৌঁছল, তিনি তখন বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কয়েক সেকেণ্ড কি ভেবে নিয়ে বললেন, গাড়িতে ওঠো। নিশানাথ সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাতেই যোগ করলেন, 'চল না?' বলে, সোজা নিয়ে গেলেন রাজাবাহাদুরের দরবারে। মোটামুটি একটা ক্লিনিক কিংবা ডিস্‌পেনসারি সাজিয়ে বসবার মত কিছু সাহায্য, বিকল্পে একটা চাকরি—এর বেশি কোনো প্রত্যাশা মুস্তফির মনেও ছিল না। কিন্তু ভাগ্যচক্রের কি আশ্চর্য বিবর্তন! 'ছেলেটি'র প্রতিভার পরিচয় পাবার পর রাজহস্তের বদান্যতা আরো অনেকখানি প্রসারিত হলো। সহকারী গৃহচিকিৎসক হিসাবে একটা মাস মাইনের চাকরির ব্যবস্থা তখনই হয়ে গেল। রাজাবাহাদুর বিনীত মৃদু স্বরে মুস্তফিকে বললেন, আত্মীয়-পরিজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, লোক-লস্কর নিয়ে পরিবারটি তো আমার ছোট নয়, স্যর। কারো না কারো একটা কিছু রোজই প্রায় লেগে আছে। সব ব্যাপারে আপনাকে ধরে টানাটানি—তার চেয়ে এ ভালোই হলো। উনি একবার করে ঘুরে যাবেন। তেমন তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি তো রইলেনই।

এটা গেল প্রাথমিক বন্দোবস্ত। পরের পর্বটাই আসল। নিরুদ্বিগ্ন মন দিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাবার মত একটি সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী। রাজাবাহাদুর খাজাঞ্চিকে ডেকে তখনই একটা মোটা টাকার চেক্ লিখে আনতে বললেন এবং নিশানাথের দিকে ফিরে বললেন,

এটা শুধু ঘর, আসবাবপত্তর আর আনুষঙ্গিক যা কিছু দরকার, তার জন্যে। যন্ত্রপাতি বা রিসার্চের দরুন আর যা যা প্রয়োজন, তার একটা লিস্টি করে ফেলুন। কোনো রকম টানাটানি করবেন না। যেখানকার যে-টা সেরা জিনিস বেছে নেবেন। দামের দিকটা আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার ম্যানেজার এখন বিলেতে আছে। লিস্টিটা তার কাছে পাঠিয়ে দেবো। নিজে দেখে-শুনে সংগ্রহ করে সামনের ওপর প্যাক করিয়ে একেবারে সঙ্গে নিয়ে আসবে। কি বলেন স্যার? এইটাই ভালো ব্যবস্থা নয়? ও-সব ডেলিকেট জিনিস, সাবধান মত নাড়াচাড়া না করলে পথেই কোনোট, খারাপ হয়ে যেতে পারে।

শেষ কথাগুলো ডাক্তার মুস্তফির উদ্দেশে। তিনি আবেগের সুরে বললেন, আমি আর কি বলবো, রাজাবাহাদুর? বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার এই মহৎ দান—

—এই দেখুন; আপনিও যদি অমন করে বলেন স্যর, তাহলে তো বড় মুশকিল। দানটান কিছু নয়, ডক্টর মুস্তফি। একরাশ পড়ে-পাওয়া টাকা; ব্যাঙ্কে বসে বসে পচ্‌ছে। একটা ছেলে নেই যে, তার জন্যে রেখে যাবো। একটা মাত্র ভাই, সেও তো দেখলেন বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল। কি হবে টাকা দিয়ে? তবু যদি এই রকম একটি প্রতিভাবান ছেলেকে একটু দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, শুধু ওর নয়, দেশের, দশের মঙ্গল হবে। এই সুযোগটুকু যে আপনি আমাকে পাইয়ে দিলেন, তার জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। ...আচ্ছা, তাহলে ঐ কথাই রইল লাহিড়ী। তোমাকে কিন্তু ভাই আমি 'তুমি' বলেই ডাকবো।

—নিশ্চয় নিশ্চয়, তুমি বলবেন বৈকি? সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ডাক্তার মুস্তফি। একেবারে ছেলেমানুষ। তাছাড়া আমার ছাত্র।

—শুধু ছাত্র নয় স্যর, আপনার উপযুক্ত ছাত্র।

মাসখানেকের মধ্যেই ইউরোপ থেকে কয়েকটি সদ্য-আবিষ্কৃত মহামূল্য যন্ত্র এসে পৌঁছল। একেবারে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত

হলো ল্যাবরেটরী। রাজাবাহাদুর একদিন এসে দেখে গেলেন। নিশানাথ তখন কাজ করছিল। রাজ-অতিথিকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে একটি একটি করে প্রতিটি যন্ত্রের বৃত্তি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে দিল। তিনি মন দিয়ে শুনলেন। যাবার সময় বললেন, কোথাও কোনো ত্রুটি নেই তো? যা চেয়েছিলে, সব পেয়েছ?

—তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি রাজাবাহাদুর। আশীর্বাদ করুন, যেন সেই পাওয়ার গৌরব বজায় রাখতে পারি।

রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গীর মধ্যে একটি অরাজোচিত বিনম্র সঙ্কোচ সর্বদাই লেগে আছে। যেন তাঁর দৈবায়ত্ত রাজপদ এবং তার বাহক এই বিশাল দেহটার জন্যে তিনি সকলের কাছেই লজ্জিত। ব্যবহার ও কথাবার্তার মাধুর্য দিয়ে ঐ দুটি বস্তুকে যতখানি আড়াল করে রাখা যায়, তারই জন্যে সচেষ্ট। নিশানাথের মত একান্ত আশ্রিতজনের কাছেও তাঁর কুণ্ঠার সীমা নেই। তার কথায় অত্যন্ত লজ্জা পেয়েছেন এমনিভাবে দাঁতে জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললেন, না না, ও কথা বলো না, তোমাকে আশীর্বাদ করবার মত স্পর্ধা আমার নেই। প্রাণভরে শুভেচ্ছা জানাই। তুমি অনেক বড় হও, আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল কর, এই প্রার্থনা করি।

বছর দেড়েক কেটে যাবার পর নিশানাথ তার গবেষণার এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছল, যেখানে বিশেষজ্ঞের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তেমন ব্যক্তি এদেশে অত্যন্ত দুর্লভ। দু-একজন যাঁরা আছেন, তাঁরা অন্য ক্ষেত্রে ব্যস্ত। ঐ বিশেষ গবেষণার উপযোগী কোনো ল্যাবরেটরীও তখন কোলকাতায় নেই। পশ্চিমভারতের একটি প্রসিদ্ধ ইনস্টিটিউট্‌এ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাওয়া যেতে পারে। উচ্চাঙ্গ রিসার্চে সাহায্য করার মত বিদেশী বিজ্ঞানীও আছেন ক'জন। কিন্তু সেখানে জায়গা পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। অত্যন্ত নামী লোকের জোরালো সুপারিশ চাই। ডাক্তার মুস্তফিকে কত আর বিরক্ত করা যায়? তাছাড়া তাঁর কথা কতখানি টিকবে, তাই বা কে জানে? সেদিক দিয়ে সুরাহা দেখা দিলেও

আর্থিক প্রশ্নটা আরো বড়। অনেক টাকার দরকার।

ওখানকার খরচ,—কতদিন থাকতে হবে ঠিক নেই—তার উপরে কোলকাতার সংসারের ব্যয়ভার। অর্থাৎ চাকরিটি খোয়ালে চলবে না।

রাজাবাহাদুরের কাছে কথাটা কেমন করে পাড়া যায়, এইসব যখন ভাবছে, হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে ডিনারের নিমন্ত্রণ এসে হাজির। উপলক্ষের উল্লেখ নেই। অনেক সময়েই থাকে না। বিনা উপলক্ষে যখন তখন বন্ধুবান্ধব এবং আশ্রিত-পরিজনদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা ওঁর একটা বিলাস।

কিন্তু এবারে, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল নিশানাথ, নিমন্ত্রিত সে একা। খাবার যেখানে দেওয়া হলো, সেটাও ভোজনশালা নয়, সদর ও অন্দরমহলের মাঝামাঝি রাজাবাহাদুরের নিজস্ব গোপন-মহলের একটি ছোট ঘর। তিনিও বসলেন অতিথির মুখোমুখি। মাঝখানে টেবিলের উপর খাবার সাজানো। উপকরণ যথারীতি; অর্থাৎ বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের অভাব নেই। অভাব পরিবেশকের। সেই জমকালো পোশাকের তকমা-আঁটা 'বয়' বা ওয়েটারদের কোথাও দেখা গেল না। রাজাবাহাদুর তাঁর সেই নিজস্ব মধুর হাসির সঙ্গে মৃদু কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন, রকম-সকম দেখে তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে গেছ?

নিশানাথ অস্বীকার করল না—তা একটু হয়েছি।

রাজাবাহাদুরের মুখে সেই হাসিটি মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার স্নিগ্ধ রেখাগুলো লেগে রইল। কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর বললেন, অনেকদিন থেকে ভাবছি, একটা বেলা দুজনে একসঙ্গে বসে খাবো। সেখানে আব কেউ থাকবে না; এমন কি বয়-বেয়ারার উৎপাত পর্যন্ত না। তোমার যেটি ভালো লাগবে, আমি নিজে হাতে পাতে তুলে দেবো। প্ল্যানটা খুব অরিজিন্যাল; কি বল?

নিশানাথ বোধহয় একটু বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। রাজাবাহাদুরও সেজন্যে অপেক্ষা

করলেন না। বললেন, কিন্তু গোড়াতে কাজটা যত সোজা বলে মনে করেছিলাম, এখন দেখছি তা মোটেই নয়। ধর, এই পদার্থটি—কি এটা? বোধহয় চিংড়িমাছের মালাইকারী—এটিকে পাতে ঢালতে গিয়ে ডিশখানা যদি একেবারে তোমার কোলের উপর উপুড় করে ফেলি, ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে বল দেখি?

বলে হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর চেয়ারটা একটু টেনে গোছগাছ করে বসে নিয়ে বললেন, নাও এসো। আরম্ভ তো করা যাক। তারপর তোমার সিল্কের পাঞ্জাবির কপালে যদি চিংড়িমাছের ঝোল ভক্ষণ লেখা থাকে, কে খণ্ডাবে বল?

খেতে খেতে যে-সব কথাবার্তা চলল—রাজাবাহাদুরই চালালেন—তার বিষয় হাল্কা এবং সুরটি অন্তরঙ্গ; তার ফলে লাহিড়ীর মধ্যে প্রথমে যেটুকু আড়ষ্টতা দেখা দিয়েছিল, কাটিয়ে উঠতে দেরি হলো না। নানা প্রসঙ্গের পর কিসের একটা সূত্র ধরে রাজাবাহাদুর হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমার কাছে আমার কিন্তু একটি প্রার্থনা আছে, নিশানাথ।

—'প্রার্থনা!' ডাক্তারের কাঁটা-চামচে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

—হ্যাঁ; প্রার্থনাই বলবো। সে জিনিস আর কারো কাছে চাওয়া যায় না, আর কেউ তা দিতেও পারবে না।

—এ শুধু আমাকে লজ্জা দেওয়া রাজাবাহাদুর। আপনার কোনো কাজে যদি কখনো লাগতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করবো—এ কথাও কি আপনাকে বলে দিতে হবে? কিন্তু এমন কি জিনিস থাকতে পারে, যা আমি আপনাকে দিতে পারি, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।

—তোমার কাছে তা অতি সাধারণ, কিন্তু আমার কাছে ভীষণ মূল্যবান।

মুহূর্তকাল থেমে ডাক্তারের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন রাজবাহাদুর। তারপর যোগ করলেন, আমাকে কিছুটা প্লেগের জার্ম যোগাড় করে দিতে হবে।

লাহিড়ী কাঁটায় গেঁথে একটা কি মুখে তুলতে যাচ্ছিল। সবসুদ্ধ ডিশের উপর পড়ে গেল। বিস্ময়-বিমূঢ় চোখ দুটো রাজাবাহাদুরের মুখের উপর রেখে ভীতি-বিহ্বল চাপাগলায় তাঁরই কথাটা শুধু আউড়ে গেল—প্লেগের জার্ম !

রাজাবাহাদুর সহজ সুরেই বললেন, আমার বিশেষ দরকার।

—ও দিয়ে আপনি কি করবেন!—প্রশ্ন নয়, আরেক দফা বিস্ময়প্রকাশ।

রাজাবাহাদুর সজোরে হেসে উঠলেন। পরক্ষণেই কুঞ্চিত চোখে লাহিড়ীর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি না একজন প্যাথলজিস্ট ? হাজার রকম রোগের বীজাণু ঘাঁটাই তো তোমার কাজ। প্লেগের নাম শুনেই ভয় পেয়ে গেলে ?

কথাটা বোধহয় জীবাণু-বিজ্ঞানীর অভিমানে আঘাত করল। সোজা হয়ে বসে আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলল, আজ্ঞে না ; ভয় পাই নি। জিজ্ঞেস করছিলাম, ও রকম মারাত্মক জিনিস আপনার কি কাজে লাগবে।

—'মারাত্মক কাজেই লাগবে'—তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসি-মুখে বললেন রাজাবাহাদুর—সেটাও তোমাকে জানাবো বৈকি ? কিন্তু তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না। আর দুটো পোলাও নাও। দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি।

চামচে করে খানিকটা পোলাও ডাক্তারের প্লেটে তুলে দিতে দিতে বললেন, আবদুল রাঁধে ভালো, ওর ঠাকুর্দার বাবা নাকি জাহাঙ্গীর বাদশার খানা পাকাত। নুরজাহান খুশী হয়ে তাকে একটা সোনার মেডেল দিয়েছিলেন। সেটা অবিশ্যি নেই।

নিশানাথের ভোজনস্পৃহা চলে গিয়েছিল। তবু পাছে দুর্বলতা ধরা পড়ে, তাই আপত্তি করল না। এটা-ওটা নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়াও করতে হলো। এই ভাবান্তর রাজবাহাদুরের নজরে পড়লেও তিনি আর ও নিয়ে কোনো কথাবার্তা বললেন না।

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল থেকে প্লেগ তখন বিদায় নিয়েছে।

পুনরাক্রমণের সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং কোনো ল্যাবরেটরীতে তার জীবাণু নিয়ে কারো গবেষণা করবার কথা নয়। করলেও লাহিড়ীর সে খবর জানা নেই। এই কথাই যে সে বলবে, রাজাবাহাদুর অনুমান করেছিলেন এবং তার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। উত্তরে বললেন, এখানে সুবিধে হবে না তা জানি। তোমাকে একটু কষ্ট করে বাইরে যেতে হবে। বাইরে মানে বেশি দূরে নয়, দেশের মধ্যেই—

বলে, পশ্চিমভারতের সেই প্রসিদ্ধ ইন্‌স্টিটিউটের নাম করলেন। লাহিড়ী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ওরে বাপ রে, ওখানে আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?

—দেবে না মানে? দেখবে?

রাজাবাহাদুর উঠে গিয়ে পাশের কোন্ একটা কামরায় ঢুকলেন। মিনিটখানেক পরে লোহার সিন্দুকের ভারী পাল্লা খোলার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই একখানা খাম হাতে করে বেরিয়ে এসে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে বললেন, পড়।

খামের মুখটা খোলাই ছিল। ভিতরকার চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ডাক্তার প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ওরা রাজী হয়ে গেছে! স্যার তো আমাকে এসব কিছুই বলেন নি?

—বলবার সময় আসে নি বলেই বলেন নি। চিঠিটাও সবে দুদিন হলো পেয়েছি।

লাহিড়ীর মুখে আর কথা সর্‌ল না। আজ কার মুখ দেখে ভোর হয়েছিল? কে জানে আরো কত আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা তার জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। প্রতিটির মধ্যেই তার ভাগ্যলক্ষ্মীর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যা ছিল তার একান্ত অন্তরের অব্যক্ত কামনা মাত্র, এক অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ যার সন্ধান পায় নি, তিনিই অলক্ষ্যে বসে তার সফল রূপায়ণের সমস্ত আয়োজন করে রেখে দিয়েছেন। এ সুযোগ সে অবহেলা করবে না। তার গবেষণার বিষয় অবশ্য প্লেগ নয়। তবু একে অবলম্বন করেই যাত্রা শুরু করা যাক। অত

বড় প্রতিষ্ঠানের সিংহদ্বার একবার যদি খোলা পাওয়া যায়, তার পথ সে নিজের শক্তিতেই করে নিতে পারবে। ততখানি আত্মবিশ্বাস তার আছে।

রাজাবাহাদুরের কাজ নিয়ে যাবার সব চেয়ে বড় সুবিধা হলো—এখানকার চাকরিটি বজায় থাকবে। অন্তত সে দাবী করা চলবে। তার নিজের প্রয়োজনে যদি যেতে হতো, মুস্তফির সুপারিশ পাওয়া গেলেও,—তাতেও সন্দেহ ছিল—চাকরির আশা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তার মানে, যাওয়া হতো না। এতবড় একটা সাফল্যের স্বপ্ন চিরদিন আকাশ-কুসুমই থেকে যেত। আজ তার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ডাক্তার যখন এইসব দিকগুলো ভেবে দেখছিল, রাজাবাহাদুর নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। যখন দেখলেন, যেটুকু টোপ ফেলা হয়েছে, ব্যর্থ হয় নি, তখন বাকীটুকু ফেলবার আয়োজন করলেন। বললেন, এদিকের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ম্যানেজারকে বলে দিয়েছি, ওখানে তোমার যতদিনই লাগুক, সবটাই পুরো মাইনের ছুটি বলে গণ্য হবে। মাসের ১লা তারিখে আমারই লোক গিয়ে টাকাটা তোমার বাবার হাতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তার ওপরে যদি কখনো কিছু দরকার হয়, আমাকে একটু জানালেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেবো। বৌমাকেও সেই কথা বলো। যে প্রয়োজনই হোক, জানাতে যেন কোনোরকম সঙ্কোচ না করেন।

বলতে বলতে ভারী মুখের উপর একটা গাম্ভীর্যের ছায়া ঘনিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ মাটির দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। আবার যখন শুরু করলেন, গলাটাও ভারী শোনাল। তেমনি নতমুখেই বললেন, কোনোদিন মুখ ফুটে না বললেও একথা তুমি নিশ্চয়ই জানো নিশানাথ, তোমাকে আমি নিজের ভাই-এর থেকে আলাদা করে দেখি না। সে হতভাগাটা যেদিন সব ছেড়েছুড়ে বাউণ্ডুলে হয়ে বেরিয়ে গেল; এতবড় বংশের মানটুকুও রাখল না, একটা

বিয়ে-থা পর্যন্ত করল না, সেদিন থেকে আমার মন ভিতরে ভিতরে কাকে যেন খুঁজছিল। সে যে নিজে থেকে বাড়ি বয়ে এসে ধরা দেবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যে আমার নিজেরই গরজ।⋯ থাক সে কথা। ও, আর একটা ছোট্ট কাজ বাকী রয়ে গেছে।

বলে, তখনই ব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন। পাশের ঘরে আবার সেই লোহার সিন্দুক খোলা এবং বন্ধ করার আওয়াজ। যখন বেরিয়ে এলেন, হাতে একখানা বিশেষ আকৃতির কাগজ, ডাক্তারের সঙ্গে যার পরিচয় আরো অনেকবার ঘটে গেছে। এগিয়ে ধরে বললেন, এটা রেখে দাও।

কাগজের অঙ্কটা চোখে পড়তেই লাহিড়ীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল—পাঁচ হাজার টাকা! তবু হাত না বাড়িয়ে অনেকটা নিস্পৃহকণ্ঠে বলল, কি ওটা?

রাজাবাহাদুর সরাসরি তার জবাব না দিয়ে বললেন, যে পরিমাণ ক্ষতি তোমার করিয়ে দিলাম, অর্থ দিয়ে তার পূরণ হয় না। সে চেষ্টাও আমি করছি না। এটা এমনিই—মনে কর, ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা। আমার ঠাকুর্দা হলে হয়তো একটা গ্রাম দান করে বসতেন। সে তুলনায় এ তো কিছুই নয়। নাও।

লাহিড়ী দুহাত বাড়িয়ে চেকখানা গ্রহণ করল এবং নত হয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলল, যে ভাবেই দিন, আপনার স্নেহের দানকে অস্বীকার করবো, সে স্পর্ধা আমার নেই। আপনার কাছে হাত পাতা আমার নতুন নয়। তার মধ্যে লজ্জারও কোনো কারণ দেখি না। লজ্জা পাচ্ছি অন্য কারণে। আপনি আমার ক্ষতি করিয়ে দিলেন, এমন কথাও আপনার মুখ থেকে আমাকে শুনতে হলো!

—ক্ষতি করছি না?

—কোথায়, কেমন করে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর মৃদু হেসে হাল্কা সুরে বললেন, ছাখ ডাক্তার, তোমার ঐ ল্যাবরেটরীতে বসে দিনের পর দিন তুমি কি কর, কি

আছে ঐ যন্ত্রগুলোর মধ্যে, সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান দূরে থাক, ধারণা করবার মত বিদ্যেও আমার পেটে নেই, তা আমি জানি। আমি তো কোন্ ছার, অনেক মহা-মহা পণ্ডিতেরও নেই। কিন্তু তোমার ঐ সাধনার দামটা যে কত বড়, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও এ ঘটে নেই, একথা মনে করছ কেন?

নিশানাথ ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। দাঁতে জিভ কেটে বলল, ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন, তার ঠিক নেই। আমি বুঝি তাই বলেছি? আপনি বড্ড—

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই তার মৃদু কণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে বেজে উঠল সুগম্ভীর স্বর—নিছক নিজের স্বার্থে সেই সাধনাপীঠ থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্যে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সে লোকসানের কি তুলনা আছে?

—এখানে আপনার ভুল হলো, রাজাবাহাদুর। লোকসান তো নয়ই, রিসার্চের দিক থেকে আমি অনেকখানি লাভবান হলাম। এত বড় সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? কিন্তু এর মধ্যে আপনার নিজের স্বার্থ টা কী এখনো জানতে পারি নি।

—আজ থাক, সে কথা আরেকদিন বলবো।

সে 'আরেকদিন' ক'দিনের মধ্যেই এসে গেল। নিজের প্রাসাদে নয়, নিশানাথের ল্যাবরেটরীর নিভৃতকক্ষে বসে নিতান্ত সহজ সুরে রাজাবাহাদুর তাঁর এই বিচিত্র অভিযানের গোপন উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করলেন। সেটি যে 'মারাত্মক', সে আভাস তিনি আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। ডাক্তার তার জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল। মনে মনে তার একটা কল্পিত রূপও দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। শুনবার পর মনে হলো তার কল্পনাশক্তি কত দীন! আরো মনে হলো, ভাষাকে যে ভাব প্রকাশের বাহন বলা হয়, তার মধ্যে কোনো সত্য নেই; বরং সে অনেক পিছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। সংগৃহীত হয়ে বেলোকে যে কাজে এবং যে ভাবে নিয়োগ করা হবে,

'মারাত্মক' নামক নিরীহ বিশেষণ দিয়ে তার শতাংশের এক অংশও ব্যক্ত করা যায় না। তাকে পুরোপুরি প্রকাশ করবার মত যোগ্য বিশেষণ এখনো তৈরী হয় নি।

তারা দুজন ছাড়া সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল না। ছিল কতগুলো যন্ত্র। নিশানাথ সভয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, যেন, যে-কোনো মুহূর্তে তারা সরবে প্রতিবাদ করে উঠবে। তারপর মনে পড়েছিল ওরা নিষ্প্রাণ, জড়পদার্থ। কিন্তু সে নিজে তো জড় নয়, পরিপূর্ণ চেতনাসম্পন্ন মানুষ। তবু প্রতিবাদ করতে পেরেছিল কি? পারে নি। তার ভিতর থেকে একজন সবেগে মাথা তুলে দাঁড়ালেও, আরেকজন এগিয়ে গিয়ে তার গলা টিপে ধরেছিল। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি অনেক বেশি শক্তিমান।

একবার মনে হয়েছিল, সে ডাক্তার, মানুষের কল্যাণ তার ব্রত, তার একমাত্র লক্ষ্য মানুষকে ব্যাধিমুক্ত করা, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা। তারই জন্য তার এই দুস্তর সাধনা, এই বিপুল আয়োজন। সে আদর্শ থেকে স্খলিত হলে আর রইল কি? পরক্ষণেই সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে জেগে উঠল লোভ—অর্থ, খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার লালসা। বড় হতে হবে। নৈতিক আদর্শকে আঁকড়ে ধরে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকবার জন্যে তার জন্ম হয় নি। প্রচলিত ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং পাপ-পুণ্যের সংস্কার দিয়ে তৈরি যে বন্ধন, তার পাশ কেটে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। তার নির্ধারিত ভবিষ্যৎ সেই দিকেই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

তা যদি না হবে, কোথাকার কোন্ নিশানাথ লাহিড়ী, মেডিক্যাল কলেজের দরজা পেরোতেই যে হিমশিম খেয়ে মরছিল, দুশ টাকা মাইনের একটা চাকরি পেলেই যে বর্তে যেত, তার জীবনে কোথা থেকে কেমন করে দেখা দিল এই স্বপ্নাতীত সুযোগ ও সাফল্যের ধারাবর্ষণ? এই অব্যাহত অগ্রগতির পিছনে নিশ্চয়ই কোনো অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে; কোনো অলক্ষ্য বিধান, যা তাকে মেনে চলতেই

হবে। এই তার ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায়।

মানুষের অন্তরে 'অ্যাম্বিশন' নামক পদার্থটি ('উচ্চাকাঙ্ক্ষা' বলা যেত কিন্তু ইংরেজির তুলনায় শব্দটি বড় নিষ্প্রভ) অগ্নিশিখার মত ঊর্ধ্বগতি। একবার জ্বলে উঠলে নিজের শক্তিতেই বেড়ে চলে এবং চলতে চলতে পথের দুধারে যা কিছু পায়,—চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিবেচনা, দ্বিধা-সংস্কারের বাধা-বন্ধন—সব জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। নিশানাথের মনের মধ্যে যখন সেই প্রক্রিয়া চলছিল, রাজাবাহাদুর তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইন্ধন যোগ করলেন। বললেন, এটা যে সাধারণ লোকের কাজ নয়, তা আমি জানি। তাদের কাছে এর নৈতিক আর আইনের দিকটাই বড় হয়ে দেখা দেবে। তার বাইরে তাদের দৃষ্টি পৌঁছায় না। কিন্তু আমি তো তেমন কারো কাছে আসি নি। যার কাছে এসেছি, সে সাধারণ স্তরের অনেক ওপরে এবং তার চেয়ে বড় কথা, সে বৈজ্ঞানিক। আমার এই সঙ্কল্পকে সে বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, সে বিশ্বাস আছে বলেই সবকিছু তাকে বলতে পেরেছি। তা না হলে এ-সব তো কাউকে বলবার নয়।

কোনো রকম দ্বিধা যদি লাহিড়ীর মনে তখনো থেকে থাকে, এর পরে আর তার লেশমাত্র রইল না। উত্তুঙ্গ উচ্চাশার কাছে হার হলো শুভবুদ্ধির।

দু-সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিমাঞ্চলের সেই বিশেষ শহরের উদ্দেশে রওনা হলো নিশানাথ লাহিড়ী। ভারতবর্ষের মধ্যে ওখানকার "—" ইন্‌স্টিটিউটই তখন একমাত্র গবেষণাগার যেখানে প্লেগের বীজাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ এবং কৃতী গবেষক সেখানে কাজ করছিলেন। অত্যন্ত জোরালো এবং বিশেষ বিশেষ সুপারিশ ছাড়া ডিরেক্টর কাউকে গ্রহণ করতেন না। সেই গোপন গণ্ডির মধ্যে তার প্রিয়তম ছাত্রের জন্যে একটি স্থান সংগ্রহ করা ডাক্তার মুস্তফির মত ভারত-বিখ্যাত চিকিৎসাবিদের পক্ষেও সহজ হয় নি। বহু চেষ্টার ফলেই শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়েছিল। নিশানাথের প্রতিভার উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল এবং সেটা যে অপাত্রে ন্যস্ত

হয় নি, তার প্রমাণ কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। ডিরেক্টরকে খুশী করতে লাহিড়ীর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

রাজাবাহাদুরের পিতার যখন মৃত্যু হয়, ছোটকুমার তখন শিশু। তার কয়েক বছর পরে রাণীমাও স্বামীর অনুসরণ করলেন। প্রাচীন রাজবংশের ঐতিহ্য অনুসারে রাজাবাহাদুর তার কিছুদিন আগে একটি সুন্দরী কিশোরীর পাণিগ্রহণ করেছেন। বধূ নির্বাচন রাণীমাই করেছিলেন। তেমন কোনো বড় ঘরের মেয়ে নয়। একমাত্র রূপের জোরেই এখানে তার প্রবেশাধিকার। রূপের সঙ্গে ঐশ্বর্যের মিলন ঘটলে তার মধ্যে যে উগ্র জলুস বা তীব্র চমক ফুটে ওঠে, এ মেয়েটির তা ছিল না। তার শান্ত মুখশ্রী, স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামকান্তি এবং বিনম্র পেলব দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে একটি মধুর কমনীয়তা ছিল। সম্ভবত সেইটিই রাণীমাকে আকৃষ্ট করে থাকবে। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আত্মীয় পরিজন আশ্রিত, অমাত্য, কারোই বিশেষ সমর্থন পান নি। নববধূ প্রাসাদে পা দিয়েই সেটা জানতে পেরেছিল। স্বামীর কাছ থেকে বাক্যে বা আচরণে বিশেষ কোনো রূঢ়তা বা অনাদর না পেলেও, তিনিও যে ঐ দলভুক্ত একথাও তার বুঝতে বাকী ছিল না। তার ফলে তার মনে প্রথম থেকেই কেমন একটা অপরাধী-সুলভ সঙ্কোচ গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন ঘর করবার পরেও সে মনোভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে একটা অলক্ষ্য দূরত্ব বরাবর রয়ে গেছে।

ছোটকুমারের প্রকৃতি ছিল তার জ্যেষ্ঠের ঠিক বিপরীত। ঐশ্বর্য-লিপ্সা কিংবা আভিজাত্য-গৌরব তাকে কোনদিন আকর্ষণ করে নি। রাজপ্রাসাদের বিলাস-বহুল জীবনযাত্রার অসংখ্য প্রলোভন থেকে নিজের মনটাকে মুক্ত রাখবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা বিধাতা তাকে বোধহয় মাতৃগর্ভ থেকেই দিয়েছিলেন। শিশুকাল থেকে সেখানকার সব কিছুর উপর তার নীরব ঔদাসীন্য ভৃত্যমহলেও আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নববধূ এসে যখন দেখল, এত বড়

প্রাসাদের কোনো মহলে তার জন্যে সস্নেহ অভ্যর্থনার প্রসন্নদৃষ্টি নিয়ে কেউ অপেক্ষা করে নেই, তখন সকলের চেয়ে আলাদা এই কিশোর দেওরটির প্রতিই একটি অলক্ষ্য আকর্ষণ অনুভব করে থাকবে। সে নিজেও তখন কিশোরী। কৈশোরের স্বাভাবিক ধর্মও তাদের নিকটতর করবার সুযোগ দিয়েছে। কালক্রমে বৌরাণী এবং ছোটকুমারের মধ্যে যে প্রগাঢ় সখ্যবন্ধন গড়ে উঠেছিল, এইখানেই তার সূত্রপাত।

রাণীমার মৃত্যুর পর সে বন্ধন দৃঢ়তর হলো। বৌরাণী তাঁর এই আত্মভোলা, উদাসীন দেওরটির মাতৃস্থানও অধিকার করলেন। বন্ধুত্ব ও মাতৃত্বের সে এক বিচিত্র সংযোগ। কিন্তু তার মিলিত শক্তিও এই সৃষ্টিছাড়া মানুষটিকে বেঁধে রাখতে পারল না। স্নেহ, প্রীতি, ঐশ্বর্য, বংশমর্যাদা—সব বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করে ছোটকুমার যেদিন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এল, কিছুতেই তাকে নিরস্ত করা গেল না, বৌরাণী সেদিন একটি কথা বলেন নি, একফোঁটা চোখের জলও তাঁকে কেউ ফেলতে দেখে নি। আত্মীয়-পরিজনেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। ভৃত্য ও আশ্রিতমহলে কানাকানি পড়ে গিয়েছিল—দেওরের ওপর কত যে দরদ, এইবার সব বোঝা গেছে। কেউ বলেছিল—সব কিছু যে লিখে পড়ে দিয়ে গেল ছেলেটা। আজ তো ওর সুখের দিন, কাঁদতে যাবে কোন্ দুঃখে ?

সেইদিন থেকে বৌরাণীর মুখে ছোটকুমারের কোনো উল্লেখ একবারও শোনা যায় নি। যেন কিছুই হয় নি, এমনিভাবে সব কিছুর মধ্যে নিজেকে তিনি আরো নিবিড়-ভাবে নিবিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আগে মাঝে মাঝে বাইরে যেতেন। . তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু কাজ আর কাজ, বিশ্রামহীন নিরলস ব্যস্ততা। যে দেখেছে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। শুধু রাজাবাহাদুর বুঝেছিলেন, এ কর্মশক্তি সবটাই যান্ত্রিক, ভিতরে কোনো প্রাণের প্রেরণা নেই। একজনের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তার সবটাই বোধহয় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এর অনেকদিন পরে ভাই-এর কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, লোকে জানে, আমাকে সে তার সর্বস্ব দিয়ে গেছে। কি নিয়ে গেছে, সে খবর কেউ রাখে না। সে কথা শুধু আমিই জানি।

সেই যে একদিন পিতৃ-পিতামহের প্রাসাদতোরণ পিছনে ফেলে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেছিল, তারপর আর একদিনের তরেও ছোট-কুমার সে দিকে ফিরে তাকায় নি। ডাক এসেছে অনেকবার। প্রতিবারেই মৃদু হেসে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজাবাহাদুর এসেছেন। এ গলিতে তাঁর গাড়ি ঢোকে না। বড় রাস্তার মোড় থেকে গলিপথটুকু হেঁটে পার হয়ে, অতিকষ্টে সরু সিঁড়ি বেয়ে, কোনো রকমে উঠেছেন এসে দোতলার অপ্রশস্ত বসবার ঘরে। অনুযোগ দিয়েছেন, অভিমান প্রকাশ করেছেন, কখনো সস্নেহ আবেদন জানিয়ে দুদিনের জন্যে একবারটি ঘুরে আসবার অনুরোধ করেছেন। একটি কুণ্ঠাপুর্ণ বিনীত হাসি ছাড়া আর কোনো উত্তর পান নি। কখনো বৌরাণীর নাম করে বলেছেন, তোকে একবার দেখতে চেয়েছে। বলেছে, যেমন করে পার, ধরে নিয়ে এসো।

এবার জবাব দিয়েছে ছোটকুমার—তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবেন, সময় হবে না।

—কি রাজকাজে ব্যস্ত আছ যে সময় হবে না?—তেড়ে উঠেছেন রাজাবাহাদুর। এ-প্রশ্নের আর উত্তর আসে নি।

প্রথমদিকে তাঁর আসাটা ছিল ঘন ঘন। ভাইকে বাড়ি নিতে পারুন আর না পারুন, একবার করে দেখে গেছেন। ক্রমশঃ তার ব্যবধান বেড়ে গেছে। ইদানীং কয়েক বছর তাঁর দেখা পাওয়া যায় নি। ম্যানেজার বা অন্য কোনো আমলা পাঠিয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তারপর সেটাও বিরল হয়ে এসেছে।

অনেকদিন পরে সকালের দিকে ছোটকুমারের বাড়ির সামনে মোটর থামবার শব্দ শোনা গেল। তার কাছে যারা আসে, (বড় একটা কেউ আসে না) কারো গাড়ি নেই। গঙ্গাচরণের কৌতূহল হলো। বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে একপলক তাকিয়েই ছুটে গেল

মনিবের কাছে। ছোটকুমার তখন পড়বার ঘরে। গঙ্গাকে ব্যস্ত-ভাবে ঢুকতে দেখে চোখ তুলতেই সে ফিসফিস করে বলল, রাজা-বাহাদুর! বলেই নীচে নেমে গেল দরজা খুলতে।

এত ছোট গাড়িতে রাজাবাহাদুরকে কখনো চড়তে দেখা যায় নি। বেশ কষ্ট হচ্ছিল নামতে। ড্রাইভারের সঙ্গে গঙ্গাচরণকেও এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করতে হলো। আগের চেয়ে অনেকটা কাহিলও হয়ে পড়েছেন। কুমার আছে কিনা জেনে নিয়ে গঙ্গার কাঁধে হাত দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন।···

বারান্দায় পড়তেই ছোটকুমার অগ্রজের বাহু ধরে বসবার ঘরের দিকে নিয়ে চলল। যেতে যেতে অনুযোগের সুরে বলল, এতটা শরীর খারাপ, একটা খবরও তো দেন নি?

—কাকে খবর দেবো? তোমাকে? ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন রাজাবাহাদুর, কি লাভ হতো?

ছোটকুমার যেমন মাথা নীচু করে চলছিল, তেমনিভাবেই চুপ করে রইল।

রাজাবাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলে নিলেন। ঘরে ঢুকে সামনে যে কৌচটা পেলেন, তার উপর বসে পড়ে প্রসন্নমুখে বললেন, খুব রোগা হয়ে গেছি, না? ওটা কিছু না। শরীর আমার ভালোই আছে। খানিকটা চর্বি ঝরে গিয়ে বরং উপকারই হয়েছে।··কিন্তু—কয়েক সেকেণ্ড থেমে ভাইয়ের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে যোগ করলেন, তোকে তো তেমন ভালো দেখছি না। রাত জেগে খুউ-ব পড়াশুনে হচ্ছে? দেখবার তো কেউ নেই। আ—চ্ছা, আমিও পরোয়ানা নিয়ে এসেছি।

পকেট থেকে একখানা খাম বের করে হাত বাড়িয়ে বললেন, এই নাও।

—কি ওটা?

—পড়েই ছাখ।

ছোটকুমার খামটা খুলে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়েই শুষ্ক

মুখে বলল, কি হয়েছে বৌরাণীর?

—কি করে জানবো? মুখ ফুটে কিছু বললে তো? দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে সেই এক কথা—কিছু হয় নি আমার। কত করে বললাম, একবার কোলকাতায় চল। মুস্তফির মত অতবড় ডাক্তার রয়েছে হাতের মধ্যে। দরকার হলে আরো বড় কাউকে দেখানো যেতে পারে। কিছুতেই রাজী হলো না। কাল যখন কোলকাতায় ফিরছিলাম, ঐ চিঠিখানা দিয়ে বলল, ঠাকুরপোকে দিও; আর একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, ট্রেনের সময় হয়ে এল। যা, জামা-কাপড়টা বদলে আয়। গঙ্গা···

গঙ্গাচরণ পাশের কোন ঘর থেকে সাড়া দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে জোড়হাত করে দাঁড়াল। রাজাবাহাদুর হুকুম দিলেন, একটা স্যুটকেসে 'ছোটো'র জিনিস-পত্তরগুলো গুছিয়ে দে। দেরি করিস নে।

ছোটভাইকে নাম ধরে বড় একটা ডাকতেন না। অন্যের কাছে উল্লেখ করবার বেলায় বলতেন, ছোটকুমার; ডাকবার সময় তাকেই একটা সাদর ও সংক্ষিপ্তরূপ দিয়েছিলেন—'ছোটো'।

ছোটকুমার চিঠিখানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, আজ তো আমার যাওয়া হবে না।

—কেন?

—একটা বিশেষ কাজ আছে।

—কি কাজ?

—যাঁর কাছে ফ্রেঞ্চ শিখি, তাঁর আজ আসবার দিন। সন্ধ্যে-বেলায় আসবেন।

—কি শিখিস?

—ফ্রেঞ্চ; ফরাসীভাষা।

—তা দিয়ে কি হবে?

কুমার মৃদু হেসে চুপ করে রইল। রাজাবাহাদুর বললেন, যতসব উদ্ভট খেয়াল! কোন্ দেশের লোক তিনি?

—ইংরেজ।

—বেশ তো, একটা চিঠি লিখে রাখ—বিশেষ জরুরী কাজে বাড়ি যাচ্ছি। উনি এলে গঙ্গা সেটা দিয়ে দেবে।

—তা হয় না। আমি বরং কাল যাবো। আপনাকে আর আসতে হবে না।

—যাবে তো?

কুমার একটু হাসল।

রাজাবাহাদুর উঠে পড়ে বললেন, দেখো। তা না হলে আমাকে আবার ছুটতে হবে। ন'টা পঁচিশে ট্রেন। আমিও যাচ্ছি। টিকিট করে রাখবো। তাহলেও অন্তত মিনিট পনর সময় হাতে রেখে যেও। ঠিক আটটায় এখানে গাড়ি আসবে।

—গাড়ি লাগবে না।

—কেন? অস্টিন্‌টা বেশ আসতে পারবে। আমি তো তাতে করেই এলাম।

ছোটকুমার মাথা নেড়ে বলল, দরকার নেই। এখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবো।

নিজের অজ্ঞাতসারেই রাজাবাহাদুরের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। রাজপরিবারের কেউ কোনোদিন ট্যাক্সিতে ওঠে না। তবু এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করলেন না। বুঝলেন, এ 'না' কে 'হ্যাঁ' করানো যাবে না।

রাজাবাহাদুরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ছোটকুমার ধীরে ধীরে সিঁড়ি ক'টা পেরিয়ে তার লাইব্রেরীর কামরায় ফিরে গেল। কিছুক্ষণ আগে যে বইখানা পড়ছিল এবং খোলা রেখেই পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল, সেটা তেমনি পড়ে রইল। পড়বার টেবিলে আর ফিরে যাওয়া হল না। কোণের দিকে একটা ইজিচেয়ার ছিল। তারই কোলে নিজেকে এলিয়ে দিল। মিনিট কয়েক পরে জামার পকেট থেকে বেরিয়ে এল একখানা ধার ছেঁড়া খাম, যার ভিতরকার বস্তুটির সঙ্গে এইমাত্র তার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে গেছে। তবু সেই ছোট্ট

কাগজখানাই ভাঁজ খুলে আরেকবার তুলে ধরল চোখের উপর।

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কয়েকটি মাত্র লাইন—

কল্যাণীয়েষু

ঠাকুরপো,

কিছুদিন যাবৎ আমার শরীরটা বিশেষ ভালো যাইতেছে না। তোমাকে একবারটি দেখিতে ইচ্ছা করে। যত শীঘ্র হয়, অবশ্য অবশ্য আসিও। ইতি—

আশীর্বাদিকা

তোমাদের বৌরাণী

আনমনে ধীরে ধীরে চিঠিখানা আবার ভাঁজ করে মুঠোর মধ্যে রেখে তেমনি অসাড়ের মত অনেকক্ষণ পড়ে রইল ছোটকুমার। বৌরাণীর চিঠি! বৌরাণী তাকে ডাকছে! কত বছর পরে! কিন্তু এ কথা ক'টির মধ্যে তাকে যেন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। 'ঠাকুরপো' সম্বোধনটি কানে বড় নতুন ঠেকছে। এ বাড়িতে আসবার পর প্রথম প্রথম কয়েকদিন মাত্র ঐ নামে তাকে ডাকতে শুনেছিল। তারপর আর শোনে নি। হঠাৎ একদিন দাদার মত 'ছোটো' বলতে শুরু করল। তারপর কবে, কেমন করে মধুরতর রূপান্তর লাভ করে সেই ডাক ক্রমশঃ 'ছোটু'তে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আজ আর মনে করতে পারে না। কেমন একটা আশ্চর্য তার ছিল সেই মিষ্টি কণ্ঠের এই ছোট্ট কথাটুকুর মধ্যে। আজও দুকান ভরে আছে। চিঠি যদি এল, তার উপরে ঐ সম্ভাষণটুকু জুড়ে দিলে কি ক্ষতি হতো? একবার মনে হল, ঐ দুটি অক্ষরের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক একদিন জড়িয়ে ছিল, আজ তার অবসান ঘটেছে বলেই ওদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। হয়তো ইঙ্গিতে সেই কথাটিই বলতে চেয়েছে বৌরাণী।

তাই যদি হয়, তবে আর গিয়ে কি লাভ? যেখানে যা কিছু বন্ধন, সবই তো একদিন নিজে হাতে ছিন্ন করে চলে এসেছিল। ঐ একটি জায়গায় শুধু পারে নি। একটা অলক্ষ্য সূত্র রয়ে গেছে। ক্ষীণ

হলেও তার ধার বড় তীক্ষ্ণ। অগোচরে থেকেও নিজের বেদনাময় অস্তিত্ব কোনোদিন ভুলতে দেয় নি। আজ যদি তার একটা দিক কালক্রমে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিলীন হয়ে গিয়ে থাকে আর একদিক থেকে সেই ছিন্নসূত্রে জোড়া দিতে যাওয়া নিরর্থক।

সহসা আবার হাতের চিঠিখানার দিকে নজর পড়তেই ছোট-কুমারের সমস্ত চিন্তাস্রোত ঐ একটি ধারায় গিয়ে মিলিত হলো। সমস্ত ক্ষোভ অভিমান ছাপিয়ে উঠল একটিমাত্র দুর্ভাবনা—কি অসুখ বৌরাণীর? কি জানি কেমন আছে?

অকস্মাৎ কে যেন তাকে সজোরে ঠেলে তুলে দিল। কাল ন'টা পঁচিশে গাড়ি। তার আগে অনেকগুলো কাজ সেরে নিতে হবে।

যে-ভাষায়, যেমন করেই আসুক, বৌরাণীর রোগশয্যার ডাক তার কাছে অলঙ্ঘ্য—এই পরম সত্যটাই সবকিছু ছাপিয়ে ছোট-কুমারের অন্তরের মধ্যে প্রতিভাসিত হলো।

ন'টা পঁচিশের গাড়িটা দূরপাল্লার যাত্রী। বরাবরই বেশ ভিড় থাকে। তা'ছাড়া, তার মিনিট দশেক আগে ঠিক পাশেই একখানা ডাউন লোক্যাল এসে দাঁড়ায় এবং তার গহ্বর থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসে একপাল ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ডেলিপ্যাসেঞ্জার। এই দুটো বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতে মাঝখানের প্লাটফরমে যে, ঘূর্ণাবর্ত দেখা দেয়, তার ভিতর থেকে নিজের দেহটাকে উদ্ধার করে গাড়ির কামরায় পৌঁছে দেওয়া শক্তির প্রয়োজন।

ছোটকুমার যখন সেই সুকঠিন শক্তিপরীক্ষায় নাজেহাল হবার উপক্রম, হঠাৎ মনে হলো, কে যেন তার পিছন থেকে ঘাড়ের ঠিক নীচে একটা সূচ ফুটিয়ে দিলে। 'উঃ' বলে তৎক্ষণাৎ ফিরে তাকাল, কিন্তু সেই জনারণ্যের ভিতরে এমন কোনো লোক চোখে পড়ল না, যাকে এই বিশেষ কর্মটির সঙ্গে জড়িত করা যেতে পারে। ব্যাপারটাকে মনে মনে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। কার এমন কি গরজ পড়ল খামকা তার গায়ে সূচ ফোটাবার? পিন্‌-জাতীয় কিছু একটা কারো

হাতে থেকে থাকবে হয়তো। ভিড়ের ধাক্কায় হঠাৎ লেগে গেছে।

আহত স্থানটায় তখন রীতিমত জ্বালা করছে। গাড়িতে উঠে দেখতে হবে, কি ব্যাপার, এই কথা ভেবে সেই দিকেই পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় চোখে পড়ল, গঙ্গাচরণ ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। চোখে মুখে ব্যস্ততার চিহ্ন। তাকে দেখে কুমারের মুখেও চিন্তার ছায়া পড়ল। গঙ্গার তো তার সঙ্গে যাবার কথা নয়। কাছে আসতেই জানতে চাইল, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

গঙ্গাচরণ একখানা খাম এগিয়ে ধরে চাপাগলায় বলল, বিধু এসে দিয়ে গেল। বৌরাণীর চিঠি। বলল, খুব জরুরী খবর আছে এর মধ্যে। আর বলেছে, এ চিঠির কথা রাজাবাহাদুর যেন জানতে না পারে।

ভিড়ের মুখ থেকে একটুখানি সরে গিয়ে তাড়াতাড়ি খামের ধারটা ছিঁড়ে ফেলল ছোটকুমার। আগের মত এ চিঠিখানাও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সুর একেবারে আলাদা।

ভাই ছোট্টু,

এর আগে যে-চিঠিটা পেয়েছ, তার অক্ষরগুলো আমার, কিন্তু কথা আমার নয়। তবু লিখতে হয়েছিল। কেন, তা জিজ্ঞেস করো না। সে চিঠিতে তোমাকে আসতে বলেছিলাম। এবার বলছি, এসো না। বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কতকাল তোমাকে দেখি নি! তবু বলছি, আমার মাথা খাও, তুমি এসো না।

ইতি সু—।

বৌরাণীর নাম সুষমা। তারই আদ্যক্ষর সু।

সমস্ত চিঠিখানার মধ্যে যে শঙ্কা ও সংশয় ঘেরা গূঢ়রহস্য জড়িয়ে আছে, এই ছোট্ট অক্ষরটিও যেন তার থেকে মুক্ত নয়। ছোটকুমার বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চিঠিটা মুড়ে যখন খামে ভারতে যাবে, গঙ্গাচরণ চেঁচিয়ে উঠল, এ কি! তোমার জামার পিঠে রক্ত কিসের! লোকটা কি তাহলে কিছু একটা ফুটিয়ে দিয়ে গেল ?

—কোন্ লোকটা! চমকে উঠল ছোটকুমার।

—ঢ্যাঙা, কালো মতন একটা লোক। যা ভিড়, পাছে হারিয়ে ফেলি, তাই ঐখান থেকে আমি ঠায় তোমার দিকে নজর রেখেছি। মনে হলো, সেই লোকটা যেন ডান হাতটা তুলে তোমার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল। তারপর আর দেখতে পেলাম না।

কুমার কি একটা বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। ঠিক পিছনেই রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বর—কি হলো। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? এখনি যে গাড়ি ছেড়ে দেবে।

—আপনি উঠে পড়ুন। আমি যাই।

—কোথায় যাবি?

—বাসায়।

—কেন?

গঙ্গাচরণ বলে উঠল, এইমাত্তর কে একটা লোক ওর পিঠে কি যেন ফুটিয়ে দিয়ে গেল। রক্ত বেরুচ্ছে।

রাজাবাহাদুর চিন্তিত মুখে উদ্বেগের সুরে বললেন, সে কি! কই দেখি।

জামার পিছনটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে বললেন, তুই দেখেছিস লোকটাকে?

—আজ্ঞে, ঠিক ঠাহর করে দেখি নি। দূর থেকে মনে হলো যেন—

—মনে হলো! গাঁজার দমটা বোধহয় একটু বেশি হয়ে গেছে। কুমারের দিকে ফিরে বললেন, ও কিছু না। পোকায় টোকায় কামড়েছে মনে হচ্ছে। গাড়িতে চল। জামাটা খুললেই বোঝা যাবে, কি হয়েছে। আমার ব্যাগে আইডিন আছে। লাগিয়ে দিলেই সেরে যাবে। ঐ, লাস্ট্ বেল পড়ে গেল। আর মোটে পাঁচ মিনিট আছে গাড়ি ছাড়তে।

—আজ আর ইচ্ছে করছে না। আরেক দিন যাবো।

—তোরও কি গঙ্গার ঐ গাঁজাখুরি গল্প শুনে মন খারাপ হয়ে গেল?

—না, তা নয়। শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছে না।

—'তাই নাকি ?' সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলে গেল রাজাবাহাদুরের, 'তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই। সোজা ভবানীপুরের বাড়িতে চল। ওখানে তো এক গঙ্গা-ভরসা।'

—এখন থাক ; পরে, যদি দরকার হয় যাবো।

বলেই ছোটকুমার ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। রাজাবাহাদুর পিছন থেকে বললেন, আমিও তা'হলে থেকে গেলাম। কেমন থাকিস, কাল সকালেই যেন একটা খবর পাই। দরকার হলে ডাক্তার মুস্তফিকে একবার দেখিয়ে দেওয়া যাবে।

সেদিন যদি মুস্তফিসাহেবের দেখা পাওয়া যেত, ঘটনার গতি চলে যেত অন্য পথে। এ কাহিনীর পরিণতি শুধু ভিন্ন নয়, নিকটতর হতো। ব্যস্ত পাঠকদের অনেকখানি সময় বাঁচত। এইখানে একখানা ট্রামের টিকেট কিংবা ছেঁড়া হাণ্ড্‌বিল গুঁজে দিয়ে আর একটা 'সিটিং'-এর জন্যে অপেক্ষা করতে হতো না। গোটা কয়েক পাতা কোনো রকমে এগিয়ে গিয়ে এ ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে ফেলে অন্য বই ধরতে পারতেন। সংসারের নানা কর্মে রত যেসব ক্লান্ত পাঠিকা গল্প উপন্যাসকে নিদ্রাকর্ষণের টনিক হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, তাঁদেরও এই পর্যন্ত এসে পাতা মুড়ে রেখে পাশ ফিরে শোবার দরকার হতো না। ঘনায়মান তন্দ্রার দোলায় দুলতে দুলতেই যবনিকায় পৌঁছে যেতেন।

কিন্তু অলক্ষ্যে বসে যে বিশ্ববিধান-রচয়িতা বুদ্ধিগর্বিত মানুষের বহু-যত্ন-রচিত পরিকল্পনা একটিমাত্র অঙ্গুলিহেলনে ওলট-পালট করে দেন, তাঁর অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। তাই ডাক্তার মুস্তফিকে পাওয়া গেল না।

রাজাবাহাদুর মনে মনে তাঁর প্রত্যাশিত ঘটনাগুলোকে পর পর সাজিয়ে রেখেছিলেন, এবং কার কোথায় কখন কি প্রয়োজন হবে, সব সেই অনুসারে স্থির করা ছিল। স্ত্রীকে চাপ দিয়ে চিঠি লেখানো, সেখানা হাতে করে ছোট গাড়ি নিয়ে একটা বিশেষ সময়ে ভাইএর

বাসায় গিয়ে ওঠা, নানা অভিনয়ের জাল ফেলে তখনই তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা, সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে অন্য দিন-নির্বাচন, তার সঙ্গে একটি বিশেষ ট্রেনের সাহায্য গ্রহণ—সবই তাঁর পূর্বপরিকল্পিত। তার মধ্যে ঐ ন'টা পঁচিশের গাড়ির ভূমিকাও কিছুমাত্র অপ্রধান ছিল না। ঐ রকম ভিড়ের আড়াল না পেলে যত পাকা হাতই হোক এবং যত কম সময়ই লাগুক, সকলের অগোচরে ইনজেক্‌শন্‌ পর্বটার নির্বিঘ্ন ও সফল সমাধান সম্ভব হতো না।

এ পর্যন্ত সবই পূর্ব-প্রস্তুত নির্ঘণ্ট অনুসারে ঠিকমত চলেছিল। গোল বাধল এর পরের দফায়। গাড়িতে উঠবার পূর্বমুহূর্তে ছোটকুমার বেঁকে বসল—সে যাবে না। হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের ভিতর কিসের না কিসের সামান্য একটা খোঁচা—সেই তুচ্ছ জিনিসটা যে ওর কাছে এত বড় হয়ে উঠবে, বৌরাণীর রোগশয্যার আহ্বান পর্যন্ত তার কাছে হার মানবে, এই আশ্চর্য ঘটনা রাজাবাহাদুরের হিসাবের মধ্যে ছিল না। এর জন্যে দায়ী ঐ 'গঙ্গা-আপদটা'। কে ভেবেছিল যে ঠিক ঐ মুহূর্তে ঐখানটিতে তার আবির্ভব ঘটবে এবং তারই কথায় কুমার দাদা ও বৌরাণীর সব উপরোধ উপেক্ষা করে ফিরে যাবে। তাও যদি তাকে ভবানীপুরের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো, কার্যসূচীর সামান্য পরিবর্তন ঘটলেও শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার আটকে থাকত না। কিন্তু সেখানেও রাজাবাহাদুর ব্যর্থ হলেন। সেই ব্যর্থতার জ্বালা ক্ষণিকের তরে হয়তো তাঁর চোখের তারায় ফুটে উঠে থাকবে। গঙ্গার নজর পড়তেই সে চমকে উঠল। কিন্তু সে বেচারা তখনো জানে না, সে নিজেই এই রাজ-রোষের লক্ষ্যস্থল এবং অদূর ভবিষ্যতে নিজের জীবন দিয়ে তাকে তার অসতর্ক হঠকারিতার মূল্য দিতে হবে।

হতভাগ্য গঙ্গাচরণ। সে যে নিমিত্তমাত্র, যে বস্তুটি তার মনিবকে শেষ মুহূর্তে স্টেশন থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, তার নির্দোষ বাহক, এই সত্যটি যদি রাজাবাহাদুর জানতে পারতেন, হয়তো তাকে অকালে অজ্ঞাত আতায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হতো না। জানতে তিনি

পেরেছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঘটনাস্রোতের গতিপথও তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

সে চিঠি যিনি লিখেছিলেন, তিনিও ভাবতে পারেন নি, গভীর উৎকণ্ঠায় ভরা ঐ সামান্য ক'টি ছত্র একদিন তাঁর সমগ্র শ্বশুরকুলের ইতিহাস রচনা করবে। স্বামীর মনোরাজ্যে বৌরাণীর প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁর গতিবিধির কোনো খবরও তিনি রাখতেন না। তাকে দিয়ে এর আগের চিঠিখানা লেখাবার জন্যে রাজাবাহাদুর কেন যে অত পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কি ছিল তাঁর মনে, তার কোনো আভাসও তিনি পান নি। শুধু মনে হয়েছিল, একটা কিসের কালো ছায়া যেন ঘনিয়ে আসছে। একটা কোনো অকল্যাণের ইঙ্গিত, যার লক্ষ্যস্থল তার পরম স্নেহ ও প্রীতিভাজন ছোটকুমার। এমনি একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা তাকে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল করে তুলেছিল। ভেবেছিলেন, যেমন করে হোক তাকে নিরস্ত করতে হবে।

কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে গোপনে বিশ্বস্ত ভৃত্যের হাত দিয়ে চিঠিখানা তার আকৈশোর সখা সোদরোপম দেবরের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেটা সিদ্ধ হয় নি। তাকে তিনি বাঁচাতে পারেন নি। তবু কুমারের কাছে ঐ কথা কটিই ছিল তার শেষ দুটি দিনের মহামূল্য সম্পদ।

তার মৃত্যুর পরে খোলা খামখানি তার বালিশের তলায় পাওয়া গিয়েছিল। সকলের অলক্ষ্যে রাজাবাহাদুর সেটি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনিও এর জন্যে কিছুমাত্র কম মূল্য দেন নি। সেকথা যথাস্থানে প্রকাশ করবো।

স্টেশন থেকে রাজাবাহাদুর সোজা গিয়ে উঠলেন ডাক্তার মুস্তফির বাড়িতে। তাঁকে পাওয়া গেল না। ছুটলেন মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেও নেই। আবার তাঁর বাড়ি ফিরে এসে শুনলেন, তিনি বর্ধমানে রোগী দেখতে গেছেন। ফিরতে রাত হবে কিংবা পরদিন সকালেও আসতে পারেন। রাজাবাহাদুরের মুখে বিরক্তির

কুঞ্চন দেখা দিল। তার লক্ষ্য বোধহয় তিনি নিজেই। তাঁর কার্যসূচীতে ডাক্তারের স্থান রয়েছে তারও পরের দিন। টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র তাঁদের 'দেশে'র বাড়িতে রওনা হবার কথা। ততক্ষণে ছোটকুমারের দেহে ইন্‌জেকশনের ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। তারপর যা করণীয়, মুস্তফিই তার ভার নেবেন। এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই মুহূর্তেই তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

রাজাবাহাদুরের আর ভবানীপুরে ফেরা হলো না। ভাগ্যক্রমে বর্ধমানের রোগীর ঠিকানা মুস্তফির বাড়িতেই পাওয়া গেল। সেটি সংগ্রহ করে ওখান থেকেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড-এ গিয়ে পড়লেন। কিন্তু ভাগ্যের আনুকূল্য শেষ পর্যন্ত পেলেন না। গন্তব্যস্থলে গিয়ে শুনলেন রোগীটি মারা গেছে, সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ডাক্তার কলকাতায় রওনা হয়ে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ফেরালেন রাজাবাহাদুর। এতক্ষণে মনটা একটু প্রসন্ন হলো। এই মৃত্যুটা বোধহয় শুভলক্ষণ। এর মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

ছোটকুমার যখন ট্যাক্সি করে বাসায় ফিরছিলেন, একটি চিন্তাই তাঁর সমস্ত মন অধিকার করে রইল—গুরুতর কারণ না থাকলে বৌরাণী তাকে এমন করে নিষেধ করত না। কিন্তু কী সেই কারণ? নিশ্চয়ই তার কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে বৌরাণী। কিসের বিপদ? সে তো কারো কোনো ক্ষতি করে নি। তার বিরুদ্ধে কার কি অভিযোগ থাকতে পারে, কুমার কিছুতেই ভেবে পেল না। তাবু এই চিঠির পর আর তার কোনোমতেই যাওয়া চলে না। বৌরাণী তাকে যেতে বলে নি, বলেছে, তুমি এসো না। তবু তার এই সুস্পষ্ট 'না'-এর ভিতর থেকে একটি ব্যাকুল অন্তরের স্নেহনির্ঝর ঝরে ঝরে পড়ছে। তাতেই সে অভিভূত হয়ে রইল।

বাসায় ফিরবার কিছুক্ষণ পরেই কুমার বুঝল তার জ্বর এসেছে। কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ল। গঙ্গা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বারবার এসে বলতে লাগল, একজন ডাক্তার ডেকে আনি। তোমার সেই যে

বন্ধুটি আসে, তাকেই না হয় খবর দিই।

কুমার নিষেধ করল, এখন থাক; দরকার হলে পরে ডাকা যাবে।

বিকেলের দিকে জ্বর খুব বেড়ে গেল। গঙ্গা আর ওকে জিজ্ঞাসা করল না। শিয়ালদর কাছে ওর ডাক্তার-বন্ধু অমলবাবুর বাসা তার জানা ছিল। তাকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এল। কুমার তখন ভুল বকছে।

রোগীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তার দেহের কয়েকটি বিশেষ জায়গায় এক ধরণের স্ফীতি লক্ষ্য করে অমল সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। তারা যতদূর জানা, ওটা প্লেগের লক্ষণ। কিন্তু প্লেগ আসবে কোত্থেকে? হয়তো অন্য কারণে ফুলে থাকবে। যাই হোক, রক্তটা দেখা দরকার। তার এক সতীর্থ ছিল প্যাথলজিস্ট। তার কাছে ছুটে গেল। সে এসে তখনই স্লাইড্ নিয়ে গেল এবং মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলে চমকে উঠল। সত্যিই প্লেগের বীজাণু দেখা যাচ্ছে। দুজনেই টাটকা পাস করা অনভিজ্ঞ চিকিৎসক। নিজেদের বিদ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে, পরদিন সকালেই আরে কয়েকটা স্লাইড্ নিয়ে দিয়ে এল মেডিক্যাল কলেজে। এবং রিপোর্টের জন্যে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। রোগীর কাছে করবার বিশেষ কিছু ছিল না। চিকিৎসার গতি-প্রকৃতি, এমন কি আরোগ্যও নির্ভর করছিল রোগ নির্ণয়ের উপর।

ওখানকার যিনি বিশেষজ্ঞ, কোনো কারণে তিনি তখন অনুপস্থিত। অনেক দেরিতে ফিরলেন। আরো বহু কেস্ ছিল। তাতেও খানিকটা দেরি হলো। তারপর লালফিতার বেড়া পার হয়ে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কাগজখানি যখন অমল এবং তার বন্ধুর হাতে এসে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হতে আর বাকী নেই। রিপোর্টে নিজেদের মতের সমর্থন দেখে তখনই ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল কুমারের বাসায়। গিয়ে দেখল, কেউ নেই, শূন্য খাটখানা খাঁ খাঁ করছে।

পাশের ঘর থেকে ঠাকুর এসে কেঁদে পড়ল।

তার মুখেই শোনা গেল, অমল বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তেই রাজাবাহাদুর কোন এক বড় ডাক্তার নিয়ে এসে পড়েছিলেন, গোটা কয়েক ইন্‌জেকশনও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কুমারের আর জ্ঞান ফিরে আসে নি। তারপর দুপুরের মধ্যেই সব শেষ। এই কিছুক্ষণ হলো, যোগাড়যন্তর করে শ্মশানে নিয়ে গেছে। রাজাবাহাদুর সঙ্গে গেছেন। গঙ্গাকে তিনি নিতে চান নি। সে একরকম জোর করেই গেছে। কোন্ শ্মশানে, ঠাকুর ঠিক বলতে পারল না। হাত দিয়ে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিল। অমল তার প্যাথলজিস্ট বন্ধুকে বলল, তাহলে বোধহয় কেওড়াতলায় নিয়ে গেছে। ওর বাবাও শুনেছি কোলকাতাতেই মারা যান, এবং তাঁকেও কেওড়াতলায় দাহ করা হয়েছিল।

—তার কারণ, ওদের ভবানীপুরের বাড়ি থেকে সেটা কাছে পড়ে। এখান থেকে নিশ্চয়ই অদ্দূরে নিয়ে যায় নি।

—যেখানেই নিক, শ্মশানে গিয়ে আর কী লাভ? উদাসকণ্ঠে বলল অমল। এই মৃত্যুতে সে অনেকটা ভেঙে পড়েছিল।

বন্ধু বলল, তাহলেও একবার চল। ব্লাড-রিপোর্ট রইল আমাদের কাছে। সেটা না দেখেই ডেথ্-সার্টিফিকেট দিল কে, আর তাতে কি লিখল, একবার জানা দরকার। রাজরাজড়ার ব্যাপার। কোনো গণ্ডগোলও তো থাকতে পারে।

—ওকে তুমি ছাখ নি, তাই ওকথা বলছ। সব দাবিদাওয়া ছেড়ে এক কাপড়ে চলে এসেছিল। ওর বিরুদ্ধে কারো কোনো আক্রোশ থাকতে পারে না।

—তবু একবার আমাদের যাওয়া উচিত। কোলকাতার শহরে হঠাৎ একটা লোক প্লেগে মারা গেল। ব্যাপারটা suppress করা ঠিক হবে না।

কাশীমিত্তির এবং নিমতলায় সন্ধান না পেয়ে, কেওড়াতলাতে যখন ওরা পৌঁছল, তখন দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। রাজাবাহাদুর এককোণে চুপ করে বসে আছেন। অমলকে দেখে

গঙ্গা ছুটে এল। ওর পায়ের উপর পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে ডাক্তারবাবু? আমি নিজে গিয়ে তোমায় ডেকে নিয়ে এলাম।

অমল কিছুক্ষণ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে রাজাবাহাদুরের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনুকূল শ্রোতা পেয়ে তাঁর শোকোচ্ছ্বাস তীব্র আকারে দেখা দিল।

সেই সুযোগে অমলের বন্ধুটি ডেথ-সার্টিফিকেটের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করল। কিন্তু শ্মশান-কর্তৃপক্ষ তাকে আমল দিলেন না। একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির এ জাতীয় কৌতূহল মেটাবার সরকারী দায় বোধহয় তাঁদের ছিল না। তখন অমল মনে মনে অনিচ্ছুক হলেও, ব্যাধি এবং তার সঙ্গে জড়িত অন্য দু-একটি বিষয়ের (যেমন হাওড়া স্টেশনে সূঁচ ফোটানো) গুরুত্ব বিবেচনা করে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টখানা পুলিসের গোচরে আনাই তার কর্তব্য বলে মনে করল।

ইংরেজ-আমলের পুলিস। সরকারী কর্তব্য করতে গিয়ে চাকরির ভাবনা ভাবতে হতো না। সুতরাং তৎপরতার অভাব হয় নি। সেই রাত্রেই ডেথ-সার্টিফিকেটখানা তাদের দখলে এসে গেল। তার মধ্যে কোনো একটি মারাত্মক রোগের উল্লেখ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেটা প্লেগ নয়। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার মুস্তফি তাদের হেফাজতে এসে গেলেন। তাঁর অফিস-কামরায় তল্লাশ চালিয়ে যে-সব চিঠিপত্র পাওয়া গেল, তার সূত্র ধরে তারা প্রথমে হানা দিল নিশানাথের গবেষণাগারে এবং তারপর রাজাবাহাদুরের প্রাসাদে। আরেক দল চলে গেল সেই ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরের কাছে এবং বহু চাঞ্চল্যকর তথ্যাদি নিয়ে ফিরে এল। তার ফলে রাজাবাহাদুর এবং নিশানাথ একই দিনে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

সেই চিরস্মরণীয় দিনটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তদন্ত শেষ করে মামলা দায়ের করতে পুলিসের বহুদিন লেগেছিল। এই

সুদীর্ঘ হাজতবাসের প্রতিটি দিন আমি রাজাবাহাতুরের নিকট থেকে নিকটতর সান্নিধ্যে এসেছি আর মুগ্ধ হয়েছি। কার্য-সূত্রে যখনই একনম্বর সেল-ব্লকে যাবার প্রয়োজন হয়েছে, দেখেছি, শ্বেতমর্মরে গড়া একটি বিশাল মূর্তি কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো শুয়ে আছে। শান্ত, মৌনী, অবিচল। দেখামাত্র সৌম্য মুখখানি জুড়ে একটি বিনম্র, মৃত্যু হাসি, তার সঙ্গে দীর্ঘ হাত দুটি তুলে একটি ক্ষুদ্র বিনীত নমস্কার। কোনোদিন তার অন্যথা হতে দেখি নি। নালিশ নেই, অভিযোগ নেই, বিন্দুমাত্র বিরক্তি-প্রকাশ নেই। কুশল প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, 'ভালো আছি।' অথচ আমরা তো জানি, এই অভিশপ্ত জীবনের অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্রতায় দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। ভালো তিনি ছিলেন না।

হাজত থেকে যেদিন তাঁকে Condemned Cell অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের সেল-ব্লকে নিয়ে যাওয়া হলো, সেদিনও তাঁর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। পাশের ঘরেই নিশানাথ। তারও ঐ একই দণ্ড। তার চিৎকারে, আবদারে, অভিযোগে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু রাজাবাহাতুর তেমনি নীরব, নিশ্চল। শুধু একটি দিন তাঁকে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখেছিলাম। মুহূর্তের জন্যে একটুখানি ধৈর্যচ্যুতি। ঘটনাটির মধ্যে কিছু মজাও আছে। পাঠকের সেটা উপরি পাওনা। সুতরাং বলে ফেলা যাক।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে মাঝে মাঝে জেল পরিদর্শনে আসতে হয়। তখন ওখানে ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ন। বেশ কড়া লোক, তার সঙ্গে একটু বোধহয় ছিটও ছিল। রাজাবাহাতুরের সেল্-এর সামনে গিয়ে যথারীতি জানতে চাইলেন—কোনো নালিশ আছে? তার অনেকদিন আগে ওঁরা দায়রা আদালতের রায়-এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেছেন। বিচার দূরে থাক শুনানির দিন পর্যন্ত ধার্য হয় নি। ব্যাপারটা শুধু আশ্চর্য নয়, অভূতপূর্ব। ফাঁসির আসামীর আপীল কখনো এতদিন পড়ে থাকে না। দিনের পর দিন এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাটানো এক দুঃসহ শাস্তি।

তার থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুক্তি দেওয়াই হাইকোর্টের চিরাচরিত রীতি। এক্ষেত্রে এই দীর্ঘ বিলম্বের কারণ কি, তাঁরাই বলতে পারেন।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের সেই মামুলী উত্তরই আমরা আশা করছিলাম। কিন্তু রাজাবাহাদুরের যে নিঃসীম সহিষ্ণুতা, সেখানেও বোধহয় একটু ফাটল ধরেছিল। গরাদে দেওয়া রুদ্ধ দরজার সামনে একটু এগিয়ে এসে বললেন, আপনার যদি ক্ষমতা থাকে সাহেব, একটা উপকার করলে বিশেষ বাধিত হবো। মাসের পর মাস ধরে মাথার ওপর যে-সোর্ডখানা ঝুলছে, তাকে সোজা ফেলে দিতে বলুন। এছাড়া আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।

সাহেব আমাদের দিকে তাকালেন। ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। কোনো কথা না বলে অফিসে চলে এলেন, ওয়ারেণ্ট এবং অন্যান্য কাগজ-পত্রাদি দেখলেন, তারপর ভিজিটরস্ বুক টেনে নিয়ে মামলার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে শেষের দিকে লিখলেন, কেস্‌টি মহামান্য হাইকোর্টের বিচারাধীন। এবিষয়ে কোনোরকম মন্তব্য করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু এই জাতীয় কোনো পরিস্থিতি পৃথিবীর আর কোনো সভ্য দেশে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই, ঘটতে পারত কিনা সে-বিষয়েও আমি সন্দিহান।

জেলের নিয়মানুসারে ভিজিটররা যে মন্তব্য করেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বক্তব্য সহ তার একটা নকল স্বরাষ্ট্রবিভাগে পাঠাতে হয়। দিন-তিনেক পরে হোম্ মেম্বারের কাছ থেকে ভীষণ জরুরী টেলিফোন, তার মধ্যে রীতিমত সন্ত্রাসের সুর—এ করেছ কি! এই কথাগুলো যদি কোনোরকমে হাইকোর্টের নজরে পড়ে, কালেক্টরকে যে তখনই তোমাদের অতিথি হতে হবে। সিরিয়স্ কন্‌টেমপ্‌ট্ অব কোর্ট!

—কি করতে হবে? ততোধিক ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন সুপার।

—ভিজিটরস্ বুকের ঐ পাতাটা এখ্‌খনি ছিঁড়ে ফেলে দাও।

অফিসে যদি তার নকল থাকে, ডেস্ট্রয় অ্যাট্ওয়ান্স্। আমরাও তাই করছি।

যথাসময়ে, অর্থাৎ তার অনেক পরে হাইকোর্টের রায় বেরোল। ডেথ সেন্টেন্স কমিউটেড টু ট্রানস্পোর্টেশন ফর লাইফ্। নিশানাথেরও তাই। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ডাক্তার মুস্তফি আগেই খালাস পেয়েছিলেন।

"রক্তপরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে খবর আমার জানা ছিল না। তাহলে অবশ্যই তার রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা কবতাম। আমার বুদ্ধি-বিবেচনা মত যে রোগে মৃত্যু বলে মনে হয়েছে, ডেথ সার্টিফিকেটে তারই উল্লেখ করেছি"—

তাঁর এই উক্তি কোর্ট অবিশ্বাস করে নি।

নিশানাথ সম্পর্কে বলেছিলেন, "প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে গবেষণার সুবিধার জন্যেই আমি তার জন্যে যা কিছু করবার করেছি। সেখানে থেকে বীজাণু সংগ্রহ করে খুনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যাপার যদি ঘটে থাকে, তার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই।"

এ বিষয়েও দায়রা জজ তাঁকে বেনিফিট্ অব্ ডাউটের সুবিধা দিয়েছিলেন।

রাজাবাহাদুরকে আন্দামানে পাঠানো হয় নি। ঐ জেলেই ছিলেন। তাঁর সেই পুরনো জায়গায়—একনম্বর সেল-ব্লক। সেখানে বসেই একদিন, হয়তো কোনো দুর্বল মুহূর্তে—যা সকলের জীবনেই আসে—তিনি আমাব কাছে তাঁর সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। সে কথা এই আখ্যায়িকার গোড়ার দিকে উল্লেখ করেছি। আমাব মনেব মধ্যে সেদিন যে অসামান্য আবিষ্কারের উল্লাস জেগে উঠেছিল, তাও গোপন রাখি নি। কিন্তু সত্যিই কি আমি তাঁর দুর্জ্ঞেয় মানসের রুদ্ধ কক্ষে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলাম? মনে আছে, সে দিন তাঁকে কোনো প্রশ্ন করি নি। তার কদিন পরে আমার সাধারণ বুদ্ধিতে যে স্থূল সন্দেহ জেগেছিল, তারই একটু আভাস

দিয়েছিলাম। অনেক ইতস্তত করে বলে ফেলেছিলাম—আচ্ছা, বৌরাণী এবং ছোটকুমারের আচরণে এমন কিছু কি আপনি দেখেছিলেন, যার থেকে—

রাজাবাহাদুর কথাটা শেষ করতে দেন নি। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে দাঁতে জিব কেটে বলেছিলেন, ছিঃ ছিঃ, ওদের সম্বন্ধে ওকথা ভাবাই যায় না! দুজনেই নিষ্পাপ, পবিত্র।

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছিলেন, হয়তো সেই জন্যেই আমি ঐ ছেলেটাকে কোনোদিন সইতে পারি নি। ও বড় বেশী শুদ্ধ, বড় বেশী মহৎ। ছেলেবেলা থেকে কোনো কিছুতে আসক্তি নেই, লোভ নেই। সেই সৃষ্টিছাড়া বৈরাগ্য আমাকে উঠতে বসতে পীড়া দিত। কখনো ভুলতে পারি নি, ও আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সাধ্য নেই কোনোদিন সেখানে উঠি। বিয়ে করে যাকে নিয়ে এলাম, সেও আমার নাগালের বাইরে চলে গেল। আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। ওরা যেন আমাকে একঘরে করে তাড়িয়ে দিল। কি করে যে আমার দিন কেটেছে, আপনাকে বোঝাতে পারবো না, মিস্টার চৌধুরী।

আবার কিছুক্ষণের বিরতি। বোধহয় সেই দিনগুলোর মধ্যে ফিরে গিয়ে নতুন করে সেই যন্ত্রণাটা অনুভব করলেন। তেমনি গভীর সুরে বললেন, তারপর যেদিন সব কিছু আমাকে লিখে দিয়ে চলে গেল, আমার কি মনে হলো জানেন? মনে হলো, সম্পত্তি নয়, সোনা-দানা নয়, একতাল কাদা ছুঁড়ে দিয়ে গেল আমার মুখের ওপর।

—আপনি নিলেন কেন সে-সম্পত্তি?

—নিলাম, তার কারণ, না নেবার মত জোর আমার মধ্যে ছিল না। তাছাড়া আমি না নিলে হয়তো যাকে তাকে দিয়ে যেত। যে সে আমার পিতৃ-পিতামহের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে বসবে। আমার প্রাসাদের অর্ধেক অধিকার দাবি করবে, আমার জীবন থাকতে তা হতে পারে না। তাই নিতে হল। কিন্তু নিয়ে কি

একদিনের তরেও স্বস্তি পেয়েছি, মনে করেন ? কেবলই মনে হত, সে আমাকে চিরদিনের তরে হারিয়ে দিয়ে গেল। সে স্পর্ধা কেমন করে সহ্য করা যায়, বলুন ?

আরেকদিন অন্য কি একটা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমাকে লোকে বলে রূপবান পুরুষ। রূপ আমার পূর্বপুরুষের দান। ও সেটা পায় নি। তার বদলে এমন একটা halo ছিল ওর মধ্যে, দেখতাম আর হাড়ে হাড়ে অনুভব করতাম, তার কাছে আমি কত কুৎসিত ! চোখের ওপর একটা চোখঝলসানো আলো কতক্ষণ বরদাস্ত করা যায় ?

কোলকাতা এবং তার আশেপাশের জেলগুলোতেই অনেকদিন ধরে ঘুরেছি, লালদীঘির কর্তাদের সেটা খেয়াল হয় নি। যখন হলো, মোটা কলমের এক খোঁচায় আমাকে একেবারে দক্ষিণ বাংলার শেষ প্রান্তে ঠেলে দিলেন। বছর কয়েক পরে সেখান থেকে পাঠালেন উত্তরে। তারপর গোটা পূর্বাঞ্চল ঘুরিয়ে দিলেন। এমনি করে তিন দিকব্যাপী দীর্ঘ পরিক্রমা শেষ করে স্বাধীনতার টানে 'অপটী'-রূপে (optee) আবার পশ্চিম বাংলায় ফিরে এলাম। ততদিনে আমার মাথার চুল উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু রাজাবাহাদুরের রূপ বিস্মৃতির কালিমায় ম্লান হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কয়েক ধাপ উপরে উঠেছি। এবারে একটা বড় সেন্ট্রাল জেলের হাল ধরবার ডাক এসে গেল।

চার্জ নেবার পরদিন সদলবলে 'রাউণ্ডে' চলেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের চত্বর পার হয়ে বারান্দায় পড়ে ডানদিকে মোড় নিতে যাব, হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালাম। মুখ থেকে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে গেল—এ কে ! নমস্কারের সেই বিশেষ ভঙ্গিটি তেমনি আছে। কিন্তু যে স্নিগ্ধ হাসিটি সেদিন মুহূর্তমধ্যে সমস্ত মুখখানাকে উদ্ভাসিত করে দিত, আজ শুধু কতকগুলো বিকৃত কুঞ্চন দিয়ে তাকে কুৎসিত ও ভয়াবহ করে তুলল। কণ্ঠস্বরের সে গাম্ভীর্যও কোথায় চলে গেছে। কেমন একটা কর্কশ খনখনে আওয়াজ বেরিয়ে

এল—চিনতে পাচ্ছেন ?

উত্তর দিতে ভুলে গেলাম।

আমি তখন অনেকগুলো বছর পার হয়ে সেই দিনটিতে ফিরে গেছি, যেদিন প্রথম এঁকে দেখেছিলাম। সহসা-জ্বলে-ওঠা তড়িৎ-চমকে আমার স্মৃতিকক্ষের সব অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল এক দীর্ঘ, ঋজু, ভাস্বর পুরুষ, যার দিকে তাকিয়ে গিবীনদা বলেছিলেন—Every inch an Aristocrat. তার সঙ্গে এই কঙ্কালের কোনোখানে কোনো মিল নেই। চিনতে যে পেরেছি, সেটাই আমার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হলো।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ কুড়ি বছর। কিন্তু Fourteen years' rule নামক আইনের বলে রেমিশন সমেত চৌদ্দ বছর পার হলেই সুপারের অভিমত নিয়ে প্রাদেশিক সরকার বেশিরভাগ লোককে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। রাজাবাহাত্বরকে সে আইনের সুযোগ দেওয়া হয় নি। জেল থেকে যথারীতি সুপারিশ পাঠানো হয়েছিল। সরকার রাজী হন নি। এক বছর পরে কেসটা আবাব নতুন করে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

পরের সপ্তাহে খবর এল, রাজাবাহাত্বর আমার দর্শন-প্রার্থী। অফিসে নিয়ে আসতে বলে দিলাম। ধীরে ধীরে নুইয়েপড়া দেহটাকে যেন কোনোরকমে টেনে নিয়ে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললাম। খানিকটা ইতস্তত করে সসঙ্কোচে সেটি দখল করলেন। বললাম, বৌরাণী কেমন আছেন ?

—অনেকদিন খবর পাই নি।

—মাঝে মাঝে দেখা করতে আসেন না ?

—আমিই বারণ করেছি। শুনেছি, বেশিরভাগ সময় ঠাকুর-ঘরেই পড়ে থাকে। তাই, আর ডিস্‌টার্ব করতে চাই নি !

আর কোনো প্রশ্ন না করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। ইঙ্গিতটা বুঝলেও আরো কিছু সময় গেল দ্বিধার জড়তা

কাটিয়ে উঠতে। তারপর ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বললেন, আসতে না আসতেই বিরক্ত করছি। অথচ—

বললাম, আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হবো না।

—বেশ বুঝতে পারছি, ডাক এসে গেছে। আর বেশিদিন নেই। তাই ভাবছিলাম, শেষ নিঃশ্বাসটা যদি বাপ-পিতামহের ভিটেয় গিয়ে ফেলতে পারতাম, তবু খানিকটা তৃপ্তি হতো।

বলতে যাচ্ছিলাম, ওসব আপনার মিথ্যা আশঙ্কা, সাহস হারাবেন না ইত্যাদি। ওঁর শরীরের দিকে চেয়ে নিরস্ত হলাম। ঐ জাতীয় মামুলী সান্ত্বনা অন্য কাউকে দেওয়া যেত। এঁর বেলায় নিরর্থক। শুধু বললাম, আপনার কেস্‌টা আমি দেখেছি। আমার পক্ষে যতখানি সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

—জানি; সেইটুকুই আমার ভরসা।

কয়েকদিনের মধ্যেই খবর এল মন্ত্রী আসছেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম মন্ত্রী, এবং এ জেলে তাঁর প্রথম পদার্পণ। রাজাবাহাদুরকে বলে পাঠালাম, ঐ ওয়ার্ডে যখন যাবেন, ওঁর প্রার্থনা যেন তাঁর কাছে পেশ করা হয়। তাই হলো। এই কুখ্যাত মামলার বীভৎস ইতিহাস মন্ত্রীমহাশয়ের না জানবার কথা নয়। সেই হত্যাকাণ্ডের যে প্রধান নায়ক, তার উপরে কঠোর মনোভাব পোষণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই লোকটার এই পরিণাম বোধহয় তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তার উপরে তার শেষ নিবেদনের বিষয়বস্তু এবং যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে সেটা বর্ণিত হলো, সবকিছু মিলে তাঁর মনে একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, বুঝতে পারলাম। ওখানে একটা সময়োচিত জবাব দিয়ে অফিসে ফিরে গিয়ে বললেন, বিষদাঁত ভেঙে গেছে, মনে হচ্ছে। এবার বোধহয় ছেড়ে দেওয়া যায়। আপনি কি বলেন?

—আজ্ঞে আমারও তাই মনে হয়। Let him have the comfort of dying at home.

কথাটা আমার রচনা নয়, জেলকোড-এর কোনো একটি ধারার পুনরুক্তি। যে হতভাগ্য বন্দীর জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু জেলের মেয়াদ বাকী, তার বেলায় ঐ আরামটুকু মঞ্জুর করবার বিধান আছে।

মন্ত্রী বললেন, তাহলে একটা পিটিশন দিতে বলুন, আর তার ওপরে আপনি একটু ভালো করে লিখে-টিখে দিন। তার মধ্যে ঐ কথাটা যেন থাকে—বেরিয়ে গিয়ে আবার একটা কিছু করবার মত দেহের শক্তি বা মনোবল দুটোই চলে গেছে। অর্থাৎ পুলিস যাকে বলে reversion to further crime, তার কোনো chance নেই।

দুদিনের মধ্যেই দরখাস্ত চলে গেল, এবং মন্ত্রীমহাশয়ের উপদেশমত আমার সুপারিশের সঙ্গে ঐ বিশেষ মন্তব্যটুকু জুড়ে দেওয়া হলো।

মাসখানেক পরে রাজাবাহাদুর মুক্তি পেলেন। তার আগে, ওঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে জেল থেকে ওঁর দেশের বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। দুজন পুরনো কর্মচারী এসেছিল। তারা এবং আমার কজন কর্মী ধরাধরি করে ওঁকে গাড়িতে তুলে দিল।

এর পরের ঘটনাগুলো আমার সংগ্রহ। কিছুটা খবরের কাগজ থেকে, এবং বাকী অংশ একজন পুলিস অফিসার মারফত, এ বিষয়ে যাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

রেলস্টেশন থেকে প্রাসাদে পৌঁছবার পরেও রাজাবাহাদুরকে গাড়ি থেকে ধরে নামাতে হয়েছিল। একতলায় তাঁর নিজস্ব মহলের কোনো একটা ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর নানা প্রশ্নের মধ্যে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বন্দুকগুলো সব আছে তো?

—আজ্ঞে, সবগুলো নেই। পুলিস লাইসেন্স দিতে চাইল না। কয়েকটা আছে।

—চল তো দেখি।

—এখনি যাবেন ? খাওয়া-দাওয়ার পর বরং—

—না ; তার আগেই ঘুরে আসি, চল।

লোকজনের কাঁধে ভর করে তেমনি ধীরে ধীরে আর্মারিতে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর প্রথম যৌবনের শিকার-সঙ্গী প্রিয় রাইফেলটা বের করলেন, কয়েকটা রিভলবার নাড়া-চাড়া করে দেখলেন, গুলীর বাক্সটাও খুলতে বললেন। ম্যানেজার ছিলেন দরজার বাইরে। তাকে লক্ষ্য করে বার বার অনুযোগ দিতে লাগলেন, এ করেছ কী ? সব যে নষ্ট হতে বসেছে।

এমন সময় বাইরে দাঁড়ানো চাকর-বাকরদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। কে যেন বলল, বৌরাণী আসছেন। চক্ষের নিমেষে সেই ভেঙে-পড়া অশক্ত, দুর্বল ন্যুব্জ দেহটা সবেগে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এবং ক্ষিপ্রবেগে, দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হাতে রাইফেল, কাঁধে গুলীভর্তি ব্যাণ্ডোলিয়র। বৌরাণী ওদিকের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন। পরনে পট্টবাস, হাতে ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল। চেঁচামেচি শুনে মাথা তুলতেই চোখ পড়ল বন্দুকের নল তাঁরই দিকে উদ্যত। চিৎকার করে একটা থামের আড়ালে সরে গেলেন। গুলী গিয়ে লাগল পেছনের দেয়ালে। ছুটে এগিয়ে গিয়ে আবার নিশানা নিলেন রাজাবাহাদুর। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা চেয়ার সজোরে তাঁর পিঠের উপর এসে পড়ল। তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে গুলী ছুঁড়লেন। একজন চাকর ছুটে পালাচ্ছিল। পিঠে লাগতেই সে পড়ে গেল। ততক্ষণে দুজন দারোয়ান বন্দুক নিয়ে ছুটে এসেছে। রাজাবাহাদুর গুলী চালাতে চালাতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন।

থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল। ও-সি'ও এসেছিলেন জন কয়েক পুলিস নিয়ে, কিন্তু সেই গুলীবৃষ্টির মুখে এগোতে সাহস করেন নি। সদরে টেলিগ্রাম করে বেশ কিছু আর্মড্ পুলিস আনিয়ে তারপরে আততায়ীকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। তাও জীবন্ত মানুষটাকে

ধরতে পারেন নি, পেয়েছিলেন তার প্রাণহীন দেহ। তার এক পকেটে ছিল সরকার প্রদত্ত মুক্তির আদেশের নকল, আরেক পকেটে এক টুকরো বহুদিনের পুরনো ভাঁজ করা বিবর্ণ কাগজ। তার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। পুলিস অফিসারের কাছে দু-একটি লাইন যা শুনেছিলাম, তার থেকে বুঝেছি ওটা সেই চিঠি—'ছোটু'র উদ্দেশে বৌরাণীর শেষ সম্ভাষণ।

আমি রাজাবাহাদুরকে চিনি। যে-চিঠি তাঁর দীর্ঘদিনব্যাপী বহুযত্নরচিত পরিকল্পনাকে সাফল্যের পূর্ব মুহূর্তে অকস্মাৎ বানচাল করে দিয়েছিল, তাকে তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেন না, একথা সহজেই বুঝতে পারি। সে চিঠি যার হাত থেকে বেরিয়েছিল, সে যে-ই হোক, তার বিরুদ্ধে এই আঠারো বছরের সঞ্চিত জিঘাংসা এবং প্রথম সুযোগেই তাকে চরিতার্থ করবার প্রচেষ্টা—এ সবও আমার কাছে দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু বিভিন্ন জেলখানার সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ঐ কাগজটুকু কেন যে তিনি এত বছর ধরে এত যত্নে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন—সে রহস্য আজও ভেদ করতে পারি নি।

॥ ছয় ॥

সেকালে কবি এবং কথাশিল্পীর কাজ ছিল রাজার মনোরঞ্জন। একালেও তাই, তবে এক রাজার নয়, বহু রাজার। তখন তাঁর গুণাগুণের বিচার করত রাজ-দরবার, এখন করে জন-দরবার। এ বড় কঠিন ঠাঁই। 'একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে' সে-'রাজার কাছে' হয়তো কোনো নগর প্রান্তে একখানি 'কানন-ঘেরা বাড়ি' 'চেয়ে' নেওয়া যেত। এ রাজার কাছে সে আশা দুরাশা মাত্র। বহু শ্লোকেও এঁর মন গলে না। কখনো কারো ভাগ্যে মন যদি বা গলে, হাত দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার বেশি আর কিছু গলে না। তবে একটি জিনিস মেলে। 'ফাংশন' নামক নাচ-গান-হাস্য-কৌতুকের আসরে একখানি উচ্চাসন; দীর্ঘ উৎসব-সূচীর শীর্ষদেশে একটি নাম— 'সভাপতি' কিংবা 'প্রধান-অতিথি'। ঐ সঙ্গে একটি গাঁদা কিংবা রজনীগন্ধার মালা। তাও ঠিক বিনামূল্যে নয়। বিনিময়ে বিমুখ এবং যথেচ্ছ-আলাপরত শ্রোতৃমণ্ডলীর শির লক্ষ্য করে একটি কঠিন বস্তু ছাড়তে হয়। তার নাম ভাষণ।

দৈবক্রমে 'লেখকে'র গদি যেদিন লাভ করলাম, তারপর থেকে ঐ আসনটিতে আমারও মাঝে মাঝে ডাক পড়ে থাকে। সেই সূত্রেই একটা কোনো উপলক্ষে মফঃস্বলের যে শহরটিতে আমাকে যেতে হয়েছিল, কয়েক বছর আগে আমি ছিলাম সেখানকার বৃহৎ জেলখানার কর্ণধার। সেই বহু-পরিচিত সু-উচ্চ পাঁচিলের পাশ দিয়ে পথ। গাড়িখানা যখন একরাশ ধুলো উড়িয়ে দ্রুতবেগে তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, নিজের অজান্তে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। ঐ পাষাণ-বেষ্টনীর অন্তরালে জীবনের যে অধ্যায়টা একদিন ফেলে গিয়েছিলাম, তার ভিতরকার অনেকগুলো মুখ সহসা এসে মনের দুয়ারে ভিড় করে দাঁড়াল। দেখলাম, সেখানেও বহু ধুলো জমে গেছে। কোনোটিকেই ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। অথচ সেদিন

এত বড় দুনিয়া থেকে আলাদা ঐ ঘেরা জায়গাটুকুই ছিল আমার জগৎ। ওর ভিতরে জড়ো-করা একদল বিশেষ শ্রেণীর জীব নিয়েই গড়ে উঠেছিল আমার মানসলোক। তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছোট ও বড় বহু সমস্যা আমার ধ্যান ও কর্মের প্রায় সবখানি দখল করে রেখেছিল। মাঝখানে এই সামান্য কটা বছরের ব্যবধান। এরই মধ্যে সেখান থেকে তারা সরে গেছে ; কিংবা বলা যেতে পারে, হটে গেছে। আর কিছুদিন পরে ঐ ধূলি-মলিন অস্পষ্ট কায়াগুলো হয়তো একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে।

গিরীনদা বলতেন, মানুষের মন বড় অকৃতজ্ঞ। আজ যারা তার খাদ্য যোগায়, সর্বক্ষণ তাকে সঙ্গ দেয়, তার ভাবনা-অনুভূতি আনন্দ-বেদনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকে, দুদিন যেতে না যেতেই তাদের দিকে সে ফিরেও তাকায় না। তখন সে কোনো নতুনের প্রেমে মশগুল। কালক্রমে সে নতুনও কোথায় মিলিয়ে যায়, দেখা দেয় 'নতুন-তর'।

সত্যি তাই। 'মনের' মন পাওয়া বড় দুষ্কর। সে চির-চঞ্চল। এক আসন থেকে আরেক আসনে সতত-সঞ্চরমাণ। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বের বালাই নেই। মধুকর-বৃত্তিই তার ধর্ম।

'দুই বিঘা জমি'র ভূতপূর্ব মালিক হতভাগ্য 'উপেন' দীর্ঘকাল পরে সন্ন্যাসীবেশে একদিন যখন, তার 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ,' সেই পুরনো মাটিতে ফিরে এসে দাঁড়াল, সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল—কোথায় তার সে জমি। 'কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন।' সেদিন ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায় সেই 'নিলাজ কুলটা ভূমিকে' সে বারংবার ধিক্কার দিয়েছিল। আমার এই মনটা কি তার চেয়েও নির্লজ্জ নয়? তবু কোনো ধিক্কারের সুর আমার কণ্ঠে বাজল না। ক্ষোভ এবং বিস্ময়ের যে সূক্ষ্ম বাষ্পজাল ক্ষণেকের তরে মনশ্চক্রবালে দেখা দিয়েছিল, তাকেও উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। নিজেকে বোঝালাম পিছন পানে না তাকিয়ে নিয়ত এগিয়ে যাওয়াই তো সজীব মনের পরিচয়। অতীতের স্মৃতিভারে

মুয়ে পড়াটাই মানসিক অবক্ষয় বা 'ডেকাডেন্সের' লক্ষণ।

সোজা হয়ে বসে সামনের দিকে তাকালাম। পশ্চাৎ-মুখী ঝিমিয়ে পড়া চিন্তার স্রোতকে টেনে নিয়ে এলাম আসন্ন কর্মধারার পথে। যে কাজে এসেছি, যে গৌরবময় গুরু দায়িত্ব-ভার এই মুহূর্তে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তারই দিকে নিজেকে সজাগ করে তুললাম।

তবু চলতে চলতে অন্তরের কোন্ কোণে কিসের একটা কাঁটা যেন খচ খচ করে বিঁধতে লাগল। যে কালো পাঁচিলটাকে পিছনে ফেলে এলাম, সে যেন সমস্ত পথটা আমাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলল। দূরে ঠেলে দিতে চাইলেও গেল না।

যে প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে সভাস্থলে ছুটেছি, তার সুযোগ্য সম্পাদক আমার পাশেই বসেছিলেন। এতদিন ধরে তাঁদের এখানে যা কিছু গড়ে উঠেছে, এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের যতকিছু আয়োজন, সবই যে তাঁর একক প্রচেষ্টার ফল, সেই সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ধারা-বিবরণী তিনি সগর্বে এবং সবিনয়ে আমার কর্ণমূলে পরিবেশন করে চলেছিলেন। আমি কিছুই শুনছিলাম না; মাঝে মাঝে শুধু মাথা নেড়ে দু-চারটা 'ও', 'আচ্ছা', 'তাই নাকি!' যোগ করে যাচ্ছিলাম। মাঝপথে ঐ জেলের পাঁচিলটার অলক্ষ্য অনুসরণ বোধহয় আমাকে একটু আনমনা করে দিয়ে থাকবে। সম্পাদক সেটা লক্ষ্য করলেন। কি ভাবলেন, জানি না। ক্ষণেকের তরে গাড়ির বাইরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আপনার পুরনো কর্মস্থল ফেলে এলাম। দেখে যাবেন নাকি একবার?

—কী আর দেখবো? তাছাড়া, সময়ই বা কই?

—তাই তো। কাল ভোরেই যে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। কত কাজ আপনার! কত জায়গায় যেতে হয়। এত ব্যস্ততার মধ্যেও একটি দিনের জন্যে আপনাকে আমরা পেলাম, সেটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

স্তুতিবাদটুকু উপভোগ করলেও প্রতিবাদ-সূচক একটা কি জবাব

দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই গাড়িটা সভামঞ্চের গেট্-এ এসে থামল এবং আমাকে নামিয়ে নেবার জন্যে কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

তারপর, যেমন হয়ে থাকে, বারকয়েক আলো নেভা ও মাইক-বিভ্রাট। তারই মধ্যে সভার কাজ শেষ হলো, শুরু হলো নাটক। সেটা বেশ ভালোই লাগছিল ; বিশেষ করে অভিনয়, সাজ-পোশাক এবং পরিচালনার ছোটখাট ত্রুটিগুলো। মফঃস্বলের নাটমঞ্চে ঐগুলোই বেশি উপভোগ্য। ওখানে যাঁরা 'নিখুঁত'-এর আশা নিয়ে যান, এবং না পেলে মন খুঁত খুঁত করে তাঁদের ঠকতে হবে। খুঁতের মধ্যেই তো রস। ড্রপটা যদি দু-একবার মাঝপথে আটকে না যায়, চন্দ্রবাবুর দাড়ি কিংবা রসিকদাদার গোঁফ যদি আগাগোড়া স্বস্থানে অটুট থাকে, অভিনেতারা মাঝে মাঝে পার্ট ভুলে গিয়ে প্রম্প্টারের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে না তাকায়, তাহলে আর শখের থিয়েটার দেখে সুখ কোথায় ? নাট্যকলার সঙ্গে এই সব মজাদার আনুষঙ্গিক-গুলোকে সমভাবে উপভোগ করতে আমার কোনোদিন বাধে না। তাই এই জাতীয় অনুষ্ঠান থেকে বরাবরই যথার্থ আনন্দ পেয়ে থাকি।

আজও পাচ্ছিলাম, এবং মনের দিক থেকে মাঝপথে উঠে পড়বার কোনো তাগিদ ছিল না। কিন্তু এদিকে যে আবার ভি. আই. পি. সেজে বসে আছি। এই সব অসার বস্তুর পিছনে মন ও সময়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের বেশি ব্যয় করা চলে না ; পদ-মর্যাদায় বাধে। একটি অঙ্ক শেষ হতে না হতেই আশেপাশের আসনগুলো ফাঁকা হতে লাগল। বৃহৎ ব্যক্তিরা একে একে সবিনয়ে বিদায় নিচ্ছেন। আমিও তো সেই দলে। সুতরাং আর বসে থাকাটা শোভা পায় না।

বিয়ে-বাড়ির সাধারণ ভোজের আসরে যদু-মধুদের মধ্যে বসে অতি-বিশিষ্ট অতিথি যদি শাকভাজা থেকে মিঠে পান পর্যন্ত গোটা পর্বটা চালাতে থাকেন, সেটা তাঁর পক্ষে অতিশয় বেমানান। পেটে ক্ষিদে, এবং জিভে লোভ যতই থাক, মুখে লাজ না দেখিয়ে উপায়

নেই। বাড়ির কর্তাও মনে মনে তাই চান। মহামান্য অতিথিকে আলাদা কোথাও বসিয়ে গোটা দুই সন্দেশ, একটু দই এবং তার সঙ্গে প্রচুর মৌখিক আপ্যায়ন দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেন। এই সব সাংস্কৃতিক আসরের রীতিনীতিও তাই। বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত খ্যাতিমান ব্যক্তির বেলায় সংক্ষিপ্ত ভোজের ব্যবস্থা। শুধু অগ্রভাগ। বাকীটা, অর্থাৎ উদ্বোধন থেকে উপসংহার পর্যন্ত বিস্তৃত যে বৃহৎ প্রোগ্রাম, তা রইল অবৃহৎ ইতরজনের ভাগে।

অতএব উঠে পড়লাম। উঁচু মহলের উদ্যোক্তাদের মুখে খুশির আভাস ফুটে উঠল। তাঁরাও যাবার জন্যে প্রস্তুত। আগেই যেতেন। 'প্রধান অতিথি'কে ফেলে যাওয়াটা সৌজন্যে বাধছিল। এবং তাঁর অপ্রধান-জনোচিত আচরণে ভিতরে ভিতরে হয়তো অস্বস্তি বোধ করছিলেন। নীচের মহল, অর্থাৎ যারা সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত—আয়োজক এবং শিল্পী-গোষ্ঠী, তারা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলো, যদিও মুখে সেটা প্রকাশ করতে সাহস করল না। 'কষ্ট করে' এতক্ষণ যে ছিলাম, সেটাই তো তাদের পরম ভাগ্য।

সামিয়ানার বাইরে বেরোতেই অভিলাষবাবুর সঙ্গে দেখা। মুখ থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে গেল—আপনি এখানে !

তিনি হেসে বললেন—অবাক হবার কথাই। তবে যা মনে করেছেন, তা নয়। বক্তৃতা শুনতে বা নাটক দেখতে আসি নি।

—সেই কথাই ভাবছি। ওসব দুর্বলতা তো আপনার কোনো কালেই ছিল না।

—দুর্বলতা নয় স্যর, বলতে পারেন অক্ষমতা। প্রথমটা বুঝি না, দ্বিতীয়টায় রস পাই না। এসেছি প্রাণের দায়ে। আপনাকে আমার ভয়ানক দরকার।

—আমাকে !

—হ্যাঁ ; আপনি যা হয়েছেন তাঁকে নয়, আপনি যা ছিলেন, তাঁকে।

বুঝলাম, ভদ্রলোক আবার একটা কোন ফ্যাসাদে পড়েছেন।

অভিলাষবাবুর সঙ্গে পরিচয় আমার অনেক দিনের। একাধিক জেলে এক সঙ্গে কাজ করেছি। উনি এক ধাপ নীচে ছিলেন আমার চেয়ে। সেটা নিছক অফিস-গত সম্পর্ক। তার বাইরে আমরা বরাবর বন্ধু। অবশ্য অফিসের বাইরে ওঁকে পাওয়াই ছিল দুরূহ ব্যাপার। ঢুকতেন সকলের আগে, আর বেরোতেন সকলের পরে। বেরনো মানে গেট্ পেরিয়ে কয়েক পা হেঁটে বাসায় গিয়ে বসা। সেটুকুও করতো ওঁর দেহ। মন থেকে যেত গেটের ভিতরে। অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টার জন্যে জেল ছেড়ে এলেও জেল ওঁকে ছাড়ত না। সিন্ধবাদ হয়ে ঘাড়ের উপর চেপে বসে থাকত। ভদ্রলোকের চিন্তা-ভাবনা আলাপ-আলোচনার পরিধিটাকে তার চার দেয়ালের বাইরে বড় একটা যেতে দিত না। গেলেও তখনি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসত।

নিজের সংসারের সঙ্গে অভিলাষবাবুর সম্পর্ক ছিল এক মাত্র আর্থিক। সেটা চুকে যেত প্রতিমাসের পয়লা তারিখে—মাইনের টাকা কটি যখন স্ত্রীর হাতে এনে তুলে দিতেন। বাকী যা কিছু, তার সব ভার ভদ্রমহিলা একাই বহন করতেন। না পারলে, বা কোনোখানে আটকে গেলে স্বামীকে কখনো ঘাঁটাতেন না, জানতেন সেটা বৃথা—তাঁর সহকর্মীদের সাহায্য নিতেন। সেই সূত্রে ওঁদের পারিবারিক জটিলতার জট ছাড়াতে মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ত।

একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। সকালে অফিস যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি, অভিলাষবাবুর আট বছরের মেয়ে পুঁটি এল ছুটতে ছুটতে। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই গম্ভীর মুখ করে চুপি চুপি খবর দিল, 'দাদা কাল বাড়ি আসে নি। মা বললে, তোর জ্যাঠামশাইকে বলে আয়। আর—'

পরের অংশটুকু আন্দাজে বুঝে নিয়ে বললাম—মাকে গিয়ে বল, আমি যাবার সময় দেখা করে যাব।

মাঝে মাঝে বাড়ি না-ফেরার পালা এই 'দাদাটি'র পক্ষে নতুন

নয়। সম্প্রতি যে পথ সে ধরেছিল, সেখানেও তাকে একা বলা চলে না। আশেপাশের বাড়িগুলো খুঁজলে কৈশোর থেকে যৌবনের প্রথমাঙ্কে যারা পা দিয়েছে, তাদের মধ্যে ঐ রকম 'দাদা' বেশ কয়েকটি পাওয়া যাবে। কেউ প্রকাশ্য, কেউ প্রচ্ছন্ন। কেউ একটু বেশি এগিয়ে গেছে, কেউ ততটা পেরে ওঠে নি। মৌলিক কারণটা প্রায় সাধারণ, অর্থাৎ সকলের বেলাতেই মোটামুটি এক।

জেলের মাটিতে, অর্থাৎ তাকে কেন্দ্র করে তৈরী যে উপনিবেশ, যার সরকারী আখ্যা জেল-কোয়ার্টার্স, সেইখানে ওদের জন্ম। জন্মাবার পরেই যে বাতাসে ওরা নিশ্বাস নেয়, বিশেষ অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে ধরা পড়বে, তার মধ্যে এক ধরনের বিষাক্ত বীজাণু ভেসে বেড়াচ্ছে। তারা আকারে ছোটবড়, প্রকারেও বহুবিধ, সমষ্টিগত নাম 'ক্রাইম্'। সংক্রমণের দিক থেকে যক্ষ্মা বা বসন্তের চেয়ে কিছু মাত্র কম মারাত্মক নয়। কারণ, এদের আক্রমণ দেহস্তরে নয়, দেহকে ভেদ করে পৌঁছে যায় মনের মজ্জায়, বাসা বাঁধে চরিত্রের অস্থি-মূলে। সেই বিষে যারা আক্রান্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে জর্জর, তেমনি একদল মসি-চিহ্নিত প্রাণীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে ওখানকার ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হয়। অর্থাৎ বেড়ে ওঠে। কী হয়, সে কথা অনুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন উঠবে—অত বড় পাঁচিল পেরিয়ে সংস্পর্শটা ঘটে কেমন করে? নানাভাবে ঘটে। এক নম্বর—অলক্ষ্যে, মনস্তরে। নিজেদের অজ্ঞাতে ঐ 'দাদাদের' বাবা-কাকারাই জেল-ফটক থেকে প্রতি নির্গমে বীজাণুগুলো বয়ে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিক প্রবণতা, আলাপ-আলোচনা, অভ্যাস ও আচার-আচরণের ভিতর দিয়ে সেই বিষ অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হয়। বেচারা বাবা-কাকাদের দোষ দেওয়া যায় না। জেলকে ঘিরেই তাঁদের জীবন। সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র ঐ কালো পাঁচিল এবং তার ভিতরকার জীবন-ধারা; তাঁরা হলেন গ্রহ-উপগ্রহ। পরিক্রমার বিরাম নেই। সূর্যোদয়ের বহু আগে শুরু, সূর্যাস্তের বহু পরে শেষ। মাঝখানে

কিছুক্ষণ মাধ্যাহ্নিক বিরতি। তাও নির্বিঘ্ন বা নিরবচ্ছিন্ন নয়।

'বেলা দ্বিপ্রহরে' বাসায় ফিরে ধড়া-চূড়া ছেড়ে সবে দুমগ জল মাথায় ঢেলেছেন কি ঢালেন নি, দরজার ওপার থেকে ফেটে পড়ল 'গেট ফালতুর' পরিচিত কণ্ঠ 'কাছারি সে টেলিফুক আয়া, হুজুর' ; কিংবা তার চেয়েও মারাত্মক মেসেজ—'একঠো ভিজিটর বাবু অফিসমে বৈঠল বা'। অর্থাৎ তখনি আবার ছুটতে হবে। ভিজিটরবাবুকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখলে চাকরি নিয়ে টানাটানি।

'রাত্রি দ্বিপ্রহরেও' নিস্তার নেই। গাঢ় নিদ্রার নাসিকা গর্জন থমকে থেমে যাবে নাইট ডিউটি দেশোয়ালী জমাদারের বাঁজখাই গলার জরুরী আহ্বানে—'ডিভিজন সে বিশঠো আসামী চালান আয়া ; জলদি আইয়ে।' রাত দশটায় ট্রেন থেকে নেমেছে তারা। তিন মাইল পথ হাঁটিয়ে নিয়ে জেল গেটে পৌঁছতে বারোটা তো বাজবেই। ছোট সাব ডিভিশনের এক-কামরাওয়ালা জেল। অত লোকের জায়গা নেই। কোর্ট থেকে আসা মাত্র রওনা করে দিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট কিংবা সেণ্ট্রাল জেলে। ওয়ারেণ্ট্ ইত্যাদি পরীক্ষা না করে 'রিসিভ' করা যাবে না। অতএব 'বোলাও ডেপুটিবাবুকো।' কেন না, এটা ডেপুটি জেলারের বিশেষ দায়িত্ব। রামের বদলে শ্যাম এল কিনা, দলিল পত্র ঠিক আছে কিনা—সব দেখে শুনে নিতে হবে তাঁকেই।

বন্দিশালার পরিধির বাইরেও যে একটা বিস্তীর্ণ জগৎ আছে, সেখানকার অতি সামান্য সাড়াই এদের কানে এসে পৌঁছায়। সব আকর্ষণ, সব যোগাযোগ থেকে হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলো গুটিয়ে এনে এরা কূর্মের মত আত্মনিবদ্ধ। তারই মত শ্লথগতি। একটা সুনির্দিষ্ট সংকীর্ণ পথ ধরে গুটি গুটি যাওয়া এবং আসার মধ্যেই দৈনন্দিন জীবন সীমাবদ্ধ। প্রাত্যহিক চিন্তাধারা এবং পারিবারিক কথাবার্তার বিষয়বস্তু যে সেই চিহ্নিত সীমাকে ছাড়িয়ে যাবে, তার সম্ভাবনা কোথায়? এদের যারা বংশধর, তারাও ঐ আবহাওয়ার ভিতরে বসে ঐ ভাবেই ভাবান্বিত হয়ে উঠবে,

তাতে আর আশ্চর্য কি ?

দু নম্বর সংযোগটা আরো স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। সেখানে বীজাণু-বহনের বাহন হলো 'জলভরি দফা' নামক কয়েদীযূথ, জেল-কোড্-এর পরিভাষায় 'ওয়াটার-ক্যারিং গ্যাঙ্'। নেহাৎ ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি। সেই ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাক।

ইংরেজরাজ যখন জিলায় জিলায় ফৌজদারী আদালতের পত্তন করলেন, তার পিছনে একটা করে জেলও জুড়ে দিতে হলো। দুএর মধ্যে সম্পর্কটা অঙ্গাঙ্গী হলেও, অবস্থানটা ঠিক পাশাপাশি হলো না। জেল মানে বৃহৎ ব্যাপার। অনেক লোকের স্থায়ী আস্তানা, অর্থাৎ বড় বড় ব্যারাক, তাদের খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড়ের গুদাম, কাজ করাবার খাটনী ঘর, হাসপাতাল এবং অনেক কিছু। এই গেল এক দিক। আরেক দিকে, এই সব বিশেষ ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং খবরদারির আয়োজনটাও কম বিপুল নয়। সেখানেও অনেক লোকের সমাবেশ। সাধারণ রক্ষী থেকে মুখ্য শাসক ; মাঝখানে নানা স্তর এবং বিবিধ শ্রেণী। কারাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে পরিচালক গোষ্ঠীর সর্বক্ষণের সান্নিধ্য প্রয়োজন। অর্থাৎ 'জেল' মানে শুধু বন্দিশালা নয়, তার চারদিক ঘিরে তার রক্ষক, পালক ও তদন্তকারীদের ছোট-বড় বাসস্থান। সব মিলিয়ে একটি নাতিবৃহৎ জনপদ। তার জন্যে জায়গা চাই, শহর যা দিতে অক্ষম। তাই কোর্টের পাশে, শহরের মধ্যে তার থাকা চলে না, সরে যেতে হলো উপকণ্ঠে।

যে কোন বসতির প্রাথমিক প্রয়োজন জল। শহরে তার যোগান দেয় মিউনিসিপ্যালিটি। আজকের দিনে কোথাও কোথাও শহর-তলীর ভারও সে নিয়ে থাকে। কিন্তু তখনকার দিনে শহরের বাইরে, বিশেষ করে জেলখানার মত বৃহৎ গোষ্ঠীর রাক্ষুসে পিপাসা মেটাবার মত সামর্থ্য কোনো পৌরসংস্থার ছিল না। জেলকে তাই পুকুর কেটে, পাতকুয়ো খুঁড়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়েছিল। আভ্যন্তরীণ সরবরাহে কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নি। পাঁচিলের

মধ্যে জনবলের অভাব ছিল না। কিন্তু মুশকিল দেখা দিল বাইরে। সেখানেও প্রয়োজনের পরিমাণ প্রচুর। সেটা নলকূপের যুগ নয়। তাহলে হয়তো এখানে সেখানে তারই গোটা কয়েক বসিয়ে দিয়ে কাজ চলে যেত। কিন্তু অনেকখানি দূরে একটা বা দুটো পাতকুয়ো থেকে পারিবারিক চাহিদামত জল-সংগ্রহের ব্যাপারটা কর্মীদের পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। বাধ্য হয়ে সরকারই তার সুরাহা করে দিলেন। জেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একদল জাঙ্গিয়া-কুর্তা পরা 'পানি-পাঁড়ে।' ঘরে ঘরে জলদানের পুণ্য কর্মটি তাদের 'রিগারাস্ ইম্‌প্রিজনমেণ্ট' অর্থাৎ কঠোর কারাদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হলো। যে-সব কয়েদীর মেয়াদ এক বছর বা তার চেয়ে কম, কিংবা দীর্ঘতর-মেয়াদী হলেও, ওর বেশি যাদের বাকী নেই, তাদের ভিতর থেকে বেছে বেছে তৈরী হলো 'এক্‌স্ট্রামিউরাল গ্যাঙ,' অর্থাৎ প্রয়োজনমত তারা প্রাচীরের বাইরে যাবার অধিকারী। অতঃপর তারা পায়ে একটা করে লোহার মল পরে দলবদ্ধ ভাবে একজন সিপাই-এর জিম্মায় গেটের বাইরে জেলবাবুদের বাসায় বাসায় জল যোগাতে লাগল। ইংরেজি নামটা রইল খাতাপত্রে। সম্ভবতঃ ঐ সিপাইরাই ওদের নতুন নামকরণ করল—'জলভরি' বা 'পানি-দফা'। কড়া আদেশ জারি হলো—গোটা গ্যাঙটাকে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি 'মার্চ' করিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কেউ কখনো কোনো অবস্থাতেই যূথ-ভ্রষ্ট হতে পারবে না। অন্যথায়, সংশ্লিষ্ট কয়েদী তো বটেই, ভারপ্রাপ্ত সিপাইও দণ্ডনীয়।

এই ব্যবস্থা যেদিন প্রবর্তিত হলো, তারপর দীর্ঘকাল চলে গেছে। প্রায় সবখানেই শহর বেড়ে বেড়ে জেলকে তার আওতার মধ্যে নিয়ে এসেছে এবং তার জল-সরবরাহের দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে চলে গেছে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের হাতে। কোথাও কোথাও জেল-পল্লীর বাসায় বাসায় পাইপ বসে গেছে। কল ঘোরালেই জল। দূর থেকে বয়ে আনবার প্রয়োজন নেই। তবু 'জলভরি' রয়ে গেছে; যদিও জল আর তারা ভরে না। লম্বা কালো বড় বড় লৌহ-পিপার

আংটায় বাঁশ চালিয়ে জোড়ায় জোড়ায় গোটা দলটা এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি মার্চ করে চলেছে—এই বহু পুরাতন দৃশ্যটি আর চোখে পড়ে না। গেট পর্যন্ত অটুট গ্যাঙ। বেরিয়েই তুজন একজন করে ছড়িয়ে পড়ে বাসায়-বাসায়। কে কোন্ বাসার কয়েদী তাও ঠিক করা আছে। সেখানে তাদের অনেক কাজ। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা, আসবাব-পত্তর ঝাড়া মোছা, রান্নাবান্নার যোগাড় দেওয়া, এবং গৃহিণী যখন অন্যত্র আটকা থাকেন, তাঁর কচি শিশুটিকে আগলে রাখা। অনুগত গৃহভৃত্য, কিন্তু অবৈতনিক। সেদিক থেকে গৃহস্থ হয়তো কিঞ্চিৎ লাভবান, কিন্তু অলক্ষ্যে অগোচরে যে লোকসান ঘটে চলেছে, তার পরিমাণ ঐ 'লাভে'র চেয়ে অনেক বেশি। সেটি হচ্ছে বহু নিষ্পাপ অপরিণত মনে 'ক্রাইম' নামক সংক্রামক ব্যাধির অনুপ্রবেশ। যে *জন্যে* জলভরি দফার সৃষ্টি হয়েছিল, সে দরকার মিটে গেছে। জলের বদলে আজ তারা জেল-বাবুদের ঘরে ঘরে বিষ ভরে দেয়। শুরুটা প্রায়ই সামান্য। বারো বছরের ছেলের পকেটে হঠাৎ গোটা তুই সিগারেটের আবির্ভাব, তার সদ্য-যৌবন-প্রাপ্তা দিদির আঁচলে এক টুকরো উচ্ছ্বাসময় চিঠির আবিষ্কার, কিংবা তাদের বাবার ব্যাগ থেকে কয়েক আনা পয়সার অন্তর্ধান। কোনোটারই হয়তো কোনো নিজস্ব গুরুত্ব নেই। বিচলিত হবার মত কিছু নয়। কিন্তু এই তুচ্ছ সূচনাই বড় হয়ে হয়ে একদিন অনেক পরিবারের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে, সে দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি। অপরাধ ও অধঃপতনের পথ বড় মসৃণ। তার প্রথম ধাপগুলো আপাত-রমণীয় প্রলোভনের রঙে রঙিন। একটা বিশেষ বয়সের কাছে তাদের নিয়ত হাতছানি প্রায় অপ্রতিরোধ্য। অভিলাষবাবুর ছেলের মত আরো কত ছেলে তার টানে ভেসে চলে গেছে, কে তার খবর রাখে?

এমনি একটি 'ছেলে'র—সম্ভবতঃ তখন আর সে 'ছেলে' নেই—একখানি চিঠি আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। 'লৌহকপাট'-এর অর্গল খুলে দিয়ে সবে তখন কারা-শাসক থেকে লেখকের পদে

উন্নীত হয়েছি। অভিনন্দনের স্রোত বইছে। সকালের ডাক খুলতেই মধুস্রাবী ভাষার রাশি রাশি মনোরম প্রশস্তি।—"আপনার দরদী মনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলাম", "আপনি অমানুষের ভিতরে মানুষের সন্ধান পেয়েছেন", "সমাজের নীচের তলায় যুগ যুগ ধরে যারা মূক হয়ে ছিল, আপনি তাদের কণ্ঠে ভাষা দিয়েছেন",—ইত্যাদি, ইত্যাদি। একদিন এমনি একখানা অচেনা হাতের একপাতা চিঠির প্রথম কয়েক লাইনে চোখ বুলিয়েই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। ক্ষুদ্র একটা 'অন্তর্দেশীয়ের' অন্তরে এত বড় মুষল লুকানো ছিল, কে ভেবেছিল ?

চিঠিখানা আমার কাছে নেই। হুবহু প্রতিলিপি দিতে পারছি না। সুর এবং উক্তি অনেকটা এই রকম—রাস্তার মোড়ে যখন চোর ধরা পড়ে, তার কপালে জোটে পাইকারী মার। সত্যি চোর কিনা, কী চুরি করল, সেটুকুও কেউ ভেবে দেখে না। সেই লোকটাই যখন জেলে যায়, তাকে দেখে লোকে আহা উহু করে। তখন সে কয়েদী। বন্দী। বন্দীর জন্যে মানুষের কত দরদ, কত চোখের জল! তার কারণ বুঝি। তারা যে কী ভয়ঙ্কর চীজ, সাধারণ লোকে জানে না। কিন্তু আপনি ? আপনি তো জানেন, কত জনের কত সর্বনাশ করে তারা জেলে আসে। আসবার পরে যে সর্বনাশ করে, তা-ও আপনি দেখেছেন নিশ্চয়। 'জেলখানার ছেলে' বলে যে একটা আলাদা জাত আছে, তা কি আপনি শোনেন নি ? তাদের ছোঁয়াচ পাছে নিজেদের ছেলেপিলের গায়ে লাগে, আশেপাশের ভদ্রলোকেরা সেই ভয়ে কতটা সজাগ, তাও আপনার চোখে না পড়বার কথা নয়। কিন্তু কেন তারা 'মন্দ' ছাপ মেখে গোড়া থেকেই 'মন্দে'র পথ ধরে, সে খবরটা বাইরের লোকে না জানতে পারে, আপনিও কি না জানবার ভান করছেন ? তা যদি না হবে, সেই সত্যি কথাটা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করবার বাধা কোথায় ? হয়তো সে সাহস আপনার নেই। কিংবা হয়তো মনে করছেন, তাতে করে বাহবা পাবার সুবিধা নেই। তাই জেলখানার চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমায়েসের

কল্পিত দুঃখের বানানো কাহিনী দিয়ে আসর মাত করছেন, তারই হাতার মধ্যে বসে শুধু সেই কারণেই যারা মানুষ হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো, সেই হতভাগাদের ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছেন

বলা বাহুল্য, এই চিঠি পড়ে সেদিন বিরক্ত হয়েছিলাম। আত্ম-প্রসাদের মোহে মন ছিল আচ্ছন্ন, তাই ভক্ত পাঠকের অতিরঞ্জিত স্তুতিবাদকেই আমার ন্যায্য পুরস্কার বলে ধরে নিয়েছিলাম। সেই স্পষ্ট-ভাষণকে মনে হয়েছিল রুষ্টপাঠকের অন্যায় তিরস্কার। ধাতস্থ হবার পরে বুঝেছি, না, ওটাও আমার প্রাপ্য ছিল।

একটা কথা সেই প্রথম জীবনে মনে হতো,আজও হয়,—সরকারেব কাছে তার প্রশাসনিক প্রয়োজনটাই আসল, যার কাছে মানুষের স্বার্থ ও ভালমন্দ অনায়াসে বলি দেওয়া যায়। তা যদি না হবে, জেল-পাঁচিলের চারদিক ঘিরে তার কর্মী-উপনিবেশ গড়া হতো না। যক্ষ্মা বা বসন্ত হাসপাতালের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের তো কই তার হাতার মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে বাধ্য করা হয় না। সংক্রমণের হাত এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে বাস করবার অধিকার সেখানে স্বীকৃত। সে অধিকার নেই শুধু কারা-কর্মীর। তার কারণ এ নয় যে, কারাগার নামক যে ক্রাইম-হাসপাতাল, তার সংক্রামক-শক্তি ঐ সব হাসপাতালের চেয়ে কিছুমাত্র কম, কিংবা সেটা কর্তৃ-পক্ষের অগোচর। তার কারণ, এখানে নিরাপত্তার রূপ আলাদা।

সেফ্‌টি নয়, সেফ্‌ কাস্টডি। শাসকের চেয়ে শাসিতের স্বার্থ বড়। তাদের জন্যেই দুর্ভাবনা। তাদের আগলে রাখা, আটকে রাখা। তারই প্রয়োজনে ইঁটের প্রাচীরের চারদিকে আবার মানুষের বেড়া। বিভিন্ন স্তরের মানুষ—অতবড় যন্ত্রটাকে চালাবার জন্যে যে সব রকম রকম যন্ত্রীর দরকার। বেটন-ধারী, বন্দুক-ধারী তো বটেই, তার সঙ্গে ছোট-বড় কলম-ধারী। প্রথম দলের কিছু এবং শেষের দলের প্রায় সকলেই থাকে সপরিবারে। সরকারী দাক্ষিণ্যে ভাড়া দিতে হয় না। বরং কিছু উপরি পাওনা আছে; আর্থিক নয়, সেবারূপী পাওনা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'সারভিসেজ'—

অর্থাৎ ঐ 'ওয়াটার-ক্যারিং গ্যাঙ'। তার আসল রূপটা যে কী, সে 'লাভে'র কতটা যে 'ক্ষতি'র ঘরে জমা হচ্ছে, তার হিসাব ওখানকার বাবুদের খাতায় হয়তো পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে তাঁদের কোনো কোনো পুত্র-কন্যার ভবিষ্যতের পাতায়। তারই একখানা একদিন পত্রাঘাতের আকার নিয়ে আমার কাছে এসে পড়েছিল, এইমাত্র যার উল্লেখ করেছি। আরো অনেক আমার আগে থাকতেই জানা।

পুঁটির মা আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। গিয়েই শুনলাম, এ যাত্রায় তাঁর শ্রীমানটি একটু বেশি এগিয়ে গেছেন, অর্থাৎ জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে গত রাত্রে জেলে এসে গেছেন। কোনো সূত্রে ভোরবেলাতেই তাঁর কাছে খবর পৌঁছে গেছে। 'সূত্রটি' যে তাঁর স্বামী নন, জিজ্ঞাসা না করেই বুঝলাম। অথচ, অভিলাষবাবুই তখন 'আমদানী সেরেস্তার' ভারপ্রাপ্ত অফিসার। সারাদিন ধরে যারা জেলে এল—হাজতী বা কয়েদী—সন্ধ্যার পর তাদের সব ওয়ারেন্ট তাঁর পরীক্ষা করতে হয়, এবং অ্যাডমিশন রেজিস্টার নামক একটি বিশাল খাতায় তাদের নাম, ধাম, বিবরণের লম্বা ফিরিস্তি মিলিয়ে নিয়ে শেষ পংক্তিতে সই দিতে হয়। মেলাতে গিয়ে—ইংরেজিতে যাকে বলে চেক করা—অভিলাষবাবু ওয়ারেন্ট এবং খাতার বুকে এমন সজোরে এবং লম্বা হাতে পেন্সিল চালিয়ে থাকেন, যে তাঁর 'কাজে'র সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, তাদের মনে হবে, সব কেটে-কুটে দেওয়া হয়েছে। একবার এক নতুন শ্বেতাঙ্গ জেল-সুপার ক্ষত-বিক্ষত খাতার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—ইজ্ দিস্ অল রঙ্গ্ (wrong) ?

অভিলাষবাবু ততোধিক বিস্ময়ে জবাব দিলেন, নো, স্যর।

—দেন, হোয়াই ক্রস্ড্ আউট ?

এবার লজ্জিত হলেন অভিলাষ মজুমদার। মাথা চুলকে বললেন, আই হ্যাভ্ থরোলি চেক্ড্ দ্য এনট্রিজ্।

অফিসে পৌঁছেই আগের দিনের ওয়ারেণ্ট-গুচ্ছের ভিতর থেকে যথারীতি পেন্সিলাহত 'দীপঙ্কর মজুমদাব'কে টেনে বের করলাম। অভিলাষবাবুকে ডেকে দেখাতেই তিনি প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলেন না। আর একটু নজর দিয়েই চমকে উঠলেন—'গুলে'! তারপর কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়েই বললেন, ও হতভাগার যে ঐ রকম একটা পোশাকী নাম আছে, খেয়াল ছিল না।

—তার বাপের নামটা দেখেও মনে পড়ে নি?

—যে-ঝঞ্ঝাটে আছি, নিজের বাপের নামই খেয়াল থাকে না, স্যর, তা, এ তো ছেলের বাপের নাম।

বলেই, ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন নিজের টেবিলে। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে তাঁর করণীয় কিছু নেই। ছেলের জেলে-আসার চেয়েও তাঁর কাছে বড় তাঁর জেলের 'ঝঞ্ঝাট'।

অভিলাষবাবুর 'ঝঞ্ঝাট' প্রায় বারো মাসই লেগে থাকত, এবং তার বেশির ভাগ তাঁর নিজের তৈরি। দু-একটার উল্লেখ না করে পারছি না।

জেলের কয়েদী বা হাজতী আসামীদের সঙ্গে দেখা করতে হলে দরখাস্ত চাই। গেটের সামনে একটি করে বাক্স বসানো থাকে, দরখাস্ত-সংগ্রহের জন্যে; কোনো ফী দিতে হয় না। কিন্তু কোনো কোনো জেলে টহলদার সিপাইরা দর্শনপ্রার্থী জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কিঞ্চিৎ বেসরকারী ফী আদায় করে থাকেন। খবরটা উপর মহলের অজানা নয়, কিন্তু এই দুচার-আনার দস্তুরি নিয়ে কাউকে বিশেষ মাথা ঘামাতে দেখা যায় নি। অভিলাষবাবু হঠাৎ এই দুর্নীতি দমনে তৎপর হয়ে উঠলেন। মস্ত বড় সাইনবোর্ড পড়ল জেলের সামনে—'দেখা করিতে পয়সা লাগে না। কেহ পয়সা চাহিলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নজরে আনুন।'

দিন কয়েক পরে দেখা গেল, রাতের অন্ধকারে সাইনবোর্ড লোপাট। সান্ত্রীদের নিয়ে কদিন টানা-হেঁচড়া করলেন অভিলাষবাবু। কাউকে শাস্তি দেওয়া গেল না। সবাই বললে, দুর্ঘটনাটা তার ডিউটিতে ঘটে নি। নতুন সাইনবোর্ড টাঙানো হলো এবং তার

উপরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। 'মোলাকাতি দস্তুরি' সম্বন্ধেও ভীষণ কাড়াকড়ি শুরু করলেন অভিলাষবাবু।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম দুর্নীতির ফিরিস্তি দিয়ে একেবারে খোদকর্তার বরাবর ঘন ঘন বেনামা দরখাস্ত পড়তে লাগল। তলায় তলায় গোপন তদন্তও চলল তার সঙ্গে। অভিলাষবাবু তখন 'ওয়ার্ডার গার্ড' নামক শাখার অফিসার-ইন-চার্জ। সিপাইদের ছুটির আবেদন, এবং তার বিলি ব্যবস্থা ইত্যাদি তাঁর সেরেস্তার অন্তর্ভুক্ত। একদিন 'কায়থি' হরফে নাম লেখা একখানা খামের চিঠি এল জেলের ঠিকানায়। চিঠিপত্র বিভাগের কেরানী সেটা পড়তে না পেরে বড়সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। হাতের লেখা দেহাতী কায়থিতে তাঁর কিঞ্চিৎ দখল ছিল। শিরোনামাটা ভাল করে না দেখেই খুলে ফেললেন, এবং কোন-রকমে পাঠোদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

চিঠিখানা অভিলাষবাবুকে লেখা। লিখছে একজন সিপাই। ছুটিতে দেশে আছে; সেটা আরো কিছুদিন বাড়ানো দরকার।

সকাতর প্রার্থনা জানিয়েছে, 'বাবু' যদি মেহেরবানি করে সাহেবকে বলে ছুটির ব্যবস্থাটা করে দেন, তাঁর 'পান খাবার' যথারীতি ব্যবস্থাও সে ফিরে এসেই করবে। সে বিষয়ে কোন অন্যথা হবে না। সাহেব চিঠিখানা চেপে গেলেন, যদিও আগেকার কতগুলো বেনামা অভিযোগের সঙ্গে এটাকে যুক্ত করে তাঁর মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের ছায়া পড়ল। কদিন পরে ঠিক ঐ ধরনের আরেকখানা চিঠি আসতেই সেটা গাঢ়তর হলো। তার পরেই নিতান্ত অসময়ে অভিলাষবাবুর বদলির হুকুম। অনেক অসুবিধা ছিল। রদ্ করবার চেষ্টা করলেন। হলো না।

ব্যাপারটা আমি জানতাম। তার সঙ্গে এ-ও জানতাম, 'পান-খাওয়া' নামক ব্যাধি থেকে অভিলাষবাবু সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। সবটাই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। দুর্নীতি-উচ্ছেদ-কল্পে তাঁর অতিরিক্ত উৎসাহের ফল। স্বেচ্ছা-আমন্ত্রিত ফ্যাসাদ।

মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। এবার ফেরা যাক।

সভাস্থল থেকে বেরিয়ে অভিলাষবাবুর মুখে যখন শুনলাম, তিনি আমার সাহায্যপ্রার্থী, দীর্ঘকাল পরে হলেও, প্রথমেই মনে হলো, তিনি হয়তো আবার কোনো স্ব-রচিত 'ঝঞ্ঝাটে'র কবলে পড়ে থাকবেন আমার প্রোগ্রাম বদলাতে হলো। পরদিন সকালে স্টেশনের বদলে হাজির হলাম জেলখানায়। গিয়ে বুঝলাম, না এলেই ভালো ছিল। অভিলাষবাবুর প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে বিনা প্রয়োজনে আর একটা নির্মম কঠোর জীবন্ত সত্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হবে, কে ভেবেছিল ?

॥ সাত ॥

সে-কথা এখন থাক। অভিলাষবাবু যার জন্যে এত গরজ করে আমাকে টেনে নিয়ে এলেন, সেই ব্যাপারটা আগে বলে নিই।

যা অনুমান করেছিলাম, তাই। আবার একটা নতুন ঝঞ্ঝাট সাধ করে সেধে আনবার আয়োজন করছেন ভদ্রলোক। উদ্দেশ্য সেই—'অন্যায়ের প্রতিকার'। অর্থাৎ, পঞ্চাশ পেরিয়েও ইংরেজিতে যাকে 'ম্যাচিওরিটি' বলে, সেটা ওঁর আসে নি। হয়তো কোনো কালেই আসবে না। একবার সিপাইদের দুর্নীতি তাড়াতে গিয়ে নিজেই তাড়িত হয়েছিলেন, সে-কথা আমার মনে আছে, উনি বোধহয় ভুলে মেরে দিয়েছেন। কিংবা অভিলাষবাবুরা যে জাতের লোক, 'ঠেকে শেখা' বলে কোনো শব্দ তাদের অভিধানে নেই। 'অব্যাপারেষু ব্যাপারং' সম্বন্ধে হিতোপদেশের সাবধান বাণী তারা কোনো কালেই কানে তোলে না।

অভিলাষবাবু এবার যে কাণ্ডটা করতে চলেছেন, সোজা কথায় তাকে বলা যায় সরকারের 'পলিসি'র গায়ে হাত। মারাত্মক অপরাধ। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড্-এ 'আউটরেজিং মডেস্টি' বলে যে ধারাটা আছে, প্রায় তার সমতুল। 'পলিসি' হলো মন্ত্রী-মণ্ডলীর অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা, চাকরে-গোষ্ঠীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই সহজ কথাটা কিছুতেই ওঁর মাথায় ঢুকতে চাইল না। ঢোকাবার চেষ্টা করতেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই স্কীম্ ওঁদের আসল উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করবে।'

—করুক। তাতে আপনার কী? 'স্কীম্'-এর সঙ্গে 'ইমপ্লিমেন্‌টেশান' বলে যে আর একটা কথা আছে, সে কি এখনো আপনার মুখস্থ হয় নি? প্রথমটা ওঁদের এলাকা, দ্বিতীয়টা আপনার, সোজা বাংলায় যার নাম চোখ বুজে হুকুম তামিল করা। উদ্দেশ্য কী, সেটা সফল হবে, না পণ্ড হবে—এসব অবান্তর প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো

আপনার কাজ নয়।

—এই জলজ্যান্ত গলদগুলো দেখিয়ে দেবো না?

—না।

—এতগুলো মেয়ের ভবিষ্যৎ—যদি দেখতেন, কি রকম কান্নাকাটি করছে তারা।

—করুক না! ওঁরা বলবেন, ত্বনিয়ায় নিজের মঙ্গল কে কবে বুঝে থাকে? যার ভাল করতে চান, সে-ই সবচেয়ে বেশি বাধা দেবে। কান্নাকাটি শুনতে গেলে রাষ্ট্রের চলে না, বিশেষ করে যে রাষ্ট্রের ব্রত হলো জনকল্যাণ।

কথা হচ্ছিল, 'সুপারে'র অফিস-কামরায় বসে। টেবিলের উপর একটা খোলা ফাইল। তার ভিতরকার একটি সাম্প্রতিক সরকারী আদেশই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। আদেশটি নারী-কয়েদী সম্পর্কে। সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে বলা হয়েছে, এককালে ইম্প্রিজনমেণ্ট, অর্থাৎ, কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল দণ্ডিতের উপর রিট্যালিয়েশন বা প্রতিশোধ, বর্তমানে সভ্য রাষ্ট্রের শেষ কাম্য হলো তার রিহ্যাবিলিটেশন, মুক্তির পর সমাজদেহে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তার জন্যে তাকে এমন একটি কার্যকরী বৃত্তি শিখিয়ে দেওয়া দরকার, বাইরে গিয়ে যার অনুসরণ করে সে সৎপথে জীবিকা-নির্বাহ করতে পারে।

এর পরেই আসল বক্তব্য:—সরকার উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, বিভিন্ন জেলে, বিশেষ করে ডিস্ট্রিক্ট জেলগুলোতে যে-সব মেয়ে-কয়েদী থাকে, তাদের বেলায় ঐ-জাতীয় শিক্ষার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। তার প্রধান কারণ,—তারা সংখ্যায় এত অল্প যে, ঐ ক'টি মেয়ে নিয়ে কোনো কুটির-শিল্প গড়ে তোলা যায় না। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান, তাদের কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় জড়ো করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বৃহৎ সেণ্ট্রাল জেলের একটি অংশকে পৃথক করে তৈরি হয়েছে বিস্তৃত জেনানা-ফাটক। তার ভিতরে নানা রকমের ওয়ার্কশপ, সবজি-বাগান, স্কুল, খেলা-ধূলার মাঠ, মার

সূতিকাগার (মাঝে মাঝে দু-একটি গর্ভিণী স্ত্রীলোকও আমদানি হয়ে থাকে) ও নার্স-ট্রেনিং সেণ্টার বা শুশ্রূষা-কেন্দ্র, ইত্যাদি।

সরকার আশা করেন, মেয়ে-কয়েদীরা যাতে করে এই ব্যাপক ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রে ভবিষ্যতে কর্মঠ ও কুশলী নাগরিকে পরিণত হতে পারে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেবেন।

অভিলাষবাবু যখন এই বিশেষ সেণ্ট্রাল জেলের কর্ণধার হয়ে এলেন, তার আগেই বিভিন্ন জেল থেকে দুটি চারটি করে মেয়েরা আসতে শুরু করেছে। মোট সংখ্যা পঞ্চাশের উপর। ওয়ার্কশপ-গুলো খুলবার আয়োজন চলছে।

তাঁর চার্জ নেবার দিন তিনেক পরের ঘটনা। মঙ্গলবার। জেনানা-ফাটকের সাপ্তাহিক প্যারেড। নতুন সুপারের প্রথম পরিদর্শন। মেট্রন এবং তার সহকারিণীরা ভোরবেলা থেকে তার আয়োজনে ব্যস্ত। স্বয়ং জেলার গিয়ে একবার তদারক করে এসেছেন। মাঠের ধারে গাছের ছায়ায় মেয়েরা লাইন করে দাঁড়িয়েছে। পরনে সদ্য-কাচা শাড়ি, তার উপর ফিমেল কুর্তা। বাকী কিট্স্, অর্থাৎ জামা-কাপড়-চাদর-কম্বল সযত্নে পাট করে প্রত্যেকের পায়ের কাছে সাজানো, তার পাশে ঝকঝকে করে মাজা অ্যালুমিনিয়মের থালা-বাটি। সুপারের 'ফাইল'-এ খোঁপা বা বিনুনি বাঁধা নিষিদ্ধ ; মাথায় কাপড় দেবারও হুকুম নেই। তাই বলে রুক্ষ মাথায় থাকা চলবে না। সরকারী খরচে আয়না-চিরুনি এবং কিছুটা নারকেলের তেল সরবরাহ করা হয়। তার সদ্ব্যবহারে কোনো ত্রুটি হয় নি। গত কয়েকদিনের বরাদ্দ থেকে বাঁচিয়ে তেলের ব্যবহারটা বরং একটু অতিরিক্তই বলা চলে। মেট্রন বার বার করে শাসিয়ে দিয়েছেন, বড়সাহেব যখন সামনে দিয়ে যাবেন, সবাই যেন মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সেইটাই নিয়ম। নালিশ থাকলে তেমনি মাথা নীচু করে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে জানাতে হবে। চোখ তুলে তাকানো বেয়াদপি।

সপারিষদ অভিলাষবাবু সবে মাত্র লম্বা 'ফাইল'-এর এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন, মেট্রনের বিচিত্র উচ্চারণের সামরিক বুলি—'স্কোয়াড, অ্যাটেনশন' তখনো বাতাসে মিলিয়ে যায় নি—হঠাৎ এক বিপর্যয় কাণ্ড! কোথায় গেল 'ফাইল' আর কাপড়-চোপড় থালা-বাটির থাক! সব ভেঙে উল্টে দিয়ে নারী-বাহিনীর প্রায় সবটা সক্রন্দনে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাঁর পায়ের ওপর। সকলে যে সে-পর্যন্ত পেঁাছতে পারল না, তার কারণ এ নয় যে, তাদের তরফে চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল। তার কারণ, সুপার যত বড় লোকই হোন, তাঁর পায়ের সংখ্যা মাত্র দুই, এবং সেই দুটি চরণের পক্ষে একসঙ্গে শত হস্তের কবলে পড়া কোনোমতেই সম্ভব ছিল না।

চীফ-হেড্ওয়ার্ডারের গর্জন এবং মেট্রন ও তার সহকারিণীদের সবল হস্তক্ষেপে ভূলুণ্ঠিতা বন্দিনীদের বহু কষ্টে টেনে তোলা হলো। তারও বেশ কিছুক্ষণ পরে জানা গেল, এই সমবেত আবেদনের সুর ও ভাষা আলাদা হলেও বিষয় এক—সবাইকে অবিলম্বে যার যার 'দেশের জেল'-এ পাঠিয়ে দেওয়া হোক। অভিলাষবাবুও সেই অনুমান করেছিলেন, এবং একে একে প্রশ্ন করে কারণ যেটা জানলেন, তাও তাঁর কাছে নতুন নয়। জেলে এলেও ঘর-সংসারের পাট তো আর শেষ করে দিয়ে আসে নি। সেখানে কেউ ফেলে এসেছে পাঁচ বছরের কচি বাচ্চা, কারো বা রয়ে গেছে বয়স্থা মেয়ে, রুগ্ন স্বামী, কিংবা বৃদ্ধ বাপ-মা। ওখানে থাকতে মাসান্তে কিংবা পক্ষান্তে একবার দেখা হতো, লোহার জালে-ঘেরা গরাদের ফাঁক দিয়ে কথাবার্তাও হতো দুচারটা। এতদূরে আর সে সম্ভাবনা রইল না। আসবে কেমন করে? বুড়ো, কচি এবং মেয়েমানুষ-গুলোকে নিয়ে আসবে কে? সবচেয়ে বড় কথা, সে সঙ্গতি কই? বাড়ির সমর্থ পুরুষদের সে সময়ই বা কোথায়? সকলকেই উদয়াস্ত খেটে খেতে হয়, একদল পোষ্যকে খাওয়াতে হয়।

কোণের দিকে একটি কমবয়সী মেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

তার 'কারণ'টা একটু অন্য ধরনের। মুখ ফুটে বলতে চায় না। দু-তিনবার জিজ্ঞাসার পর মেট্রনকে জানাল চুপি চুপি। মেদিনীপুর থেকে এসেছে; জাতে বাউরী। মরদটি তার লোক ভালো। তাহলেও পুরুষমানুষ, তায় জোয়ান বয়স। দূরের বৌকে একদিন মন থেকেও দূর করে দেবে না, কে বলতে পারে? একদিন নয়, দুদিন নয়, তিন বছর! তারপর ফিরে গিয়ে দেখবে, তার জায়গা আর-একজন এসে দখল করে বসেছে।

—তাই যদি করে, ওখানকার জেলে বসেই বা ঠেকাতে কেমন করে? প্রশ্ন করলেন অভিলাষবাবু, যদিও এর উত্তরটা তিনি জানেন। মেয়েটি জবাব দিল না। হয়তো লজ্জায়, কিংবা গুছিয়ে বলার মত ভাষা খুঁজে পেল না। বলতে পারল না, ঘরের সঙ্গে মানুষের যে বন্ধন, শ্রীঘরে আসবার পর সেটা আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে। বিশেষ করে, সে মানুষ যখন মেয়েমানুষ, ঘর তার দিক থেকে বড় তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবু মাঝে মাঝে ও-তরফের একটুখানি চোখের দেখা, এবং এ-তরফের দু-এক ফোঁটা চোখের জল সে বন্ধনকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। দীর্ঘ দিনের অদর্শন ও অসংযোগ সেখানে দ্রুত ছেদ টেনে দিতে সহায়তা করে। মেয়েটি আরো বলতে পারত—এই দুর্ভাগা দেশে, বিশেষ করে, সমাজের যে-স্তর থেকে ওরা এসেছে (জেনানা-ফাটকে তাদের সংখ্যাই বেশি), স্ত্রী নামক পণ্যটি বড় সুলভ। ঘাটতি-পূরণে দেরি হয় না। রাজসিংহাসনের মত পুরুষের হৃদয় নামক আসনটিও বেশি দিন খালি থাকতে পারে না। রাখতে চাইলেও সংসার তার নানা প্রয়োজন নিয়ে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। সুতরাং একজন চোখের আড়ালে চলে গেলে, আরেকজন এসে তার জায়গা জুড়ে বসবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? মেয়েদের জীবনে এই 'জায়গা'টাই আসল। সেটি যদি চলে যায়, ফিরে গিয়ে পরিচিত গৃহকোণের সেই আশ্রয়টুকু না জোটে, তাহলে কোন্ কাজে লাগবে এই দূর কারাগার থেকে বয়ে নেওয়া তার কারিগরি বিদ্যার বোঝা?

অভিলাষবাবু এই কথাগুলোই ক'দিন ধরে মনে মনে নাড়া-চাড়া করে দেখলেন। তারপর গাঁটের পয়সা খরচ করে উঠলেন গিয়ে লালদীঘির উত্তর পারে। বড়কর্তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এরা কয়েদী হলেও মেয়ে, এদের কাছে সামনের চেয়ে পিছনের টান বড়, আকাশ-বাতাসের চেয়েও বেশি সত্য মাটি। সেখান থেকে উপড়ে এনে যেখানে-সেখানে বসিয়ে দিলেই বাঁচবে এবং বাড়তে থাকবে, সে আশা করা যায় না। না, না, এ সেন্টিমেণ্টের কথা নয় (যদিও মেয়েদের বেলায় সে বস্তুটির দাম অনেক), এর প্র্যাক্‌টিকাল, অর্থাৎ, বাস্তব দিকটাই বড়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এদের ভবিষ্যৎ, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এদের জড়ো করা হচ্ছে, সেই রিহ্যাবিলিটেশনের প্রশ্ন। অর্থাৎ, কাজ-কর্ম না হয় শেখানো গেল। তারপর?

বক্তব্যটাকে আরো বিশদ করবার চেষ্টা করেছিলেন অভিলাষ-বাবু। বলেছিলেন, পুরুষ-কয়েদীর কথা আলাদা। তাদের আমরা কিছু একটা শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করি। তারপর মেয়াদ ফুরোলে গেটের বাইরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। একটা রেলের পাস আর কিছু পয়সা হাতে দিয়ে বলি, চরে খাওগে। তারপর সে কী করে, কোথায় যায়, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মেয়ে-গুলোর বেলায় তো তা বলা যায় না। পরের ভাবনাও ভাবতে হয়। পুরুষগুলো যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতে পারে। রাত কাটাবার জন্যে মাথার ওপর যা হোক একটা আচ্ছাদনই যথেষ্ট। গাছতলাতেও বাধা নেই। কিন্তু এদের বেলায় বিধাতা সে সুবিধে দেন নি। কাজেই, বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম প্রয়োজন একটি নিরাপদ আশ্রয়। নিজের ঘরের চেয়ে বাঞ্ছনীয় আশ্রয় আর কী আছে একটি মেয়ের জীবনে? আমরা যা কিছু করবো, সব সেইদিকে চেয়ে। চেষ্টা করবো, জেলে এলেও স্বামী-পুত্র, বাপ-মা-ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজনের সংস্পর্শ থেকে সে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে, তাদের কাছে ফিরে যাবার পথে কোনোরকম বাধা-সৃষ্টি না হয়।

এই নতুন ব্যবস্থায় যে তা-ই হতে চলেছে, অন্য কেউ হলে

উপরওয়ালাদের দরবারে সে কথাটা হয়তো একটু ঘুরিয়ে বলত। কিন্তু অভিলাষবাবুর ধরনটা চিরকালই খোলাখুলি, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্লাণ্ট্। বলা বাহুল্য, কর্তারা সেটা মোটেই পছন্দ করেন নি। একজন মাঝারিগোছের মুরব্বি ওঁর মতামত সরাসরি অগ্রাহ্য না কবলেও স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে বর্তমান আদেশই বলবৎ থাকবে। বলেছিলেন, আরে মশাই, পুরো এক বছর লেখালেখির পর ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট টাকা দিয়েছে। এখন যদি বলি, দরকার নেই, তাদের কাছে মুখরক্ষা হয় কেমন করে?

এ হেন মোক্ষম যুক্তিও অভিলাষবাবুকে নিরস্ত করতে পারে নি। বিষয়টাকে আরো জোরদার করবার জন্যে বক্তব্যগুলো লিখিত-ভাবে পেশ করতে মনস্থ করেছেন। একটা খসড়াও করে ফেলেছেন। আমার প্রয়োজন সেইখানে। কয়েকটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার কলম তো চিনি, স্যার। একটু ছোঁয়া লাগিয়ে দিন।

বললাম, সে কলম বদলে গেছে, অভিলাষবাবু। এর ছোঁয়ায় আপনার কাজ হবে না। বরং উল্টো ফল ফলতে পারে। তাছাড়া, বুড়ো বয়সে সাধ করে কর্তাদের বিষ-নজরে পড়তে চাইছেন কেন?

—আপনিও এই কথা বলছেন!

—হ্যাঁ; নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

অভিলাষবাবু স্পষ্টতঃ নিরাশ হলেন। কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চীফ হেড্ওয়ার্ডার ঘরে ঢুকে সেলাম ঠুকে জানাল, জেনানা-ফাটকের 'ফাইল' রেডি।

—উঠিয়ে দাও। আজ আর সময় হবে না—

'চীফ'-এর পিছনে মেট্রনকেও দেখা গেল। তার দিকে চেয়ে বললেন, তোমাদের নালিশ মানে তো ঐ একটি। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ও ছাড়া আর কারো কিছু আছে নাকি?

—একটি মেয়ে বলছিল, তার কি একটা জরুরী নালিশ আছে।

—এখানে নিয়ে এসো।

উঠবার আয়োজন করছিলাম। দরজার দিকে নজর পড়তে আর ওঠা হলো না। অজ্ঞাতসারে মুখ থেকে বেরিয়ে এল—কুসুম! মেট্রনের পিছনে যে মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ ভাবে ঘরে এসে ঢুকল, সে কোনো জবাব দিল না। মেট্রনকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। সহজ বিনীত সুরে বলল, আপনি ভালো আছেন?

আমি জবাব দেবার আগেই অভিলাষবাবু হাত বাড়িয়ে তার টিকেটখানা নিতে নিতে বললেন, ওঁর সময় থেকেই আছ বুঝি এখানে?

কুসুম মৃদু হেসে বলল, না; মাঝখানে কিছুদিন বাইরে ছিলাম।

—আবার এলে যে!—এ প্রশ্ন আমার। বিস্ময়ের ভাবটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

—আসতে হলো। আঁচলের কোণটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে তেমনি হাসি মুখেই বলল কুসুম, যেন এই আসাটা নেহাৎ বেড়াতে আসার মত।

—ওখানে থাকতে পারলে না বুঝি?

—কই আর পারলাম?

—লেডি ডাক্তার রাখলেন না?

—তিনি রাখতে চেয়েছিলেন, আমারই থাকা হল না।

—কী কেস্‌-এ এলে?

জবাব দিলেন অভিলাষবাবু—কেস্‌টি তো ভালোই দেখছি। একেবারে রাজসিক ব্যাপার। মার্ডার। আগে এসেছিলে কোন্‌ কেস্‌-এ?

—'সেটাও খুন'—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, এবং তার মধ্যে দ্বিধা বা সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র নেই। 'তবে নিজে হাতে করি নি, জড়িয়ে পড়েছিলাম। উনি সব জানেন।' চোখের ইঙ্গিতে আমাকে দেখিয়ে দিল।

—এবার বুঝি নিজেই হাত লাগিয়েছ? হালকা সুরে বললেন

অভিলাষবাবু। বহুদিনের পুরনো প্রবীণ জেল-অফিসার। এই জাতীয় খুন-খারাপি ওঁর কাছে জল-ভাত। আমারও তাই। কিন্তু কুসুমের মুখ থেকে এবার যে জবাব এল, শুনে এবং তার চোখের দিকে চেয়ে আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম। এতক্ষণের সেই তরল সুর নয়। মুখের সে হাসি হাসি ভাবটাও সহসা কোথায় মিলিয়ে গেল। দু চোখে আগুন ছড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চাপা কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, এবার নিজের হাতেই সাধ মিটিয়ে নিয়েছি।'

বলতে বলতে চোখ বুজল, গভীর আরামে, পরম তৃপ্তিতে আপনা হতেই যেমন করে ধীরে ধীরে নেমে আসে চোখের পাতা।

এই জেলেই কুসুমের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। সে দিনটা এখনো মনে আছে। ভারী মেয়াদ বলে কোন্ একটা ছোট জেল থেকে চালান হয়ে এসেছিল সেণ্ট্রাল জেলে। নতুন আমদানী। তাই আমার অফিসে আনতে হয়েছিল, জেলের ভাষায় যাকে বলে 'ভেরিফিকেশনে'র উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ জামা-কাপড় ইত্যাদি ওয়ারেণ্টে যা লেখা আছে তাতে কোনো ভুল নেই, সুপারের সামনে এই তথ্যটি কবুল করিয়ে নেবার জন্যে। সকলের বেলাতেই সেই নিয়ম।

আমি মাথা নিচু করে কি লিখছিলাম। আচম্‌কা নারীকণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসি শুনে চোখ তুললাম। হাসিটা শুধু প্রগল্‌ভ নয়, অনেকটা নির্লজ্জ। ও দাঁড়িয়েছিল আমার মুখোমুখী, খানিকটা দূরে, দরজার ঠিক সামনে। কোনো কারণে সেদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। আমার পিছনে দাঁড়িয়ে একটি কয়েদী বড় একখানা পাখা নিয়ে আমাকে হাওয়া করছিল। তার দিকে আঙুল তুলে মেট্রনকে উদ্দেশ করে কলকণ্ঠে বলে উঠল, 'মিন্সেটার কাণ্ড দেখুন, মাসিমা। পাখা-টাখা বন্ধ করে কী রকম চোখ করে তাকিয়ে আছে। গিলে খাবে নাকি? ও মা! একেবারে হুঁশ নেই!'...বলেই আবার সেই হাসি। মেট্রনের চাপা ধমক খেয়ে তার তোড়টা যেন আরো বেড়ে গেল। একঘর লোক। জেলর থেকে সিপাই, মেট

—কোনো পদই বাকী নেই। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। যে-কাজে ওকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেটা বন্ধ রেখেই তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হলো।

পাখা-চালানো কয়েদীটিকে মনে মনে বিশেষ দোষ দিতে পারি নি। কিছুক্ষণের জন্যে যদি তার বৈকল্য বা চিত্তবিক্ষেপ ঘটে থাকে, তার জন্যে দায়ী, যার দিকে তাকিয়ে সে 'হুঁশ' হারিয়েছিল তার প্রতি অঙ্গে সঞ্চরমাণ এক ধরনের অপর্যাপ্ত উদ্ধত যৌবন। কথাটা বোধহয় স্পষ্ট হলো না। যৌবন তো একটা বিশেষ বয়সে সব নারীদেহকেই আশ্রয় করে। কোথাও কোথাও তার উপ্‌চে-পড়া দুরন্ত বেগও দুর্লভ নয়। কিন্তু কুসুমের দেহে সেদিন যা দেখেছিলাম, তার মধ্যে এসব ছাড়িয়ে আরো কিছু ছিল, যা শুধু টানে না, টেনে নামায়। তার রেখায় রেখায় সর্বনাশের হাতছানি। অথচ, রূপ বলতে যা বোঝায়, অঙ্গের সুষমা ও সৌষ্ঠব, তা তার ছিল না।

বিধাতার চক্রান্তেই হোক কিংবা ইচ্ছা করেই হোক, কাউকে টেনে নামাতে হলে, নিজেকেও নামতে হয়। সে অলঙ্ঘ্য পরিণাম থেকে কুসুমও রক্ষা পায় নি। তার মায়ের বৃত্তি ছিল ধাইগিরি। বয়সকালে আরো কিছু করত, সেটা লোকচক্ষুর অন্তরালে। ওদের বাড়িটা (অর্থাৎ ছোট্ট একখানা চালাঘর এবং তার কোলে এক চিল্‌তে উঠোন) ছিল ছোট জেলা শহরের এক কোণে। মা ও মেয়ে মিলে সেখানে থাকত। বাবাকে কখনো দেখেছে কিনা, মনে পড়ে না। যখন ছোট ছিল, অনেক রাত্রে কোনোদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে অন্য দু-একজনকে দেখেছে, যারা তাকে বাবার মতই আদর করত। আরো একটু বড় হবার পর আর তাদের দেখতে পায় নি। তখন সে মায়ের সঙ্গে বেরোতে শুরু করেছে। মায়ের প্রকাশ্য ইচ্ছা বোধহয় ছিল তার নিজের বিদ্যায় মেয়েকে তালিম দেওয়া। তার সঙ্গে আর কোনো গোপন মতলব ছিল কিনা কে বলতে পারে? মেয়ের কিন্তু সেই 'আর কিছু'র দিকেই বেশি নজর। চারদিকের নানাবয়সী পুরুষের চোখে একটা বিশেষ দৃষ্টি এবং তার অর্থ তখন

সে বুঝতে শিখেছে।

কুসুমের নামকরণ কে করেছিল, জানবার উপায় নেই। শিশু বয়সে হয়তো তার সার্থকতা ছিল, যেমন সব শিশুরই থাকে। যৌবনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যখন দেখা গেল ফুল হয়ে ফোটার চেয়ে আগুন হয়ে জ্বলার দিকেই তার গতি, তখন যে-সব পতঙ্গের দল সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে শুধু একজনের কথা আমার জানবাব সুযোগ হয়েছিল। তার নাম অনাথ মল্লিক।

অনাথের চাকবি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে। পৈতৃক বাড়ি রয়েছে জেলা-শহর। অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল, বয়স তিরিশের কোঠায়। পাড়ার ব্যায়ামশালায় তৈরি সবল সুস্থ দেহ। বাপ-মা নেই। দুটি ভাই; দুজনেই চাকরি-সূত্রে প্রবাসী। একমাত্র স্ত্রী নিয়ে সংসার। সুন্দরী বলে তার খ্যাতি আছে। নাক-চোখ-রং—কোনোটার তুলনা নেই; তবে বড্ড রোগা গড়ন। তার উপরে, মাস পূর্ণ হবার আগেই প্রথম সন্তানটি নষ্ট হবার পর সূতিকায় ভুগে ভুগে গায়ে আর মাংস নেই। তার মধ্যে আবার মা হতে চলেছে।

আগের বারে কুসুমের মা-ই খালাস করেছিল। এবাব হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডের ডাক্তারকে বলা আছে। পুবনো ধাই অবশ্য সঙ্গে থাকবে। কিন্তু প্রসবের রাত্রে তাকে পাওয়া গেল না। বিকালেই দূরে কোথায় 'কল্'-এ বেরিয়ে গেছে। তার বদলে এল কুসুম। শুধু এল না, রয়ে গেল। কঙ্কালসার প্রসূতি এবং তাব ক্ষীণজীবী নবজাতকের ভার নিয়ে। ডাক্তারই ব্যবস্থা করে দিলেন। মেয়েটির সেবাপরায়ণ সুনিপুণ হাত দুটিই কেবল তাঁকে আকৃষ্ট করে থাকবে। বাকী অঙ্গের সর্বনাশা আকর্ষণ হয়তো প্রৌঢ় ভদ্রলোকের নজরে পড়ে নি।

তাঁর না পড়লেও পড়ল আরেকজনের। আগুনের স্পর্শেই আগুন জ্বলে উঠে। একদিকের অগ্নিস্রাবী যৌবন আরেকদিকের লালসা-বহ্নিকে উদ্দীপ্ত করে তুলল।

কদিন যেতে না যেতেই রূপহীনার কাছে হার হলো রূপসীর।

পতিগতপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীর পবিত্র আসন ছিনিয়ে নিয়ে গেল তারই স্বৈরিণী পরিচারিকা। দীর্ঘ দাম্পত্য-বন্ধন, শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিক আদর্শ, লোকলজ্জা, ভয়—কিছুই টিকল না। বহুদিনের অতৃপ্ত দীর্ঘ-সঞ্চিত ক্ষুধা, রুগ্না ক্ষীণাঙ্গীর শীতল সঙ্গ যা মেটাতে পারে নি, তৃপ্তি খুঁজতে গেল স্থূল মাংসপিণ্ডের উত্তপ্ত উত্তেজনায়।

মাস দুয়েকের মধ্যে এবারকার বাচ্চাটিও মায়ের কোল ছেড়ে চলে গেল। প্রসূতি তখনো চলতে ফিরতে পারে না, সবে উঠে বসে বিছানার উপর। সুতরাং ঝি-এর প্রয়োজন শেষ হলো না। তার চেয়ে বড় প্রয়োজন তখন দেখা দিয়েছে অন্য খানে।

একদিন গভীর রাত্রে মনিবের গাঢ় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে কুসুম বলল, এবার ঘরে যাও।

—কোন্ ঘরে! যেন বুঝতে পারে নি এমনি সুরে বলল অনাথ।

—কোন্ ঘরে আবার? তোমার বৌয়ের কাছে। একলা পড়ে আছে বেচারা।

—থাক; তোকে আর অত দরদ দেখাতে হবে না।

—না; সত্যি; যদি জানতে পারে?

—পারলই বা। জেনে করবেটা কী?

—বাঃ, তাড়িয়ে দেবে না আমাকে?

—সে তাড়াবার কে? আমি তোকে রেখে দেবো।

—তুমিই বা আর কদ্দিন রাখবে? আর একটু ভালো হলেই তো—

—তখনো তোকে থাকতে হবে। তোকে আমি কোনোদিন ছাড়বো না।

বলে, ওকে আরো কাছে টেনে নিল। কুসুম আর কথা বলল না। সেই বলিষ্ঠ নিবিড় বাহুবন্ধনে নিজেকে সঁপে দিয়ে চোখ বুজল। পুরুষের বাহুপাশে ধরা দেওয়া কুসুমের কাছে এই নতুন নয়। এর স্বাদ সে এর আগে আরো পেয়েছে। কিন্তু এই সবল পেষণের মধুর যন্ত্রণা এমন করে আর কোথাও উপভোগ করে নি। আজ হোক, কাল হোক, একদিন এখান থেকে চলে যেতে হবে, এ চিন্তা তার

কাছেও দুঃসহ। এই উত্তপ্ত আশ্রয়টুকু যদি চিরদিনের হত!

এর দিন কয়েক পরে অনাথ আফিস থেকে ফিরে চা খাচ্ছে। চাকর এসে জানাল, 'মা' তাকে ডাকছেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই স্ত্রীর ঘরে ঢুকে, মাঝে মাঝে যেমন করে, জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন আছ?

হৈমন্তী সে প্রশ্নের উত্তর দিল না, একটু উষ্মার সুরে বলল, কুসুমের আর দরকার নেই। এখনি বিদায় করে দাও।

কথাগুলোর মধ্যে যে উত্তাপ ছিল সেটা গায়ে না মেখে অনাথ বেশ সহজ ঠাণ্ডা সুরেই বলল, তার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি আগে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠো।

—না; ওকে আজই ছাড়িয়ে দিতে হবে।

ভিতরে যাই ঘটুক, মল্লিকের মুখে বা কথায় তখনো কোনো বিরক্তি বা উত্তেজনা প্রকাশ পেল না—'আজই কি করে দিই? মাইনে চুকিয়ে দিতে হবে তো। মাসের শেষ, অত টাকা কোথায়?'

দুহাতে দুগাছা বালা ছাড়া হৈমন্তীর দেহে তখন আর কোনো অলঙ্কার ছিল না। হঠাৎ তারই একটা খুলে নিয়ে স্বামীর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, এই নাও। এটা বিক্রী করলেই বোধহয় কুলিয়ে যাবে।

—মাথা খারাপ করো না হৈম—গম্ভীর ভর্ৎসনার সুরে এই ক'টি কথা বলেই অনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিল। স্ত্রীর চিৎকারে ফিরে দাঁড়াল। হৈমন্তী এতক্ষণ শুয়ে শুয়েই কথা বলছিল। অকস্মাৎ উঠে বসে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, ও যদি আর একটা রাতও এ বাড়িতে থাকে, আমি মাথা খুঁড়ে মরবো।

—তাই মর।

—কী বললে? আমি মরলে তোমার ভারী সুবিধে, পথের কাঁটা সরে যায়, না?

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল। অনাথ আর দাঁড়াল না।

কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে কুসুম আগাগোড়া সবটাই দেখল এবং শুনল।

তখন কিছু বলল না। সন্ধ্যার পর তার ছোট্ট পোঁটলাটা হাতে করে বাইরের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে বলল, আমি তা'হলে যাই, বাবু। মাইনের জন্যে তুমি ভেবো নি। মাস লাগলে মা এসে নিয়ে যাবে।

অনাথ প্রথমটা ওকে দেখতে পায় নি। নিবিষ্ট মনে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ চমকে উঠে বলল, কী বলছিস ? না, তোর যাওয়া হবে না।

—থেকে করবোডা কী ?

—কেন ?

কুসুম এক পলক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, ঘরে ঢুকতে মানা করে দেছে।

—ঢুকতে হবে না তার ঘরে। তুই,—তুই এমনি থাকবি। আমার কাছে থাকবি।

পরদিন থেকে শুরু হলো নিত্য বিসংবাদ। যখন তখন কথা-কাটাকাটি। ক্রমশঃ স্বামী স্ত্রী কারো মুখেই আর বল্‌গা রইল না। দুজনের মধ্যে যে শালীনতার আড়ালটুকু ছিল, তাও ঘুচে গেল। দীর্ঘকাল রোগে ভুগে পর পর দুটি সন্তান হারিয়ে হৈমন্তীর আগে থাকতেই মাথার ঠিক ছিল না। তারপর নিজের চোখের উপর সংসারের মধ্যে বসে স্বামীর এই শোচনীয় বিবর্তন! সংযম ও সহিষ্ণুতার শেষ বাঁধ ভেঙে পড়ল। ওষুধ ঢেলে ফেলে, ভাতের থালা উল্টে দেয়, পাড়ার কোনো গৃহিণী ইনিয়ে-বিনিয়ে সহানুভূতি জানাতে এলে কড়া কথা শোনাতে ছাড়ে না। পুরনো ঠাকুর আগেই চলে গিয়েছিল। নতুন যে-ই আসে, দুদিনও টেঁকে না। ফলে, সংসারের সব ভার আপনা থেকেই পড়ল গিয়ে কুসুমের হাতে। সে কদিন যাব যাব করলেও যেতে পারল না।

হৈমন্তীর মা নেই। বাপ থাকেন অনেক দূরে, দক্ষিণ বাংলার

কোনো দুর্গম গ্রামে। দু-পুরুষ-আগে একটা ছোটখাটো জমিদারি ছিল। ইদানীং প্রায় বিত্তহীন। সে প্রতাপ নেই, কিন্তু তার তাপটা রয়ে গেছে। হঠাৎ এক উড়ো চিঠি পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ছুটে এলেন। কুসুম-ঘটিত ব্যাপারটা বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়ে তাঁর কানে গিয়ে থাকবে। এসে যেটুকু দেখলেন, তাও কম নয়। তার উপরে মেয়ের শরীরের এই অবস্থা! অন্য কেউ হলে হয়তো মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করতেন। খুব সম্ভব ভূতপূর্ব জমিদারের উষ্ণ রক্ত সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। জামাতার সঙ্গে একবার দেখা করবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। সোজা গিয়ে হাজির হলেন থানায়।

পুলিস এসে অনাথের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই পেল না। রুগ্না স্ত্রীর উপর 'অপ্রেশান' বা অত্যাচারের অভিযোগ হৈমন্তী নিজেই অস্বীকার করল। বাবা বোঝাতে চাইলেন, ঐ রকম একটা সোমত্ত ঝিকে যে তাঁর মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাড়িতে পুষে রাখা হয়েছে, এইটাই তো সব চেয়ে বড় অত্যাচার। দারোগা হেসে চলে গেলেন।

জামাইকে অন্য কোনো উপায়ে টিট করা যায় কিনা, দু-একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে বসে সে বিষয়ে যখন পরামর্শ করছেন, তখন দেশ থেকে নিজেরই কোনো মামলা সংক্রান্ত জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁকেও হঠাৎ চলে যেতে হলো। মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন, ওদিকের ঝামেলা মিটলেই আবার আসবেন।

পুলিস কেস্ না নিলেও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান (শহরের একজন প্রবীণ উকিল) অনাথকে ডেকে উপদেশের ছলে খানিকটা সাবধান করে দিলেন। উড়ো চিঠি তাঁর হাতেও পড়ে থাকবে। অনাথ আগুন হয়ে ফিরল। শ্বশুরকে এবং মনিবকে তাতিয়ে তোলার ব্যাপারে সাক্ষাৎ ভাবে পাড়ার কয়েকটা ছেলে-ছোকরার হাত আছে, একথা সে জানত। কিন্তু তার পিছনে হৈমন্তী নেই, এটা সে মনে মনে মেনে নিতে পারল না। ঐ ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে

নিশ্চয়ই তার গোপন যোগাযোগ আছে। কেউ কেউ তার ওখানে আগে থেকেই আসে যায়। ওকে দাদা এবং সেই সুবাদে হৈমন্তীকে বৌদি বলে ডাকে। হয়তো তাদের কাউকেই এই সব কাজে লাগানো হচ্ছে। অসুবিধা কিছুই নেই। মেয়েমানুষের যেটা প্রকৃতিদত্ত মূলধন, চোখের জল, তার খানিকটা খরচ করলেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে 'ঠাকুরপোদের' শিভালরি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কিন্তু আর নয়। তারই ঘরে বসে তার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র, এখানে সেখানে অপদস্থ করবার অপচেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত চাকরি ধরে টানাটানি সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। আজই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে।

চেয়ারম্যানের কাছ থেকে অনাথ যখন ছাড়া পেল, তার আগেই সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে। অনেকখানি পথ। বাড়ি ফিরতে রাত হলো। ঠিক শহর নয়, শহরতলী। পাশেই রেল লাইন। ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। এমনিতেই লোক চলাচল কম। এখন রাস্তা একেবারে খালি। প্রায় বাড়িতে আলোও নিভে গেছে। হৈমন্তী তখনো জেগে। তার ঘরের দরজা আধ-ভেজানো। ভিতরে আলো জ্বলছে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কী একটা লিখছিল। বাইরে থেকেই নজরে পড়ে। অনাথ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই ধমকের সুরে বলল, চেয়ারম্যানকে কী লিখেছ আমার বিরুদ্ধে?

হৈমন্তী ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীর দিকে একটা অবজ্ঞা-কুঞ্চিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার লেখায় মন দিয়ে বলল, কে চেয়ারম্যান?

—ন্যাকামো করো না। চেয়ারম্যান কে, তা তুমি জানো। তাকে চিঠি লিখবার মত সাহস তোমার এল কোত্থেকে?

—আমার দায় পড়েছে তাকে চিঠি লিখতে।

—না লিখলে, আমার সংসারের খবর তার কানে যায় কেমন করে?

—'সংসারের খবর' মানে? এবার উঠে বসল হৈমন্তী। ঐ মাগীটাকে নিয়ে যে ঢলাঢলি চালিয়েছ সে খবর কার জানতে বাকী

আছে, শুনি ?

—ইতরের মত মুখ খারাপ করো না—গর্জে উঠল অনাথ।

হৈমন্তীর মুখেও পালটা গর্জন—ইতর আমি, না তুমি ? তুমি বলে এখনো লোকের কাছে মুখ দেখাও। অন্য কেউ হলে—তীব্র উত্তেজনায় বাক্যটা আর বলা হলো না।

অনাথ কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বলল, আমার যা খুশি, তাই করবো। তোমার না পোষায় চলে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

হৈমন্তী তখনো হাঁপাচ্ছিল। কোনোরকমে দম নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, বেশ, তাই যাচ্ছি। তার আগে, অ্যাদ্দিন যা করি নি, তাই করবো। পাড়ার দশজনকে ডেকে—

—খবরদার! রুখে উঠল অনাথ। কারো কাছে যাবে তো তোমারি একদিন কি আমারি একদিন।

—আমি যাবো। কী করবে তুমি ?

দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই অনাথ একটা বাহু ধরে এক ঝটকায় তাকে খাটের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। হৈমন্তীর শীর্ণ দুর্বল দেহ প্রথমে খাটের পাশে এবং তারপর গড়িয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ল। আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

তীব্র বিহ্বল দৃষ্টি মেলে অনাথ শুধু তাকিয়ে রইল স্ত্রীর দিকে। ঐ সঙ্গে সেও যেন অসাড় হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, কুসুম এসে ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে। পরক্ষণেই কানে গেল তার ত্রস্ত কণ্ঠ—ঠাকুর, শীগগির এক বালতি জল নিয়ে এসো।

জল এল। কোলের উপর মাথা রেখে কুসুমই ঘটির পর ঘটি জল ঢেলে চলল। কিছুক্ষণ পরে কী মনে হতে নাকের নীচে হাত দিল, সেই হাতটাই রাখল একবার বুকের বাঁ দিকে, বাঁ হাতের কাব্জিটাও টেনে নিয়ে দেখল। তারপর চোখ তুলে মনিবের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ঠোঁটে একটা বিকৃত ভঙ্গী করে নীরবে মাথা নাড়ল।

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে বলতে শুনেছি, 'মায়ের কোলে যখন সন্তান আসে, যম তার শিয়রে ওত পেতে বসে থাকে। তাই যদি হয়, সব ক্ষেত্রেই সে শূন্য হাতে ফিবে যাবে, এতটা আশা করা যায় না। যেখানে যমে-মানুষে টানাটানি, কিছু ভাগ সে দেবতাটির হাতে পড়বেই। সুতরাং মায়ের (এবং ইদানীং তার নিজেরও) পেশার দৌলতে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় কুসুমেব একাধিকবাব ঘটে গেছে। হৈমন্তীর নিমীলিত চোখদুটি যে আর খুলবে না, এটা সে নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিল। তবু, সম্ভবতঃ মনিবকে প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দিলে হয় না ?

কথাটা কানে যেতেই অনাথ হঠাৎ চমকে উঠল। খানিকটা ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখল। তারপর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কুসুম আর কিছু বলল না। হৈমন্তীর মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে কাঁধ আর হাঁটুর নীচে হাত দিয়ে শীর্ণ, হালকা দেহখানা অনায়াসে তুলে নিয়ে খাটের উপর শুইয়ে দিল। পায়ের কাছে গুটিয়ে রাখা চাদরটা ধীরে ধীরে গলা পর্যন্ত টেনে এনে মুখটা ঢাকতে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত সেইদিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। তারপর তাড়াতাড়ি ঢাকা দিয়ে দিল।

আমার পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ করে পাঠিকাদের ওষ্ঠাগ্রে একটি সন্দিগ্ধ হাসির কুঞ্চন আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা ভাবছেন, এই শেষের ছত্রদুটি আমার রচনা। সন্দেহটা অযৌক্তিক নয়। তবু বলছি, না, এ আমার কল্পনা নয়, কুসুমই বলেছিল, এবং সম্ভবতঃ আমার মুখে অজানতে ফুটে-ওঠা কোনো বিস্ময়-চিহ্ন লক্ষ্য করে একটা সকুণ্ঠ কৈফিয়তও জুড়ে দিয়েছিল ঐ সঙ্গে। তার নিজের ভাষায় বলেছিল, বেঁচে থাকতে একটিবারও সে আমার দিকে ভালো চোখে তাকায় নি, একটা কথাও কোনোদিন ভালো-ভাবে বলে নি আমার সঙ্গে। তাই মরবার পর তার আসল

মুখখানা দেখতে ইচ্ছা হলো। দেখলাম, সত্যিই রূপ ছিল মেয়েটার। কিন্তু কি কাজে লাগল সে রূপ!

এইটুকু বলেই কুসুম সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে কাজের কথায় চলে গিয়েছিল। পলকের তরে তাকাতে গিয়ে একটি মৃদু নিশ্বাস বেরিয়ে এসে যদি সেই মৃত্যুশীতল মুখখানাকে স্পর্শ করে থাকে, সে নিজেই জানতে পারে নি। জানলেও সে তথ্যটুকু আমাব কাছে অনুক্ত রয়ে গেছে। এ দৌর্বল্য যে তার পক্ষে একেবারে বেমানান, তার চরিত্রের এবং পূর্বাপর আচরণেব সঙ্গে সঙ্গতিহীন, এ সহজ কথাটা আমি যেমন বুঝি, তারও না বোঝবার কথা নয়। তাকে আর যা-ই বলা যাক, নির্বোধ বলা চলে না।

অনাথ সেই যে গেল আর দেখা নেই। গেলই বা কোথায়? এদিকে রাত বেড়ে চলেছে। একটা দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ লাগে? তার জের অত সহজে মেটে না। সবচেয়ে বড় পর্বটাই যে বাকী। তার আয়োজন এখন থেকেই শুরু করা দরকার। কুসুম উঠে পড়ল। হঠাৎ মনে হলো, সে কে? তার এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কী প্রয়োজন? তার কাজ তো ফুরিয়ে গেছে। অনেকদিন আগেই গেছে। তবু এতদিন এখানে পড়ে থাকবার একটা অজুহাত ছিল। লোকের কাছে একটা পরিচয় ছিল। ঝি, অসুস্থ গৃহিণীর সেবাদাসী। আজ তাও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এইটাই কি তার একমাত্র পরিচয়? এর অন্তরালে—ভাবতে গিয়ে কুসুমের গোপন মনে এক ঝলক পুলক ছড়িয়ে গেল। আজ সব বাধা ঘুচে গেছে। এত শীঘ্র যে ঘুচবে, কে ভেবেছিল?

পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা হৈমন্তীর দেহটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা কোন্ অজানা ভয়ের কালো ছায়া ধীরে ধীরে উঠে এসে তার সমস্ত বুকটা গ্রাস করে ফেলল। ঐ মৃত্যুর সঙ্গে কোথায় যেন তারও একটা যোগ আছে। তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিল। এই অশুভ চিন্তাটাকে

মন থেকে জোর করে ঝেড়ে ফেলতে চাইল—না না, এসব কী ভাবছে সে? ওর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? এ মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। তাই কী? অনাথ কি তাকে ঠেলে ফেলে দেয় নি? হ্যাঁ, সে তো শুধু ওকে বাধা দেবার জন্যে। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে গিয়ে লোকজন ডেকে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে না বসে এই জন্যে। মেরে ফেলতে সে চায় নি। মনে মনে সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না। পাড়ার লোকগুলো তো এমনিতেই অনাথের বিরুদ্ধে মুখিয়ে আছে। এ রকম একটা সুযোগ পেলে তার উপর একহাত নেবার চেষ্টা না করে ছাড়ত না। সেই কথা ভেবে নিতান্ত বাধ্য হয়েই সে বৌয়ের গায়ে হাত তুলেছিল। তার ফল যে এমন সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াবে কে ভাবতে পেরেছিল?

কিন্তু—এর উল্টো দিকটাও ভাবল কুসুম—এ-কথা যদি লোকে বিশ্বাস না করে? যদি বলে, অনাথ তার স্ত্রীকে ইচ্ছা করে খুন করেছে? তাকেও এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলা কঠিন নয়। বাবুর সঙ্গে তার গোপন সম্পর্ক জানাজানি হতে বাকী নেই। হৈমন্তীর বাবা এসে একবার এই নিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছিল। কিছু অবশ্য করতে পারে নি। এবার এই মৃত্যুটাকেই হয়তো কাজে লাগিয়ে দেবে। পাড়ার ছোকরাগুলো বলে বসবে—ঐ বৌটাই ছিল ওদের পথের কাঁটা। দুজনে মিলে তাকে রাতারাতি শেষ করে দিয়েছে।

কুসুম এবার নিজের দিকটা আলাদা করে ভাবতে চেষ্টা করল। সত্যি সত্যি সে তো কোনো দোষ করে নি। তবে তার ভয় কিসের? সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, সংসারে কটা সত্যি শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকে? বেশির ভাগই তো মিথ্যার জয়জয়কার। তার কঠোর দৃষ্টান্ত এইটুকু বয়সেই কতবার তার চোখে পড়েছে। নিজেও সে ঘা কম খায় নি। সুতরাং আর নয়; এবার এখান থেকে তার বিদায়ের পালা। লোকজন এসে পড়বার আগেই তাকে চলে যেতে হবে। এখন এখানে থেকে সে করবেই বা কী? তাই বলে, বাবুকে না বলে সে পালিয়ে যেতে চায় না। দেখা করে বলে-কয়েই যাবে।

অনাথ বাড়িতেই ছিল। কুসুমকে বেশি খুঁজতে হলো না। ওদিকের ঘরে ও বারান্দায় না পেয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দেখল, সে অন্ধকারে চুপ করে বসে আছে। মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, রাত যে কাবার হয়ে এল, বাবু। এখন কি হাত-পা কোলে করে বসে থাকার সময়?

অনাথ সাড়া দিল না, যেমন ছিল, তেমনই নিশ্চল হয়ে রইল। কুসুম আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই, যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল। মুখ তুলে বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

—কোথায় আবার? বাড়ি।

—এই দুঃসময়ে তুইও আমাকে ছেড়ে যাবি কুসুম?

সহসা উঠে এসে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, জানিস তো, তুই ছাড়া আপন বলতে আমার আর কেউ নেই। তার ওপরে চারদিকে শত্রু। তোকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না। বলে আরো খানিকটা কাছে টেনে নিল।

এ আকর্ষণ কুসুমের কাছে দুর্নিবার। তবু বলল, আমি মেয়েমানুষ; আমাকে দিয়ে আর কতটুকুন কি হবে? তাছাড়া পাড়ার পাঁচজন এসে—

—কেউ আসবে না। মাঝখানে বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল অনাথ।

—বাঃ, ঘাটে নিতে লোকজন লাগবে না?

অনাথ এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে শুধু বলল, একমাত্র তোকেই আমার দরকার, কুসুম, আর কাউকে চাই না।

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে কুসুম বিস্মিত দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে রইল। অনাথ তার বাহু ধরে জানলার ধারে নিয়ে গিয়ে একটা টুলের উপর বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসল তার মুখোমুখি। আলো জ্বালা হলো না। তার প্রয়োজনও ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের রাত। দূরে গাছপালার উপর থেকে হেলে-পড়া শীর্ণ চাঁদ জানলাপথে যে ক'টি চূর্ণ রশ্মি পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাতেই তারা পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। কুসুমের একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে তার

চোখে চোখ রেখে অনাথ তার পরিকল্পনার খানিকটা আভাস দিতেই সে চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল কয়েকটা ভীতিবিহ্বল শব্দ—'না না, এ আমি পারবো না।' হাতটাও ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। অনাথ ছাড়ল না। জোর করে তাকে টেনে এনে নিজের পাশটিতে বসিয়ে দিল। এক হাতে তার দেহ বেষ্টন করে আর এক হাতে চিবুকটা তুলে ধরে বলল, তোর কোনো ভয় নেই, কুসুম। এতটুকু বিপদের আশঙ্কা থাকলে তোকে আমি এর মধ্যে টানতে পারি? তাছাড়া, আমি তো তোর সঙ্গেই থাকবো।·· চল। আর দেরি করলে লোকজন উঠে পড়বে।

কুসুমের কাছ থেকে তখনো কোনো সাড়া না পেয়ে অনাথ তাকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ক্ষুব্ধ উদাস সুরে বলল, থাক, তোর যখন ইচ্ছে নেই, আমি জোর করতে চাই না। মনে করেছিলাম, এই ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলে কাল সকালেই আমরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবো। তোকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধবো, এ সাধ কি আমার আজকের? কবে, কেমন করে তা সফল হবে ভেবে পাই নি। ভগবানকে কত ডেকেছি! কে জানত এত শীগ্‌গির সাড়া পাবো, এমন করে রাতারাতি আমার সৌভাগ্যের দ্বার খুলে যাবে। কিন্তু ভাগ্যদেবী যখন মুখ তুলে চাইলেন, যাকে ঘিরে এত আশা, এত স্বপ্ন, সে রইল মুখ ফিরিয়ে।··যাক, তোকে আর আটকে রাখবো না। বাড়ি যেতে চেয়েছিস, তাই যা। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে কুসুমের বুকের ভেতরটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল। বলল, শোনো।

অনাথ ফিরে দাঁড়াল। কুসুম উঠে এসে ওর একান্ত কাছটিতে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, ঠাকুরটা যে সব দেখে ফেলেছে।

অনাথ যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। চোখের তারায় ফুটে উঠল ত্রাসের ছায়া। এই অবাঞ্ছিত লোকটাকে সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু কুসুম ভোলে নি। পুরুষের

চেয়ে স্ত্রী চিরদিনই বেশি হুঁশিয়ার। পুরুষ চলে ভাবাবেগে, ঝোঁকের বশে, তার দৃষ্টি শুধু সুমুখ পানে। স্ত্রীজাতি কোনো অবস্থাতেই তার বাস্তব বুদ্ধি হারায় না। ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে পা বাড়ায় না।

ঠাকুরের খোঁজ করা হলো। ঘরে বাইরে কোথাও তার পাত্তা নেই। কুসুম এদিক-ওদিক খানিকটা তাকিয়ে ঘুরে এসে বলল, চলে গেছে।

—চলে গেছে!

—হ্যাঁ, জামা-কাপড় কিচ্ছু নেই।

শুনে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলো অনাথ। বলল, ভয় পেয়ে পালিয়েছে। তার মানে, ওর দিক থেকে কোনো আশঙ্কা নেই। ভালোই হলো। না পালালেই বরং মুশকিল ছিল। · চল, আমরাও বেরিয়ে পড়ি। রাত আর নেই। বলে, কুসুমের কাঁধের উপর হাত রেখে হৈমন্তীর ঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

কুসুম তখনো দ্বিধাগ্রস্ত। কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না। চলছে আর ভাবছে, কী করবো। 'একটা পা সামনে ফেলছি তো আর একটা পা পেছন থেকে টানছে।'

ছেলেমানুষ নয় যে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারছে না। তার উপরে, যে ঘরে, যে সব পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ, সংসারের আসল রূপটা আগেই অনেকখানি চেনা হয়ে গেছে। সেই রাত্রে অনাথ মল্লিক তাকে দিয়ে যা করাতে চাইছিল, তার মধ্যে ঝুঁকি অনেক। সহজ বুদ্ধি দিয়েই তা সে বুঝতে পেরেছিল। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ কতখানি বিপদসঙ্কুল, সে সম্বন্ধেও সে সচেতন ছিল না, তা নয়। তবু কী ছিল ঐ লোকটার স্পর্শে, চোখে এবং কথায়, বিশেষ করে চোখদুটিতে, (একথা সে অনেকবার বলেছে) যার কাছে নিজেকে ধরে রাখা যায় না, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে, তীব্র স্রোতের মুখে অসহায় তৃণ-খণ্ডের মত সারা মন ভেসে যেতে চায়। আসন্ন ভবিষ্যতের যে রমণীয় চিত্র সে কিছুক্ষণ আগে চোখের উপর

তুলে ধরেছিল, তাও ওকে কম প্রলুব্ধ করে নি। তার মধ্যে একদিকে ছিল মদিরা, তার উদগ্র যৌবন যার জন্যে তৃষ্ণার্ত, আরেক দিকে ছিল স্নিগ্ধ বারি, যার স্পর্শে চির-গৃহলোলুপ নারীর শাশ্বত পিপাসা তৃপ্ত হয়।

এতগুলো প্রবল আকর্ষণ কুসুম সেদিন রোধ করতে পারে নি। তার বিধাতা তাকে যে সব বৃত্তি ও প্রবৃত্তি দিয়ে গড়েছিলেন, হয়তো তার মধ্যেই না-পারার বীজ নিহিত ছিল। তাই সব কিছু ছেড়ে, সব বিপদ মাথায় নিয়ে সেদিন অনাথের সঙ্গেই সে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেছিল।

অনাথ মল্লিকের বাড়ির পিছন দিকে রেললাইন। মাঝখানে কোনো বসতি নেই। একটা অযত্নরক্ষিত বাগান আর কিছু ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল। তার পাশ দিয়ে এক ফালি পায়ে চলার পথ রেল-পথের গায়ে গিয়ে পড়েছে। শহরের প্রথম ট্রেন আসে ভোর পাঁচটার কিছু আগে, মফস্বলের বেশির ভাগ লোক তখন বিছানায়। স্টেশন দূরে নয়; ঘন ঘন হুইসিল্ দিতে দিতে এগিয়ে যায়। সেদিনও তাই যাচ্ছিল। যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ির লোকেরা ভাবল, সিগন্যাল নামে নি। 'রেল-বাবুদের বোধহয় ঘুম ভাঙে নি'— মন্তব্য করলেন কে একজন।

ড্রাইভার ব্রেক কষেই নেমে পড়েছিল। এঞ্জিনের পিছনেই যে কামরা তাব তলায় একবার উঁকি মেরে বিরস মুখে মাথা নাড়তেই, ফায়ারম্যান পাশ থেকে প্রশ্ন করল, সাবাড়?

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার কথা বলল না। সঙ্গীর হাতে একটা হ্যাচ্‌কা টান দিয়ে তাড়াতাড়ি এঞ্জিনে উঠে স্টার্ট দিল। গাড়িটাকে ধীরে ধীরে কয়েক গজ পিছনে নিয়ে গিয়ে আবার থামিয়ে দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে বলল, একেবারে দু টুকরো হয়ে গেছে।

বিকৃত ওষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল একটা আপসোসসূচক শব্দ এবং তার সঙ্গে কিছুটা 'সোয়ের' (swear) বা 'শপথ'-জাতীয় বুলি, ওদের

রোষ বা বিরক্তি প্রকাশের প্রচলিত বাহন। এক্ষেত্রে তার লক্ষ্য বোধহয় সে নিজেই। কয়েক সেকেণ্ড আগে দেখতে পেলে এ দুর্ভোগটা এড়ানো যেত। কতক্ষণ এখানে বসে থাকতে হবে কে জানে ?

ফায়ারম্যানের বয়স বেশি নয়। এগিয়ে গিয়ে খণ্ডিত দেহটাকে ভালো করে ঠাহর করে বলল, মেয়েছেলে ! ড্রাইভার ঝাঁঝিয়ে উঠল, না ; মেয়েছেলে হবে কেন ? তোব মত একটা বুড়ো মদ্দ এসে লাইনেব ওপব শুয়ে পড়েছে !

ততক্ষণে যাত্রীবাও অনেকে নেমে এসে ভিড করেছে মৃতার চারদিকে। নানা মুখে নানা ধরনের মন্তব্য—'ঈস্, একেবারে পেটের ওপর দিয়ে চলে গেছে চাকাটা।" "আহা, কাদের ঘরের বৌ গো !' 'কাঁচা বয়স মেয়েটার !' 'বাড়ির লোকেবা হয়তো কিছুই জানে না।' 'পুলিসে খবর দেওয়া দরকার।'

হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। একে ঠেলে, ওকে সবিযে দিয়ে জনতা ফুঁড়ে এগিয়ে এল দুজন—একটি পুরুষ, অন্যটি স্ত্রীলোক। দুজনেই ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মৃতদেহের উপর। তারপর শুরু হলো গগনভেদী বিলাপ। পুরুষটি বলছে, 'এ তুমি কী করলে গো ? তোমার মনে এই ছিল, একদিনও তো জানতে পারি নি।' স্ত্রীলোকটি আর এক পরদা সুর চড়িয়ে বলছে, 'তোমার সোনার সংসার ফেলে কোথায় চললে দিদিমণি ? এতবড় সব্বোনাশ কেন করতে গেলে গো !'

গাড়িতে বোধহয় একটি লোকও ছিল না। ছেলে, বুড়ো, তরুণ, তরুণী সবাই এসে দাঁড়িয়েছে রেললাইনের চারদিক ঘিরে। স্তব্ধ হয়ে দেখছে এই মর্মন্তুদ শোকোচ্ছ্বাস। মেয়েরা ঘন ঘন চোখ মুছছে। পুরুষেরা কেউ কেউ ভাবছে, এই হতভাগ্য লোকটার জীবনে কত বড় শূন্য সে রেখে গেল, একটিবারও যদি জানতে পারত মেয়েটা, হয়তো এমন করে নিজেকে শেষ করে দিত না।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পিছন থেকে বেশ উঁচু, গম্ভীর গলার নির্দেশ

শোনা গেল, 'আপনারা সব সরে যান, আমাদের কাজ করতে দিন।' সমবেত দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বক্তার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ফালি মত পথ তৈরি হয়ে গেল। তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এলেন ইউনিফর্ম-ধারী পুলিস অফিসার, পেছনে দুজন অনুচর। মিনিট কয়েক মৃতদেহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথার কাছে যে পুরুষটি বসেছিল তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কে হন আপনার?'

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে উত্তর এল, 'আমার স্ত্রী।'

—'এটি কে?' পাশের স্ত্রীলোকটির দিকে আঙুল তুললেন পুলিস অফিসার।

—ও? ও আমাদের ঝি।

অনাথকে আরো ক'টি প্রশ্ন করা হলো, এবং তার থেকে জানা গেল, গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখে পাশে স্ত্রী নেই। প্রথমে মনে করেছিল, হয়তো বাথরুমে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরেও যখন ফিরল না, উঠে পড়ে খুঁজতে শুরু করল। বাথরুমের দরজা খোলা। ঘর, বারান্দা, উঠোন—সব ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। তখন স্ত্রীর নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগল। তাতেই বোধহয় ঝিয়ের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে-ও খানিকটা খোঁজাখুঁজি করল। বাড়ির বাইরে, বাগানে, রাস্তা পর্যন্ত ঘুরে এল দুজনে। পাওয়া গেল না। অনেকদিন রোগে ভুগে ভুগে ইদানীং মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির হুইসিল শুনলে বলত, 'রেল আমাকে ডাকছে।' কখনো বলত, 'কি মিষ্টি ডাক, শুনেছ?' হঠাৎ সেই কথা মনে পড়তেই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। বাগান পার হয়ে ছুটে এসে দেখে, যা ভয় করেছিল, তাই। রেলই ওকে ডেকে নিয়ে গেছে।…

বলে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল অনাথ মল্লিক। কুসুমও যেন তৈরি হয়ে ছিল, এমনি ভাবে সঙ্গে সঙ্গে সুর মেলাল।

ড্রাইভার স্বীকার করল, সে যখন দেখল লাইনের উপর সাদা-মত একটা কি পড়ে আছে, তখন একেবারে কাছে এসে গেছে। ব্রেক কষতে কষতে এঞ্জিনটা এগিয়ে গেল।

দারোগা এবার 'ঝি'-এর দিকে নজর দিলেন। প্রথমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন। তারপর ভিড় থেকে একটু তফাতে সরিয়ে নিয়ে মিনিট কয়েক জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। ফিরে এসে অনাথকে বললেন, 'আপনাদের দুজনকে একটু থানায় যেতে হবে।'

ঘটনাস্রোত এবার যে পথ ধরল, তার বিশদ বিবরণ কুসুমের কাছ থেকে পাবার কথা নয়। তার কাহিনী শুনবার পর সে সব তথ্য আমি ওদের মামলার 'রায়' থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। তার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। যেটুকু প্রাসঙ্গিক, সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

পলাতক 'ঠাকুর'কে তাদের দেশোয়ালী আড্ডা থেকে পুলিসই খুঁজে বের করেছিল। সে রাত্রে সে দূরে কোথাও যায় নি। অতবড় দুর্ঘটনার পর সম্ভাব্য পুলিসী হাঙ্গামার আশঙ্কা করে পাশের জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছিল। অপেক্ষা করছিল, অন্ধকারটা একটু পাতলা হলেই চলে যাবে। হঠাৎ দেখল, 'বাবু' আর কুসুম দুজনে ধরাধরি করে 'মাইজী'কে রেললাইনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা খনিকটা এগিয়ে যেতেই সে আর দাঁড়ায় নি। বেরিয়ে উল্টো দিক দিয়ে শহরের আরেক প্রান্তে একেবারে তাদের 'আড্ডা'য় গিয়ে উঠেছিল।

'দুর্ঘটনা'র সময় সে মনিব-বাড়িতে উপস্থিত ছিল, একথা 'ঠাকুর' অস্বীকার করে নি, এবং যা যা ঘটেছিল তার যথাযথ বর্ণনাই দিয়েছিল।

ময়না-তদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে সাক্ষীর উক্তির কোনো অসঙ্গতি দেখা যায় নি। মৃতার হার্টের অবস্থা আগে থাকতেই খারাপ ছিল, ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার ফলে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়। শরীরে কোনো প্রাক্-মৃত্যু আঘাত-চিহ্ন পাওয়া যায় নি। রেলের ক্ষতটা নিঃসন্দেহে 'পোস্ট-মর্টেম্' অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরবর্তী।

সরকারের তরফ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হলেও

দায়রা আদালত সেটা গ্রহণ করেন নি। প্রথম আসামী অনাথ মল্লিককে দোষী শাব্যস্ত করলেন দুটো অপরাধে—অসতর্ক ও হঠকারিতামূলক কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো, এবং তার প্রমাণ-লোপের অপচেষ্টা। দ্বিতীয় আসামী কুসুম দাসীর বিরুদ্ধে শুধু পরবর্তী অপরাধটা প্রমাণিত হলো। দণ্ডের বেলায়, অনাথের দ্বিতীয় ধারার মেয়াদ প্রথমটির সঙ্গে 'কন্‌কারেণ্ট্' বা একযোগে চলবে বলে আদেশ দেওয়ায় দুজনের মধ্যে কার্যতঃ কোনো তফাৎ রইল না। কিন্তু কারাদণ্ডের পরিমাণ এক হলেও, তফাৎ ঘটল কারাগারে, এবং সেখানকার 'স্ট্যাটাস্' বা পদমর্যাদায়। অনাথ মল্লিক শিক্ষিত ভদ্রলোক। সুতরাং 'ডিভিশন টু' বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সনদ নিয়ে সে চলে গেল কলকাতার কুলীন জেলে। কুসুম দাসী নিরক্ষর 'ছোট জাত'; তার আশ্রয় হলো মফস্বল সেণ্ট্রাল জেলের তৃতীয় শ্রেণীর জেনানা ফাটক। উভয়ের দণ্ডই সশ্রম, কিন্তু 'শ্রম'-বণ্টনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। অনাথের সেই পুরনো কেরানীগিরিই বজায় রইল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস থেকে উঠল গিয়ে জেলের অফিসে। কুসুমের যা পেশা, জেল তা যোগাবে কোত্থেকে? তার কাজ হলো রোজ দশ সের করে গম পেষা। প্রসূতি ও শিশুর সেবা নিয়ে যার দিন কেটেছে তার হাতে উঠল দেড়মণি জাঁতার হাতল। দুদিন ঘুরিয়েই দু হাতের তালু জুড়ে দেখা দিল বড় বড় ফোস্কা।

সেই ফোস্কা-সূত্রেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। জেনানা ফাটকের সাপ্তাহিক প্যারেডের জন্যে অপেক্ষা করবার ধৈর্য ছিল না। 'বড় সায়েবের কাছে নিয়ে চল,' বলে এমন চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছিল যে, মেট্রন তাকে সরাসরি আমার অফিসে হাজির না করে পারে নি। এসেই টেবিলের ওপার থেকে হাত দুটো প্রায় আমার মুখের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'মেরে ফেললেও আর জাঁতা ঘোরাতে পারবো না।'

কী একটা কাজে জেল-ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার ইঙ্গিত পেয়ে সেই সুডৌল হাত দুখানা নিজের হাতে

নিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন। যতটা এবং যতক্ষণ প্রয়োজন, তার চেয়ে কিছুটা বেশিই দেখলেন মণে হলো। তারপর বললেন, কিছু দিন 'রেস্ট্' দিতে হবে। বিশ্রামটা আপাততঃ সাময়িক হলেও ভবিষ্যতে স্থায়ী হয়ে দাঁড়াবে, সেটা আমি তখনই অনুমান করেছিলাম। সে অনুমান মিথ্যা হয় নি। ফোস্কা শুকিয়ে যাবার পরেও ডাক্তার তাকে বরাবরের জন্যে 'আনফিট্ ফর হুইট্গ্রাইণ্ডিং' অর্থাৎ গম-খাটনির অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। অন্য কোনো বিকল্প খাটনির ব্যবস্থা অবশ্যই হয়ে থাকবে। সেটা বোধহয় কাগজ-কলম ছাড়িয়ে 'হাতে-কলমে' পর্যন্ত পেঁছিয় নি। তা যদি হতো, তাই নিয়ে আরো দুচারবার সে নিশ্চয়ই আমার অফিস পর্যন্ত ধাওয়া না করে ছাড়ত না।

ধাওয়া অবশ্য ক'দিন পরেই করেছিল। তবে খাটনির ব্যাপারে নয়, অন্য নালিশ নিয়ে। আগের দিনের মতই, একখানা চিঠি আমার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, যেন কৈফিয়ত তলব করছে, এমনি সুরে বলেছিল, আমার চিঠিতে এত কালি ফেলেছে কেন?

চিঠিখানা তুলে নিয়ে দেখলাম, এখানে ওখানে দু-তিনটা লাইন বাদ দিয়ে বাকী সবটাই সেন্সরের ঘন কালিতে আচ্ছন্ন। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে যখন হতাশ সুরে বলল, 'এটা দিয়ে আমি কী করবো', আমিও মনে মনে তার প্রশ্নে সায় না দিয়ে পারলাম না। তার মধ্যে বস্তু বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। বললাম, তুমি একটু বাইরে যাও। খবর নিয়ে পরে আবার ডাকবো।

সঙ্গে যে ফিমেল ওয়ার্ডারটি এসেছিল, সে ওকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে কোনোরকমে অফিসের বারান্দায় নিয়ে গেল। আমি আমার সেন্সর-অফিসার মাধববাবুকে ডেকে পাঠালাম। গম্ভীর প্রকৃতির বয়স্ক লোক। বললেন, ওখানে যে সব কথা ছিল, আমি আপনার সামনে মুখে আনতে পারবো না স্যর।

—কী ধরনের কথা? অশ্লীল?

—ঠিক অশ্লীল নয়, তবে—একটু থেমে, ইতস্ততঃ করে বললেন,

রীতিমত লাভ্-লেটার। ও-জেল থেকে কেমন করে এল, তাই ভাবছি। বোধহয় কেউ স্মাগ্‌ল্ করে পাঠিয়েছে।

লেখকের নামটা মাধববাবু কাটেন নি। কুসুমকে ডাকিয়ে এনে বললাম, অনাথ কে?

—আছে একজন।

—সেই একজনের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা আমাদের জানা দরকার।

—কেন?

—তাই বুঝে আমরা ঠিক করবো, চিঠির কতটা থাকবে আর কতটা কাটা যাবে।

কুসুম একটুখানিক কি ভেবে নিয়ে বলল, ওর কাছেই তো আমি ছিলাম। আমাকে খু-উ-ব ভালোবাসে।···(বলতে বলতে মুখখানা কোমল হয়ে এল। গলাটাও অনেক স্নিগ্ধ শোনাল)···বাবু বলেছে, জেল থেকে বেরোলেই আমাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা করবে। এই চিঠিতে বোধ করি সেই কথাই ছিল। কোন্ ড্যাক্‌রা সব কালি ঢেলে বুজিয়ে দিয়েছে। গ্যাখো না!—বলে, সম্ভবতঃ মাধববাবুকেই সেই দুর্বৃত্ত মনে করে তাঁর দিকে একটি অগ্নিকটাক্ষ নিক্ষেপ করল।

ফিমেল ওয়ার্ডার বোধহয় হাসি চাপবার চেষ্টায় অন্য দিকে মুখ ফেরাল। মাধববাবুর চোখে-মুখে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার ভ্রূকুটি আরো খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। যথোচিত ব্যবস্থা-গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে অভিযোগকারিণীকে তখনকার মত ভিতরে পাঠানো হলো।

এর পরের চিঠিখানা মাধববাবু আমাকে দেখিয়েছিলেন। কুসুম যদি পড়তে পারত এবং ফিমেল ওয়ার্ডের একমাত্র বাসিন্দা হতো, চিঠিটা বিনা-সেন্সরেই তার হাতে দেবার নির্দেশ দিতাম। সে আগেই যে-স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল, তার 'নৈতিক উন্নতি' নিয়ে আমাদের মাথা-ঘামাবার প্রয়োজন ছিল না। মাধববাবুর ওটা নিছক পণ্ডশ্রম। কিন্তু ওর সঙ্গে আরো মেয়ে থাকে—কয়েকজন

তার মধ্যে উঠতি-বয়সী। এ চিঠি তাদেরও হাতে হাতে ঘুরবে। সে কথা আমাদের ভাবতে হয়েছিল। সুতরাং কুসুমের চিঠি পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো নানা রকম উৎপাত। যাকে যখন যা মুখে আসে তাই বলে, কোনো কাজ করে না, তুচ্ছ কারণে চেঁচামেচি করে, কখনো বা গুম্ হয়ে বসে থাকে।

আবার একদিন এল আমার কাছে। মেট্রনের হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসে পড়ল আমার পায়ের উপর। তিন-চার জনে টেনে তুলতে পারে না। সে কী আকুল কান্না!—আমাকে ওখানকার জেলে পাঠিয়ে দাও, সায়েব। তাকে একবারটি না দেখলে আমি মরে যাবো।

আমি ধমক দিলাম, একথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

সে কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু করুণ কণ্ঠে বলল—তার পক্ষে যেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত—তুমি যদি আমার সব কথা জানতে সায়েব, তাহলে বুঝতে। না, তার কাছে আমার কোনো লজ্জা নেই।

এর পরেই সে আমার কাছে তার "সব কথা" খুলে বলবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। মেট্রনকেও তাড়া দিয়ে দিয়ে পাগল করে তুলল। প্রথমটা আমি রাজী হই নি। তারপর, মত বদলাতে হলো। সেদিন তার যে-অবস্থা তাকে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলা চলে না। পুরোপুরি মনোবিকার না ঘটলেও, কথায়, বার্তায়-আচরণে তার অনেকগুলো লক্ষণ সুস্পষ্ট। তার থেকে আমার একটা ধারণা হয়েছিল, ওর বহু-অপরাধ-জড়িত তরুণ জীবনের যে অংশটা আড়ালে পড়ে আছে, তাকে খানিকটা উন্মোচিত করবার সুযোগ দিলে, উত্তেজিত ও অপরিণত মনের এখানে সেখানে যে-সব জট পাকিয়ে গেছে, তার গ্রন্থিগুলো হয়তো খুলে যেতে পারে।

অভিলাষবাবুর ঐ চেয়ারখানাই সেদিন একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বসেছিলাম। ও ছিল আমার পায়ের কাছটিতে। অকপটে শুধু নয়, গভীর আগ্রহভরে একটানা বলে গিয়েছিল তার শত দুষ্কর্মের

দীর্ঘ ইতিহাস। বলতে পেরে যেন বেঁচে গিয়েছিল। জানি না, সেদিন কিসের আলোড়ন উঠেছিল তার অন্তর জুড়ে, যার তাড়নায়, একজন অনাত্মীয় প্রবীণ পুরুষের কাছে যুবতী নারীর যে ব্রীড়াজনিত স্বাভাবিক সঙ্কোচ, সেটাও সে অনায়াসে অতিক্রম করে গিয়েছিল। আমাদের উভয়ের ভিতরে যে দুস্তর ব্যবধান, তাও তার দিক থেকে অণুমাত্র বাধা সৃষ্টি করে নি।

সে যেমন করে তার নির্লজ্জ প্রগল্‌ভ কাহিনীর রাশ খুলে দিয়েছিল, আমি তেমন করে তার পুনরুক্তি করতে পারি নি। তার ভাষাকেও কিঞ্চিৎ ভদ্র পোশাক পরাতে হয়েছে।

'ঐ জেলে পাঠিয়ে দাও'—বলে, কুসুম প্রথমটা যে ঝোঁক ধরেছিল, ক্রমশঃ তার বেগ পড়ে গেল। ও নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করত না। তা-ই হয়। মানুষের মনের প্রবৃত্তিগুলো জোয়ারের জলের মত। আসে, যায়, একটানা বেশি দিন থাকে না। আর একটা কারণ ছিল। অনাথের চিঠিতে আর সে উত্তাপ ছিল না। ভাষা ও সুর—দুটোই আশ্চর্য রকম বদলে গিয়েছিল। উচ্ছ্বাস নেই, আবেগ নেই, গোপন প্রণয়ের আবিলতা নেই, আগাগোড়া শুধু বড় বড় উপদেশ। মাধববাবুর সেন্সরের কাঁচি তার কোনোখানেই দাঁত বসাবার জায়গা পেত না। প্রতিটি চিঠি একেবারে অক্ষত দেহে ফিমেল ওয়ার্ডে গিয়ে পৌঁছত। মেট্রন পড়ে শুনিয়ে দিত। কিন্তু যার চিঠি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। শুনে যেত, এই পর্যন্ত। চিঠিগুলো হাত বাড়িয়ে নিতেও চাইত না। মেট্রন দিতে গেলে বলত, থাক ; ও দিয়ে আমি কী করবো ?

তারপর অনেকদিন নির্বিবাদে কেটে গেল।

কুসুমকে বিশেষভাবে চোখে বা মনে পড়বার মত কোনো ঘটনা ঘটে নি। ইদানীং তার ভিতরকার সেই বন্য ভাবটা অশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজেও কোনো নালিশ নিয়ে ছুটে আসে নি, তার নামেও কোনো 'নালিশ' ছিল না। দীর্ঘকাল পরে আমার অফিসেই আবার তাকে দেখলাম। অনেকটা যেন স্তিমিত।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একখানা খোলা চিঠি আমার টেবিলের উপর রাখল। বললাম, কী এটা?

—পড়ে দেখুন।

কয়েক বছর জেলে বাস করে কুসুমের ভাষার অনেকটা উন্নতি হয়েছিল। চিঠিটা তুলে নিয়ে লেখকের নামটা দেখে নিলাম। শ্রীঅনাথ মল্লিক। তার উপরে কয়েকটি মাত্র লাইন—

কল্যাণীয়াসু

কুসুম, এক থোকে হঠাৎ খানিকটা 'রেমিশন' পেয়ে কালই আমি জেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। তোমারও বোধহয় খালাসের বেশি দেরি নেই।

ভেবে দেখলাম, তোমার পথ এবং আমার পথ এক নয়। তোমার জীবনের সঙ্গে নিজেকে আর জড়াতে চাই না। এতদিন পরে একটা নতুন দিকের সন্ধান পেয়েছি।

তোমার কাছে এই আমার শেষ চিঠি। হয়তো আর কখনো দেখা হবে না। আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হও।

চিঠিটা মুড়ে টেবিলের উপর রাখতেই সে বলে উঠল, এখানে কি বরাবর থাকা যায় না?

—না; মেয়াদ শেষ হবার পরে একদিনও আমরা রাখতে পারি না।

—তাহলে আমি কোথায় যাবো?

এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর ছিল—'জানি না' কিংবা 'আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়।' কথাটা বোধহয় মুখে বাধল। তাই পাল্টা প্রশ্ন করলাম, মা-র কাছে যেতে তোমার আপত্তি কী?

—কোন্ মুখে যাবো? অ্যাদ্দিন আছে কিনা কে জানে? থাকলেই বা···বলতে বলতে দুচোখ জলে ভরে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, আপনি বলুন, আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। তা নৈলে কিন্তু আমি কখ্খনো এখান

থেকে নড়বো না। তাড়িয়ে দিলেও পড়ে থাকবো।

বললাম, খালাসের তো এখনো মাস কয়েক দেরি আছে। তখন দেখা যাবে কি করা যায়।

—কথা দিচ্ছেন তাহলে ?

সঙ্গে যে ফিমেল ওয়ার্ডারটি ছিল, সে ধমকে উঠল, কাকে কি বলিস তার ঠিক নেই। চল···বলে এক রকম জোর করেই ওকে টেনে নিয়ে চলল। হঠাৎ টেবিলের উপর নজর পড়তে বললাম, চিঠিটা ? কুসুম যেতে যেতে দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল, দ্রুত পায়ে ফিরে এসে চিঠিখানা তুলে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা শত টুকরো করে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সবেগে বেরিয়ে চলে গেল।

আমাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় নি। অনেকটা আপনা হতেই কুসুমের একটা মোটামুটি ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ফিমেল ওয়ার্ডেই একটি কয়েদী তখন আসন্ন-প্রসবা। মাস পাঁচেক আগে ছ'মাসের সাজা নিয়ে এসেছিল। জেলের মধ্যে আঁতুড়ের হাঙ্গামা তো কম নয়। সেটা এড়াবার জন্যে জেলর তার টিকেটে মোটা 'রেমিশন'এর সুপারিশ করেছিলেন, যাতে করে ও পর্বটা বাইরে গিয়ে সমাধা হতে পারে ; অর্থাৎ তার আগেই তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। অতটা 'মাপ' দেবার কোনো সঙ্গত কারণ না থাকলেও আমি রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু বিধাতা বাধ সাধলেন। ডাক্তারের হিসাব মত নবজাতকটির যখন আসবার কথা, তার কিছুদিন আগেই তাকে পাঠিয়ে দিলেন। তাও এমন অকস্মাৎ, যে লেডি ডাক্তার ডাকবার তর সইল না। তিনি যখন এসে পৌঁছলেন, শিশুটি তখন কুসুমের কোলে। প্রসূতিকে সুস্থ করে তুলতে ক'দিন সময় লেগেছিল। পর পর তিন চার দিন তাঁকে আসতে হলো। না এলেও হতো। কুসুম একাই সামলাতে পারত। তার কাজ-কর্ম দেখে লেডি ডাক্তার এতটা খুশী হয়েছিলেন যে, খালাসের সঙ্গে সঙ্গে

ওখানকার হাসপাতালেই একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

তার কিছুদিন পরে শুনলাম, তিনি ওখান থেকে হুগলী না হাওড়া কোথায় যেন বদলি হয়েছেন, এবং কুসুমকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

সেদিন অভিলাষবাবুর অফিস থেকে যখন বেরিয়ে পড়লাম, তার ঘণ্টা দেড়েক পরেই আমার ট্রেন। কুসুম তখনো ওখানেই অপেক্ষা করছিল। আসবার সময় আর তার দিকে তাকাই নি। কিন্তু সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো সমস্ত পথ আমাকে অনুসরণ করে চলল। একবার ভাবলাম, ফিরে যাই, জেনে আসি ঐ আগুনের ইতিহাস, এতগুলো বছর অন্তরের কোন্ নিভৃত কোণে ঐ অনির্বাণ শিখাটাকে সে জ্বালিয়ে রেখেছিল কেমন করে। তারপর নিজেকে বোঝালাম, না, আর ফেরা যায় না। কুসুম এবং তাকে ঘিরে যে জগৎ সেখান থেকে আমি চিরদিনের তরে সরে এসেছি। পিছনে যা রইল, তা পিছনেই থাক। মায়া বাড়িয়ে কী লাভ? এ শুধু ক্ষণিকের দুর্বলতা। একে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

কোলকাতায় ফিরে নানা কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম। কুসুম আবার ধীরে ধীরে মনের তলায় মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন আমার বৈঠকখানায় অভিলাষবাবুর আবির্ভাব। বিস্মিত হলাম। চাকরি জগতে ভূতপূর্বের সঙ্গে বর্তমানের যে স্বাভাবিক বিচ্ছেদ, তার উপরে সেতু রচনা করবার ইচ্ছা বা আগ্রহ কোনো তরফেই বড় একটা দেখা যায় না। বিশেষ করে, ভূতপূর্বের মাথায় যদি সাহিত্যের ভূত চাপে, বর্তমান তাকে সযত্নে এড়িয়ে চলবে, এইটাই প্রত্যাশিত। তাহলে কি উনি আবার নতুন কোনো ফ্যাসাদ ডেকে এনেছেন?

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। অভিলাষবাবু একটা খাকী রংয়ের খামে মোড়া বস্তু আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, এই নিন।

—কী ওটা ?

—আমি কিছু জানি না। শুধু পৌঁছে দেবার কথা ; তাই দিয়ে গেলাম। উঃ, চীজ বটে একখানা ! আপনি যে কি করে ওকে বরদাস্ত করতেন, স্যর, আপনিই জানেন। আমি তো দুদিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ওর জন্যেই বোধহয় পালাতে হবে ওখান থেকে।

—কার কথা বলছেন ?

—ঐ যে আপনার কুসুম না কী। আমি বলবো ক্যাক্‌টাস্‌, ভীষণ কাঁটাওয়ালা ক্যাক্‌টাস্‌, আমরা যাকে বলি ফণীমনসা। বিচ্ছুও বলতে পারেন।

—খুব জ্বালাচ্ছে বুঝি ?

—জ্বালাচ্ছে মানে ? প্রাণ বের করে দিল। সেদিন এসে বলছে —'সায়েবকে একটা চিঠি দেবো।' 'কোন্‌ সায়েব ?' 'কোন্‌ সায়েব আবার ? আমার সায়েব ; সেদিন যিনি এসেছিলেন।' বললাম, 'বেশ তো। তার জন্যে আমার কাছে আসবার কী দরকার ছিল ? মেট্রনকে বললেই চিঠির কাগজ পেয়ে যেতে।' বললে, 'চিঠি আমার লেখা হয়ে গেছে।' 'তাহলে অফিসে পাঠিয়ে দাও।' উত্তরে কি বললে জানেন ? 'না ; এ চিঠি আর কেউ পড়ে, তা আমি চাই না। এটা আমি আপনার হাতে দিয়ে যাবো।' 'আমার হাতে !' 'হ্যাঁ, আপনি যেদিন কোলকাতা যাবেন, তাঁর কাছে পৌঁছে দেবেন।'

শুনুন কথা। আর কী টোন্‌ ! যেন কুইন্‌ ভিক্টোরিয়া হুকুম চালাচ্ছে।

—আর আপনিও তো দেখছি সেটা সঙ্গে সঙ্গে তামিল করতে ছুটেছেন ?

—না ছুটে উপায় আছে, স্যর ? এর পরে কি বললে, তা তো এখনো শোনেন নি।

—কী বললে ?

—বোঝাতে গিয়েছিলাম, আমার যাবার দরকার হবে না, ডাকে

দিলেও চিঠি ঠিক পৌঁছে যাবে। কথাটা শেষ হবার আগেই রুখে উঠল—'আপনি নেবেন কিনা, বলুন। তা নইলে, আমি এইখানে আপনার সামনে মাথা খুঁড়ে মরবো।'·· বুঝুন একবার। বুড়ো বয়সে শেষকালে খুনের দায়ে পড়বো?

চিঠিখানা কুসুমের নিজের হাতে লেখা। সে তথ্যটি গোড়াতেই জানা গেল। আর জানলাম, এই নতুন বিদ্যা তার নিজের ইচ্ছা বা আগ্রহে অর্জিত হয় নি, এর পেছনে সবটাই তার 'মাসিমা' অর্থাৎ লেডি ডাক্তার মিস দাসের চেষ্টা। চেষ্টাটা বিশেষ ফলবতী হয়েছে বলে মনে হলো না। সে বিষয়ে কুসুম নিজেও সচেতন। বলছে, 'আমার এই লেখা আপনি পড়তে পারবেন কি? না পারলেও আমি সে কথা জানতে যাবো না। আমার বুকের বোঝা আমি নামিয়ে দিয়েই খালাস। তা না হলে সারাজীবন ধরে গুমরে গুমরে মরতাম। এতদিনে পরে একটা পুরো নিঃশ্বাস পড়ল।'

'এবারে জেলে এসেই শুনেছিলাম, আপনি আর চাকরিতে নেই। কোথায় আছেন কেউ বলতে পারে না। কতদিন আপনার কথা ভেবেছি! কিন্তু এ জীবনে আবার দেখা পাবো, তা কি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম। দেখে কী ইচ্ছা হয়েছিল জানেন? সেই সেদিনের মত আপনার পায়ের কাছটিতে গিয়ে বসি, বলে যাই যত কথা জমে আছে বুকের মধ্যে, যা কাউকে বলি নি, আর কাউকে বলা যায় না। সে সুযোগ হলো না। এ জীবনে কোনোদিনই হবে না। তাই সেদিন থেকে বসে বসে এই চিঠিটা লিখেছি। লিখে মনে হলো, এ চিঠি তো এরা পাঠাবে না। পাঠালেও কেটে কুটে একশা করে দেবে। তা যাতে না হয়, তার জন্যে কত কাণ্ড যে আমাকে করতে হয়েছে, শুনলে আপনি হাসবেন।···যাক সে সব বাজে কথা।'

চাকরি-জীবনের প্রথম দিকে শিক্ষানবিশী স্তরে চিঠি-সেন্সর

নামক দুরূহ কার্যটি আমাকে কিছুদিন করতে হয়েছিল। সেই বিদ্যার জোরে ভাষা, বানান এবং লিপি-বিন্যাসের কাঁটাবন ভেঙে চিঠিখানার মোটামুটি পাঠোদ্ধার কোনো রকমে করা গেল। কিন্তু গোটা চিঠিটার হুবহু উদ্ধৃতি শুধু অসম্ভব নয়, আমার পাঠককুলের কাছে রুচিকর হবে না, লেখিকার উপরেও অবিচার করা হবে। এ চিঠি একান্ত ভাবে আমারই জন্যে লেখা, প্রকাশের জন্যে নয়। আমি তাকে জানি, তার নিগূঢ় মনোরাজ্যের সন্ধান রাখি, তার বিধাতা তাকে যে-সব বিচিত্র উপাদান দিয়ে গড়েছেন, তারও পরিচয় পেয়েছি। সে কথা সে নিঃসংশয়ে জানে বলেই তার নারী-হৃদয়ের অন্তরালে প্রবৃত্তির যে উদ্দাম তাড়না, কামনার যে নগ্ন আবেগ, কোনোটাই সে গোপন করে নি। একদিন মুখে যতটা বলেছিল, তার চেয়েও বেশি, তার নিরাবরণ অন্তর্লোক অসংকোচে উদ্‌ঘাটিত করে গেছে। তার উপরে কিছুটা সেন্সরের কলম না চালিয়ে উপায় নেই। ভাষার উপরেও যে ঘষা-মাজার প্রয়োজন ঘটেছে, সে কথা তো আগেই কবুল করেছি।

লেডি ডাক্তার মিস দাস কুসুমকে শুধু আশ্রয় ও মোটামুটি সচ্ছল জীবনযাত্রার সংস্থান করে দেন নি, তাঁর নিঃসঙ্গ প্রৌঢ় জীবনের অনেকখানি স্নেহও ওকে দিয়েছিলেন। অন্য কোনো মেয়ে হলে হয়তো সেই স্নেহচ্ছায়ায় সুখে জীবন কাটিয়ে দিত। কুসুম তা পারে নি। সে সুখী ছিল না। 'মাসিমা'র প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সে যে তাঁর নিজের মেয়ে নয়, এ কথা তিনি একদিনের তরেও বুঝতে দেন নি—এও তারই অকপট উক্তি। তবু 'সুখ' যাকে বলে তা সে পায় নি। বিস্ময়ের কারণ নেই। সংসারে সুখের চেহারা সকলের বেলায় এক নয়।

'সেই লোকটা' (চিঠির ভাষায়) গোপন প্রেমের যে ফেনিল সুরাপাত্র ওর পিপাসিত ওষ্ঠপ্রান্তে এক দিন তুলে ধরেছিল, তার তীব্র স্বাদ কুসুমের শিরায় শিরায় পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। তাকে আশ্রয় করে একটি অপরিণত নারীমন সেদিন যে-জীবনের স্বপ্ন

দেখতে শিখেছিল, দূরে গিয়েও সে দিনের পর দিন তারই উপরে নানা রঙের তুলি বুলিয়ে সেই জীবনকে আরো মোহময়, আরো লোভনীয় করে তুলেছে। মাধববাবুর সেন্সরের কালি তাকে ঢেকে রাখতে পারে নি, অতৃপ্ত রমণী-হৃদয়ের উদগ্র বাসনাকে আরো খানিকটা উসকে দিয়েছে। তারই মাদকরসে নিজেকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে যে দুঃসহ আনন্দ, কুসুমের কাছে তারই নাম 'সুখ'। জেনানা ফাটকে বসে বসে সেই সুখের উপরেই সে একটি মনোরম স্বর্গ গড়ে তুলেছিল। তারপর, যাকে অবলম্বন করে এত সাধের স্বর্গ-রচনা, তারই রূঢ় হাতের অপ্রত্যাশিত আঘাতে যেদিন সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তখনও তার দুর্জয় মোহ কুসুমকে প্রচণ্ড বেগে আকর্ষণ করেছে। সেই দীর্ঘ-লালিত প্রলোভনের কবল থেকে নিজেকে টেনে সরিয়ে এনে মিস দাসের সহজ সুস্থ স্নেহময় গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে নিজেকে সে বসাতে পারে নি। হয়তো তেমন চেষ্টাও করে নি।

তার অকপট স্বীকারোক্তি চিঠিতেই দেখতে পাচ্ছি—'আপনি তো সবই জানেন। এটুকু বলতে আর বাধা কী? আপনার কাছে আমার লজ্জাই বা কিসের? সত্যি; বেশ লাগত। কত কী যে ভাবতাম! সব 'তাকে' নিয়ে। 'তাকে' নিয়ে সংসার পেতেছি। কোথায় জানেন? কোলকাতায়। একদিন দুজনে মিলে গিয়েছি আপনাকে প্রণাম করতে। সে যেতে চায় না। বলেছে, কি ভাববেন তিনি? আমি যেন জোর করে ধরে নিয়ে গেছি। তারপর নিজের মনেই হেসে ফেলতাম। ও মা! আপনার ঠিকানাই যে জানি না।··· কোনো কোনো দিন সে আসত। সত্যি বলছি আপনাকে, আমার পাশে এসে বসত। দুহাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে পিষে ফেলত। তারপর···হঠাৎ দেখতাম সব মিথ্যা, সব ভুল। আমি একা; সে কোথাও নেই। তখন সমস্ত শরীরে আগুন ধরে যেত। সে যে কী জ্বালা আপনাকে বোঝাতে পারবো না।'

এমনি করে কয়েক বছর কেটে গেল। কুসুমের রক্তধারায় সে দহন-জ্বালা হয়তো আপনা হতেই কিছুটা প্রশমিত হয়ে এল। আরো

হতো ; অন্য কোনো কারণে না হলেও, মহাকালের অমোঘ বিধানে। কিন্তু হলো না। বিধাতার হয়তো সে ইচ্ছা ছিল না। তাই তাঁরই হাতে লেখা ললাট-লিপি কুসুমকে টেনে নিয়ে গেল অন্য পথে, এক আকস্মিক, অভাবনীয়, ভয়ঙ্কর পরিণতির মধ্যে। চিঠির শেষ অংশ থেকে সেই কাহিনীটি উদ্ধার করছি।

রাত আটটা বেজে গেছে। শহরতলীতে একটা 'কল্' সেরে মিস দাস ঘোড়ার গাড়ি করে ফিরছেন। সঙ্গে কুসুম। ওঁর এক বান্ধবীর বাড়ির সামনে দিয়ে পথ। হঠাৎ কী মনে হলো, গাড়ি থামিয়ে বললেন, সতীর সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। তুই চলে যা।

'গাড়িটা পাঠিয়ে দেবো তো?' জানতে চাইল কুসুম।

—কী দরকার? আমি একটা রিক্শা নিয়ে নেবো।

গাড়ি আরো কিছু পথ এগোতেই, কাছাকাছি কোনো একটা বাড়ি থেকে কীর্তনের সুর ভেসে এল। কানে যেতেই কুসুম চমকে উঠল। এ গলা যে তার চেনা। 'চেনা' বললে কিছুই বলা হলো না। তার মর্মস্থলে গাঁথা হয়ে আছে। তার চেতনার পরতে পরতে জড়িয়ে গেছে।

অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ল। হৈমন্তী তখন একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে। বাড়ি থেকে ঘুরে আসবার নাম করে সন্ধ্যার দিকে মাঝে মাঝে ও ছুটি নিত। রেললাইন পার হয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করত। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'সে' এসে পড়ত। তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে নির্জন মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে যেত। দূরে একটা ছোট নদী ছিল। কোনো কোনোদিন তার তীরে গিয়ে বসত। তারপর শুধু কথা। কথা যখন ফুরিয়ে যেত, তখন গান। কীর্তন নয়, ভালোবাসার গান। কী দরদ দিয়ে যে গাইত! আজও দুকানে ভরে আছে। সেই গলা। সে কি কখনো ভোলবার? কুসুমের সমস্ত দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ল। কোনো বড়লোকের বাড়ি। মস্ত বড় গেট। তারপরেই

বিস্তৃত আঙিনা। সবটা জুড়ে ফরাস পাতা, মাথার উপর সুদৃশ্য সামিয়ানা। লোক গিজ গিজ করছে। বাঁ দিকটায় ভর্তি মেয়েরা। ডাইনে পুরুষদের ভিড়। সামনে সুসজ্জিত মঞ্চের উপর কীর্তনের দল। মাঝখানটার চারদিকে আলো করে সে বসে আছে। দূর থেকে এক পলক দেখেই কুসুমের বুকের রক্ত দোলা দিয়ে উঠল। এও কি কখনো সম্ভব? স্বপ্ন কি কখনো সত্য হয়? হয়। এই তো তার জলজ্যান্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দুচোখে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল কুসুম। দেখে আর আশ মেটে না। নতুন সাজে কি সুন্দর মানিয়েছে! পরনে দামী সিল্কের ধুতি-চাদর—উজ্জ্বল গেরুয়ায় রাঙানো। কাঁধ পর্যন্ত চুল, মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে সযত্ন-রচিত সিঁথি। কপালে চন্দন-তিলক।

কুসুম মেয়েদের ভিড় ঠেলে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। গানের ফাঁকে-ফাঁকে গায়কের ভাবগম্ভীর দৃষ্টি মাঝে মাঝে এদিকেও এসে পড়ছে। যদি একবার চোখাচোখি হয়ে যায়!

গান শেষ হলো। সবাইকে প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিলেন গায়ক। বাড়ির মেয়েরা এসে সসম্ভ্রমে এগিয়ে নিয়ে গেল অন্দর-মহলে। আসর আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে গেল। কুসুম তখনো একপাশে দাঁড়িয়ে। একজন ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ ঐ বাড়ির কেউ, এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি গোসাঁইজীর সঙ্গে দেখা করতে চান?

আশেপাশের টুকরো কথা থেকে কুসুম জানতে পেরেছিল, ঐ নামেই এখানে ওর পরিচয়। বলল, হ্যাঁ।

—আজ তো দেখা হবে না। এখন ওঁর বিশ্রামের সময়। কাল বিকেল পাঁচটায় আসবেন। দেখা হবে।

কুসুম আর কিছু বলল না। লোকটি সরে যেতেই সকলের অলক্ষ্যে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। দালানের সামনে একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে দেখা। তাকেই জিজ্ঞাসা করল, গোসাঁইজী কোন্ ঘরে আছেন, খুকী?

—ঐ ঘরে। এখন যাবেন না।

ততক্ষণে কুসুম সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দরজা ভেজানো। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। সামনেই প্রশস্ত খাটের উপর পুরু ধবধবে বিছানা। মাথার উপরে ঘূর্ণ্যমান বৈদ্যুতিক পাখা। গোসাঁইজী শুয়ে আছেন। মাথার কাছে বসে একটি মেয়ে তাঁর উন্মুক্ত প্রশস্ত বুকের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পায়ের কাছে আরো দুজন—মুখোমুখি বসে দুহাতে পদসেবায় ব্যস্ত। সকলেই যুবতী, সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা। একটি নীলাভ মৃদু আলো ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই।

শিয়রের কাছে যে-মেয়েটি ছিল, কুসুমের উপর সকলের আগে তারই নজর পড়ে থাকবে। একটু রূঢ় স্বরে বলে উঠল, কী চাই আপনার?

—'কিছু একটা চাই বৈকি? সেটা আমার চেয়ে উনিই ভালো বলতে পারবেন'—চোখের ইঙ্গিতে গোসাঁইজীকে দেখিয়ে দিল। তিনি চোখ বুজে ছিলেন। পাতাদুটো যেন চমক লেগে খুলে গেল। মুখ থেকে বেরিয়ে এল—কে! সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

কুসুম কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, চিনতে পারছ না, কে?···আপনাদের আলোর সুইচটা কোথায়?

পরের প্রশ্নটা পায়ের কাছে যে মেয়ে দুটি বসেছিল, তাদের উদ্দেশে। তারই মধ্যে একজন উঠে গিয়ে বড় আলোটা জ্বেলে দিল। গোসাঁইজী মুহূর্তকাল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কপাল কুঞ্চিত করে বললেন, আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

কুসুম প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণেই খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, আমি কুসুম।

—'আপনি ভুল করছেন,' কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন গোসাঁইজী, 'কুসুম বলে কাউকে আমি চিনি না। ও নামও কোনোদিন শুনি নি।'

কুসুমের সমস্ত বাক্‌শক্তি যেন এক নিমেষে হারিয়ে গেল।

তাদের পরিচয়টুকু পর্যন্ত 'সে' এমন করে স্রেফ অস্বীকার করে যাবে, এ যে তার স্বপ্নেরও অতীত।

ততক্ষণে বাড়ির পুরুষেরাও এসে পড়েছেন। একটি যুবক এগিয়ে এসে ধমকের সুরে বলল, কে তুমি ?

—যে-ই হই, তাতে আপনার কী ?

—বটে! এখ্খনি বেরিয়ে যাবে কিনা বলো। তা না হলে—

—'উহুঁ, ও ভাবে নয়,' করুণার্দ্র কণ্ঠে বাধা দিলেন গোসাঁইজী, 'মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে-শুঝিয়ে নিয়ে যাও। পাগল-টাগল হবে বোধহয়।'

'পাগল'!—বিড় বিড় করে আপন মনে আউড়ে গেল কুসুম। মুহূর্তমধ্যে সত্যিই যেন তাব মাথার ভিতরটা ওলট-পালট হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার দেহকোষে, তাব মনের মজ্জায় এতদিন ধরে যত জ্বালা জমা হয়ে ছিল—কুসুম জানে না, সে কিসের জ্বালা ; হয়তো অতৃপ্ত বাসনার, অবদমিত সম্ভোগ-লিপ্সার, ক্ষোভের, নৈরাশ্যের, বঞ্চনার, প্রতিহিংসাব—সব যেন একীভূত হয়ে তার শিরায় শিরায় উদ্দাম হয়ে উঠল। কম্পমান মুঠি থেকে ব্যাগটা মাটিতে পড়ে গেল। কুসুমেব নজর পড়ল তারই উপর। ক্ষিপ্র হস্তে তার ভিতর থেকে একটা কি যন্ত্র তুলে নিতেই গোসাঁইজী স্থান-কাল ভুলে ভয়ার্ত বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—কুসুম!

ততক্ষণে সেই ধারালো অস্ত্রটা সবেগে বসে গেছে তাঁর চোখের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ফিন্‌কি দিয়ে উঠল রক্তধারা। তার উষ্ণ স্পর্শ ছড়িয়ে পড়ল কুসুমের মুখে বুকে গলায়। খানিকটা লোনা স্বাদ তার দীর্ঘ-তৃষ্ণা-পীড়িত ঠোঁট দুটিতেও জড়িয়ে গেল।

তারপর কি হলো কুসুম জানে না। যখন জ্ঞান হলো তখন সে থানায়। তিনদিন পরে জেলে বসে খবর পেল, গোসাঁইজী হাসপাতালে মারা গেছেন।

কুসুমের চিঠির শেষ ক'টি ছত্র আরেকবার পড়লাম—'তাকে খুন

করবার মতলব আমার ছিল না। সেই সর্বনেশে চোখ দুটো, যা দিয়ে একদিন আমাকে ভুলিয়েছিল, হয়তো আরো কত মেয়েকে ভুলিয়েছে, তাই শুধু চিরদিনের তরে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলাম। ·· তাই বলে যা করেছি তার জন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে।

শেষ চিঠিতে সে আমাকে সুখী হবার আশীর্বাদ জানিয়েছিল। তার ফল ফলেছে। আজ সত্যিই আমি সুখী।'

॥ আট ॥

এতদিন যে-সব জেল-থেকে-ফেরা অচেনা পত্রলেখক ও লেখিকা আমাকে তাদের আত্মকাহিনী শুনিয়েছেন, (যার কিছু কিছু আমি আমার পাঠক-দরবারে পেশ করেছি) তাদের ছুটো দলে ফেলা যেতে পারে। এক—যাঁরা বলতে চেয়েছেন, তাঁরা নিরপরাধ, অর্থাৎ বিভ্রান্ত বিচারের বলি, দুই—যাঁরা প্রমাণিত অপরাধ স্বীকার করলেও তার পুরোপুরি দায়িত্ব মেনে নিতে চান নি, তার পিছনে দাঁড় করিয়েছেন হয় কোনো সামাজিক অসাম্য কিংবা অত্যাচার, অবস্থার প্রতিকূলতা, নয় তো কোনো অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন বা সাময়িক উত্তেজনা। আজ যে চিঠিখানা আমার ঝাঁপির তলা থেকে বের করলাম, তার লেখক এর কোনো দলেই পড়েন না। তাঁকে জেলে যেতে হয় নি, অর্থাৎ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলেও আদালত তাকে দোষী শাব্যস্ত করেন নি। কিন্তু তিনি যে অপরাধী, এই চিঠির মধ্যে সে কথা অকুণ্ঠ অবলীলায় কবুল করেছেন, নিজেকে কোথাও সমর্থন করবার চেষ্টা করেন নি। একটি লোমহর্ষক ঘটনার এমন সহজ ও নিরুত্তাপ বর্ণনা দিয়ে গেছেন, যেন তিনি তার নায়ক নন, রিপোর্টার মাত্র।

বেশীর ভাগ আসামীর মত আদালতের কাঠগড়ায় তিনিও নীরব ভূমিকা নিয়েছিলেন ; ইংরেজের ফৌজদারী আইন যে-টুকু পেলেই সন্তুষ্ট। অর্থাৎ, হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে ছুটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমি নির্দোষ'। তার দীর্ঘ দিন পরে এই স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য কী এবং তার শ্রোতার পদে আমাকে কেন বরণ করলেন, সে কথা বলতে গিয়ে আমার সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছেন, তার কোনোটাই শ্রুতিমধুর নয়। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুটা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। তা না হলে তাঁর আসল বক্তব্যের মূল সূত্রটি ধরা যাবে না।

তিনি লিখছেন, "গোড়াতেই বলে রাখি, আপনার লেখার

সাহিত্যিক গুণাগুণ-সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই। সাহিত্য আমি বুঝি না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবারও প্রয়োজন বোধ করি না। আমার ইণ্টারেষ্ট্ আপনার বিষয়বস্তু,—ক্রিমিন্যাল মাইণ্ড্—আপনি যাকে কবিত্ব করে বলেছেন 'অপরাধী মানুষের মানস-লোক।' দুঃখের সঙ্গে বলছি, সেখানকার রহস্যোদ্ঘাটন করতে গিয়ে আপনি দার্শনিক স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি, সাহিত্যিক ভাবালুতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাই যত কয়েদী আপনি আমদানি করেছেন, কোনোটাকেই ক্রিমিন্যাল বলে চেনা যাচ্ছে না, সবাই এক একটি রোমাণ্টিক হিরো কিংবা হিরোয়িন।

"খুনী মাত্রেই মহানুভব, ডাকাত মাত্রেই হৃদয়বান! আপনার 'আয়রন-গেট্' এর অন্তরালে একটাও আয়রন-হার্টেড্ অমানুষ খুঁজে পেলাম না, সব কটাই গোল্ডেন্-হার্টেড্ অতিমানুষ। আপনার ভক্তেরা হয়তো বলবেন, কী আশ্চর্য লেখনী, যার স্পর্শে সব লোহা সোনা হয়ে গেছে! আমি ভাবছি, কী আশ্চর্য উপাদান আপনার হাতে ছিল! আপনি সেগুলোকে সত্যানুসন্ধানের কাজে না লাগিয়ে টিয়ারগ্যাস্-এর মত ব্যবহার করেছেন, যার ফলে আপনার ভাবপ্রবণ পাঠক-পাঠিকার চক্ষুযুগল থেকে প্রচুর অশ্রু-পতন ঘটেছে, আর কোনো কাজ হয় নি। আমার মনে হয়, ঐটাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল। তা না হলে, কেমন করে বিশ্বাস করি, এতদিন ধরে এত জেল ঘুরে এমন একটা অপরাধীও আপনি দেখতে পেলেন না, যার হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই? হয়তো দেখেছিলেন, কিন্তু তার কথা বলতে চান নি, কিংবা যাদের কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে ঐ পদার্থটি আপনি বসিয়ে দিয়েছেন, যে যা নয়, তার উপর সেটি আরোপ করেছেন, প্রকৃতকে বিকৃত করেছেন, সাহিত্যের স্বার্থে সত্যকে বিসর্জন দিয়েছেন।

"কিংবা এও হতে পারে জেলে বসে আপনার চারদিকে যে লোকগুলোকে বিচরণ করতে দেখেছেন, তারা তাদের আসল চেহারাটা আপনাকে দেখতে দেয় নি। কেউ কেউ সামনে এসে মুখ

খুললেও মুখোশ খোলে নি। আপনি খোলস্‌কে আসল বলে ভুল করেছেন, খোসাকে মনে করেছেন শাঁস।

"আজ আমি এমন একজনের কথা আপনাকে শোনাতে বসেছি, যার মুখে কোনো মুখোশ নেই, কোনো খোলসের আড়ালেও যে নিজেকে ঢেকে রাখতে চায় না। জেলের ছাপ তার গায়ে লাগে নি। তার কারণ এ নয়, যে সে নিরপরাধ। তার কারণ, তার অপরাধ প্রমাণিত হয় নি; আপনি তো জানেন, সেটা এমন কিছু নতুন বা আশ্চর্য নয়। আইন এবং তার প্রয়োগপদ্ধতি দুইই অতি বিচিত্র ব্যাপার। নিতান্ত নির্দোষ লোকও যেমন অনেক সময় তার জালে জড়িয়ে পড়ে, তেমনি বহু দোষী ব্যক্তিও কোনো একটা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমি যার কথা বলতে যাচ্ছি, সে এই দ্বিতীয় দলের।

"ডিটেক্‌টিভ গল্পের মত রহস্যের আবরণটা শেষ পর্যন্ত ঝুলিয়ে না রেখে শুরুতেই তুলে দেওয়া যাক। সে ব্যক্তিটি স্বয়ং আমি, আপনার এই দুর্মুখ পত্র-লেখক। কি, চমকে উঠলেন তো?..."

না; চমকাই নি। অজ্ঞাতসারে চোখ দুটো একবার শুধু চিঠির শীর্ষ ও তলদেশটা চকিতে ঘুরে এল। যা অনুমান করেছিলাম, তাই। নাম এবং ঠিকানা দুই-ই অনুপস্থিত।

এর পরে লেখক তাঁর দীর্ঘ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। পুরোপুরি পুনরুক্তির লোভ ত্যাগ করছি—দুটো কারণে। এক নম্বর—তার মধ্যে বিকৃত মানব-মনের এমন সব বিস্ময়কর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, যা আমি বিশ্বাস করলেও আমার পাঠকবৃন্দের কাছে নিতান্ত অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব বলে মনে হবে। দু নম্বর —প্রগাঢ় বীভৎস রসের এমন স্বচ্ছন্দ পরিবেশন কোনো কোনো কোমলহৃদয় পাঠক-পাঠিকার স্পর্শকাতর স্নায়ুদেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। অন্ততঃ আমার প্রতি বিশেষ বন্ধুভাবাপন্ন কয়েকটি সাময়িক পত্র সেই অভিযোগ তুলে আসর গরম করবার চেষ্টা করবেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কেবলমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে একথা বলছি না। এর

নজির আছে, এবং আশা করি এই সূত্রে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ছ-সাত বছর আগেকার কথা। কোনো সুপরিচিত সাহিত্যিক তখন অল-ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সম্ভবত তাঁরই উদ্যোগে আমার রচনা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি কাহিনীর নাট্যরূপ বেতারে পরিবেশন করবার প্রস্তাব এল। আমি সম্মতি দিলাম। শর্ত রইল, নাটকের পাণ্ডুলিপি আমার অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে। আমি মফঃস্বলে থাকার দরুন এ বিষয়ে খানিকটা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। সে কথা এখানে বক্তব্য নয়।

যথাসময়ে 'বেতার-জগৎ' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিজ্ঞাপিত হলো, পরপর ছ'টি নাটক অভিনীত হবে। তিনটি কি চারটি প্রচারিত হবার পর দীর্ঘকাল অনুষ্ঠানসূচীতে বাকী কটির কোনো উল্লেখ না দেখে স্টেশন ডিরেক্টর মহাশয়কে লিখতে হলো, ওগুলোর সম্বন্ধে কি স্থির করলেন, জানালে বাধিত হব, এবং এ বিষয়ে আমার কাছে যে ডজন খানেক অনুসন্ধান পত্র জড়ো হয়েছে, তাদেরও কৌতূহল নিবৃত্তির সুবিধা হবে। উত্তরে বলা হলো, আপাততঃ আমার আর কোনো কাহিনীর নাট্যরূপ প্রচার করা হবে না। বললাম, তাহলে সেই মত আর একটা বিজ্ঞপ্তি 'বেতার-জগতে' প্রকাশ করুন। ডিরেক্টর অফিস সংক্ষেপে জানালেন, 'তার কোনো প্রয়োজন দেখি না।'

মনে করলাম, দু একটি নাটক এবং অভিনয় সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ বিরূপ মন্তব্য করেছি, এটা বোধহয় তারই প্রতিক্রিয়া। আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম বেশ কিছুদিন পরে।

যে মন্ত্রিবরের আদেশক্রমে আমাকে একদিন কলকাতার বৃহৎ জেল থেকে মফস্বলের ক্ষুদ্রতর জেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তখন গদিচ্যুত। তাঁর স্থলে যিনি নতুন অধিষ্ঠিত, তিনি হয়তো আমার সাহিত্যিক কার্যকলাপ তেমন বিপজ্জনক মনে করেন নি। অতএব নির্বিবাদে রাজধানীতে ফিরে এসেছি এবং এমন একটি বিশিষ্ট

জেলের কর্তৃত্বভার আমার হাতে দেওয়া হয়েছে, যেখানে গোড়া-থেকে-পুরোপুরি-জেল গোষ্ঠীভুক্ত আমিইঃবোধহয় প্রথম ভারতীয়। এই ক'বছরে সাহিত্যিক মহলে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছে, এবারে সেই সুযোগ আরো বিস্তৃত হলো। তাঁদেরই কারো মুখে একদিন জানতে পারলাম, আকাশবাণীর নাট্যশালায় আমার কাহিনীর উপর্যুপরি অভিনয় জনদুই প্রবীণ সাহিত্যিককে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিল, এবং তাঁরাই অগ্রণী হয়ে কোনো ইংরেজি দৈনিকপত্রে কয়েকখানা কড়া চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল—এই সমস্ত বীভৎস 'ক্রাইম-স্টোরী' বহু সুকুমারমতি বেতার-শ্রোতার অন্তরে বিভীষিকার উদ্রেক করছে, তরুণ-তরুণীদের মনে পাপের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তুলে তাদের বিপথে চালিত করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এদের প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করা হোক।

স্থানীয় বেতারকর্তৃপক্ষ চিঠিগুলোকে বিশেষ আমল দেন নি, কিন্তু দিল্লীর কর্তারা হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন। সম্ভবতঃ সেখানে কিছুটা সরাসরি তদ্বিরাদি হয়ে থাকবে। কলকতার অফিস নাকি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, কাহিনীগুলো ঠিক 'ক্রাইম-স্টোরী' নয়, যে গ্রন্থ থেকে তাদের সংগ্রহ করা হয়েছে, অল্পদিনেই সেটি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, এবং চিঠিগুলোতে যে-সব আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে তার কোনো ভিত্তি নেই।

মিনিস্ট্রি অব্ ইন্‌ফরমেশন অ্যাণ্ড্ ব্রড্‌কাস্টিং এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হলেন না। আদেশ হলো—অভিনয় বন্ধ কর।

বলাবাহুল্য, ইংরেজি দৈনিকে করেসপণ্ডেণ্ট্ বা পত্রদাতার যে-নাম ছিল, সেটা কাল্পনিক।

এই কৌতুকাবহ তথ্যটি যিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন, আসল লেখকদের নামও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আমি সে সম্বন্ধে নীরব রইলাম। উভয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, তবে, যদ্দূর শুনেছি, পাঠকমহলে বর্তমানে তেমন সমাদৃত নন। যাক সে কথা।

আজ যে নির্লজ্জ এবং নিরাবরণ স্বীকারোক্তি আমার সামনে খোলা রয়েছে, তার কাছে সেদিনকার বেতারে প্রচারিত কাহিনী-গুলো নিতান্তই দুগ্ধপোষ্য। এর হুবহু চিত্রটা যদি প্রকাশ করি, আমার শির লক্ষ্য করে শুধু যে একদল সৎ সাহিত্যিক ও সম্পাদকের তীক্ষ্ণ লেখনী উদ্যত হবে, তাই নয়, পুলিসের বাণও নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সুতরাং শুধু অংশবিশেষের উল্লেখ করছি; তাও অনেক ক্ষেত্রে আমার নিজের ভাষায় 'কোটিং' দিয়ে।

পত্রলেখক জানাচ্ছেন—আমার কাহিনীর প্রধান চরিত্র আমার স্ত্রী। ধরুন তার নাম মন্দাকিনী। তাকে নিয়েই উদ্বোধন, তাকে দিয়েই উপসংহার। সুতরাং একেবারে বিয়ের রাত থেকে শুরু করা যাক। না, প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার কিছু নেই। বিয়ের আগে আমি তাকে দেখি নি, এমন কি ছবি পর্যন্ত না। সম্বন্ধটা আমার বাবা এবং তার বাবা মিলে স্থির করেছিলেন, যেমন আগেকার দিনে হতো, বিশেষ করে আমাদের মত পরিবারে। আমার ঠাকুর্দার ছিল কতকগুলো পেটেন্ট ওষুধের ব্যবসা। তার সঙ্গে কয়েকটা বাজার চলতি নামকরা ওষুধের এজেন্সি নিয়ে কারবারটাকে বেশ বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তার মূলে কিছু গোপন রহস্য ছিল, আজকের দিনে যা সকলেই জেনে ফেলে দিয়েছে এবং ব্যাপকভাবে চালাচ্ছে। অর্থাৎ, ঐ সব ওষুধের খালি শিশি সংগ্রহ করে আমরা আমাদের নিজেদের তৈরী রসায়ন বা বটিকা ভরে দিতাম। তার জন্যে আমাদের একটা ছোটখাটো কারখানা ছিল। আমি তার দেখাশুনা করতাম। বিশেষ করে সেই উদ্দেশ্যেই বাবা আমাকে বি-এসসি পাস করিয়েছিলেন। আমার যা কাজ, তাতে অতখানি বিদ্যার দরকার ছিল না। নানা রকমের জংলী গাছগাছড়া সংগ্রহ করে তার নির্যাস বের করা এবং প্রয়োজন মত রং-টং মেশানো—সে সব আমাদের কর্মীরাই করত। যে জিনিস তৈরী হলো তার গুণাগুণ নিয়ে আমরা কখনো মাথা ঘামাই নি। প্রথম প্রথম এ নিয়ে খানিকটা মন খুঁত-খুঁত করলেও

অল্পদিনেই সেটা কাটিয়ে উঠেছিলাম।

এই পরিবারে এবং এই পরিবেশে মানুষ হয়ে রোমান্স্ বা পূর্বরাগের চর্চা করবার মত সময় সুযোগ বা মনোবৃত্তি সব কিছুরই অভাব ছিল। সুতরাং বিয়েটাকে নিছক দৈহিক এবং সাংসারিক প্রয়োজন বলে ধরে নিয়ে লক্ষ্মীছেলের মত পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে-ছিলাম।

আমার স্ত্রী যে পরিবারের মেয়ে সেখানে স্ত্রী-শিক্ষার দৌড় ছিল গ্রাম্য পণ্ডিতের পাঠশালা পর্যন্ত। তার পর রান্না-বান্না এবং যাবতীয় গৃহকর্মে হাতেখড়ি, নানারকম ব্রত ও পূজানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে 'পতি পরম গুরু' নামক বৃহৎ আদর্শে দীক্ষাদান। সে বিষয়ে যে কোনো রকম ত্রুটি হয় নি, তার প্রমাণ বিয়ের রাতেই পাওয়া গেল।

আপনারা অর্থাৎ সাহিত্যিক নামক বাস্তবজ্ঞানহীন ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরা বলে থাকেন, স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করবার আগে তার মনকে জয় করতে হয়, ধীরে ধীরে ধৈর্যের সঙ্গে, মধুর কলা-কৌশলের ভিতব দিয়ে তার নারীসুলভ লজ্জা সঙ্কোচময় জড়িমার ঘুম ভাঙিয়ে—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তার কোনোটাই করি নি। বাসর জাগতে যে মেয়েগুলো এসেছিল, তারা সরে যেতেই নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে কোনো রকম ভূমিকার পথে না গিয়ে সরাসরি তার উপর পুরুষের সনাতন অধিকার প্রয়োগ করেছিলাম। সেই উদগ্র লালসার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সে যে কিছুটা যন্ত্রণা বোধ করছিল, সেটা সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম (তখনো তার বয়স চৌদ্দ পূর্ণ হয় নি), কিন্তু কথায় বা ব্যবহারে কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করে নি। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ করে স্বামীর ইচ্ছার কাছে নিজেকে একান্তভাবে বলি দেওয়া—এটাকেই সে ধর্ম বলে জেনেছিল, এবং নিঃশব্দে পালন করেছিল।

আমার দৈহিক দাহ মিটে যেতেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের দিকে যখন ঘুম ভাঙল, দেখি যে পাশে নেই। জ্যৈষ্ঠ মাস। ছোট শহর। বিদ্যুতের এলাকা নয়। অথচ বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা

লাগছিল। উপরের দিকে তাকাতেই কারণটা ধরা পড়ল। আমার শিয়রের কাছে বসে একটা হাতপাখা দিয়ে সে আমাকে বাতাস করছে। বোধহয় সারারাত ধরেই চালিয়েছে। বেশ লাগল। তাই বলে মনটা যে স্নেহ ও কৃতজ্ঞতায়, আপনারা যাকে বলেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তা নয়। স্ত্রীর কাছে যা আমার প্রাপ্য, তাই সে দিয়েছে। এই তো তার কাজ। তবু নেহাত কিছু একটা বলতে হয়, তাই বললাম, একি! তোমাকে হাওয়া করতে কে বলেছে?

মন্দাকিনী কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নোয়াল।

—তুমি বুঝি একটুও ঘুমোও নি?

মৃদু কণ্ঠে উত্তর এল, আপনার খুব ঘাম হচ্ছিল।

—তাই বলে সারারাত ধরে এত কষ্ট করে পাখা চালাতে হবে!

—এতে আমার কোনো কষ্ট হয় না।

কষ্ট যে তার কোনো কিছুতেই হয় না, সে প্রমাণ সে দীর্ঘ জীবন ধরে প্রতি মুহূর্তে দিয়ে গেছে। কষ্ট হয় না—একথাটা ঠিক নয়। মানুষের শরীর তো! আমার কথা হলো, আমার জন্যে সব কষ্টই সে স্বচ্ছন্দে এবং হাসি মুখে সয়ে নিতে পারে, এবং তাই নিয়েছে। শুধু আমার জন্যে কেন, সমস্ত সংসারের জন্যে।

অনেকদিন আগেই আমার মা মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং বাবার সেবা-শুশ্রূষা, যত্ন-আত্তির সব ভারও ছিল তার হাতে। কেউ বলে দেয় নি। স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে সে নিজেই তুলে নিয়েছিল। তার বদলে বাবার কাছ থেকেও যে বিশেষ কোনো আদর স্নেহ কিংবা মিষ্টি ব্যবহার পেয়েছে, তা নয়। বরং কোথাও কোনো ত্রুটি হলে তৎক্ষণাৎ সেটা তাকে কড়াভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা পিতা পুত্র দুজনেই ছিলাম ভোজন-বিলাসী। রোজকার রান্নার ব্যাপারটা পদ ও পরিমাণ দুদিকেই বেশ ব্যাপক আকারে চালানো হতো। কিন্তু 'ঠাকুর' রাখবার মত বিলাসকে আমরা কোনদিন প্রশ্রয় দিই নি। চাকর একটা ছিল, বাকী সব মন্দাকিনী। আমরা একসঙ্গে খেতে বসতাম এবং আশ মিটিয়ে খেতাম। সে

অবিরাম যুগিয়ে যেত। তারপর কী থাকত, তা নিয়ে আমরা কখনো মাথা ঘামাই নি। মেয়েদের খাওয়া-পরার দিকে নজর দেওয়া "মেনীমুখো" পুরুষের লক্ষণ। মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে ইচ্ছে হলেও কেমন যেন পৌরুষে বাধত। মনে হতো, তাতে করে নিজেকে অনেকখানি নামিয়ে আনা হবে।

বাজার করার ভার ছিল বাবার হাতে। কিন্তু ভালো ভালো জিনিসের লোভ যতখানি হাত ততটা দরাজ ছিল না। রসনার সঙ্গে পকেটের বিরোধে প্রায়ই লেগে থাকত, এবং তার জের গিয়ে পড়ত পুত্রবধূর উপর। বাজারে বেরোবার সময় রোজই একবার জিজ্ঞাসা করতেন, 'কি কি আনতে হবে, বৌমা ?' প্রশ্নটা অনাবশ্যক। 'বৌমা' তো গৃহিণী নয়, রাঁধুনী মাত্র। কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন, স্থির করবার কর্তা তিনি নিজেই। মন্দাকিনী তা জানত। তাই মৃদু স্বরে শুধু জানাত, মাছ তরকারী আপনার যেটা পছন্দ হয়, আনবেন। মশলাপাতি, ঘি, তেল সব আছে।

ও সব জিনিস ফি মাসের গোড়াতেই পুরো মাসের মত সংগ্রহ করা হতো। সে ফর্দ তিনি নিজে করতেন। মাঝে মাঝে ঘাটতি পড়ত। সেদিনই হতো মুশকিল। 'বৌমা' হয়তো ঘিয়ের টিনটা হাতে করে সবে ভাঁড়ার থেকে বাইরে পা দিয়েছে, শ্বশুর অমনি গর্জে উঠতেন, 'এই তো সেদিন ঘি নিয়ে এলাম, এরই মধ্যে শেষ করেছ ?'

মন্দা জবাব দিত না, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। কখনো বলতো না, ইদানীং পর পর কদিন রাত্রে রুটি পরটার বদলে লুচি হয়েছে বলেই ঘিটা যদ্দিন যাবার কথা ছিল, তা যায় নি।

মাঝে মাঝে বাবা আবার আমাকে মধ্যস্থ মেনে বসতেন। বৌ-এর সামনে ডাকিয়ে এনে বলতেন, তুমি কী বল ? পুরো মাসের হিসেব মত জিনিস আনা হচ্ছে, আর পঁচিশ তারিখ না যেতেই বাড়ন্ত। এ রকম করলে চলবে কেমন করে ?

আমি মুখে কোনো জবাব দিতাম না বটে, কিন্তু জ্বলন্ত চোখে বৌ-এর দিকে তাকাতাম। চোখ না তুলেও সে নিশ্চয়ই দেখছে

পেত। এই 'অপব্যয়ে'র সব অপরাধ যে তারই, সে বিষয়ে পিতার সঙ্গে পুত্রের মতান্তর হতে পারে, সেটা তার ধারণার অতীত। সব অভিযোগ নিঃশব্দে মেনে নিয়ে কাজে গিয়ে লাগত। উনুনে হয়তো কিছু একটা বসিয়ে এসেছে, পুড়ে গেলে রক্ষা থাকবে না।

'বন্ধু' বলতে যা বোঝায় তেমন কেউ আমার ছিল না। আপনার সাহিত্যিক ডায়গনোসিস্ যদি এই হয়, যে তার কারণ, কারো সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠবার মত হৃদয় আমার মধ্যে নেই, আমি আপত্তি করব না। জীবনে আর যা কিছুর চর্চা করে থাকি না কেন, হৃদয়-চর্চা কখনো করি নি। ব্যবসায়-সূত্রে কারো কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তার মধ্যে এক জনের নাম ছিল রমণীমোহন (বলা বাহুল্য আসল নামটা আলাদা)। কাজের কথার বাইরে যে সব আলাপ সে করত (প্রলাপ বললেই হয়), তার প্রায় সবটুকু জুড়ে থাকত একটি বিশেষ রমণী, অর্থাৎ তার বৌ। তারই হাসি-কান্না, মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ, খেয়াল-খুশির লম্বা ফিরিস্তি যখন শুনতাম, আমার মাঝে মাঝে মনে হতো, কই, মন্দার মধ্যে তো এর কোনোটাই কখনো দেখতে পাই না। রমণীমোহনের বৌ-এর মত সে কোনোদিন 'অকারণ পুলকে' আমার গলা জড়িয়ে ধরে নি, অহেতুক অভিমানে ছলছল চোখে জানালার গরাদের পাশেও বসে থাকে নি। সে 'বিচিত্ররূপিণী' নয়, তার একটি মাত্র রূপ। উদয়াস্ত মুখ বুজে কাজ করে, সংসারের প্রয়োজন মেটায় ; অস্তের পরেও তার কাজ থাকে, সেটা আমার প্রয়োজন মেটানো। তাও সে মুখ বুজেই করে।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। সেজন্যে আমার কোনো আপসোস ছিল না, কোনো অভাবও কোনোদিন বোধ করি নি। বরং মন্দা যে রমণীমোহনের বৌ-এর মত হাবভাব ছলা-কলার ধার ধারে না, কথায় কথায় বায়না ধরে না, কোনো কিছু নিয়ে আবদার করে না, সেজন্যে আমি মনে মনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম।

একদিন সন্ধ্যার দিকে রমণীমোহন গম্ভীর মুখে আমার দোকানে ঢুকে বলল, চল, বেরোই।

—কোথায় ?

—চল না ? যেতে যেতে বলবো।

আমি একটু চিন্তিত হয়েই ওর গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। রাস্তায় কোনো কথা হলো না। নিউ মার্কেটের সামনে গাড়ি রেখে যখন নেমে পড়ল, তখনো তার মুখ ভার। বললাম, কী ব্যাপার, বল দিকিন ?

মার্কেটে ঢুকতে ঢুকতে তেমনি মুখেই বলল, একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি ভাই।

—কী ভুল করলে !

—কাল ছিল আমাদের বিয়ের অ্যানিভারসারী, ফিফ্থ্, মানে পঞ্চবার্ষিক উৎসব। আমার ছাই কিছু মনে নেই। এদিকে কারখানায় স্ট্রাইক, মাথার ঠিক ছিল না। ফিরতেও রাত করে ফেলেছি। ঘরে ঢুকে বৌ-এব দিকে নজব পড়তেই মনে পড়ে গেল। একটা নেহাত আটপৌবে ময়লা কাপড় পরে হাঁড়িমুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে খালি হাতে ঢুকতে দেখে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। সারারাত ঘরে আসে নি। অনেক সাধ্যসাধনা করেও পাশের ঘরের দোর খোলানো গেল না। একটা বেশ ভালোরকম প্রেজেন্ট নিয়ে না গেলে আজ আর বাড়িমুখো হবার উপায় নেই।

আমি এত জোরে হেসে উঠেছিলাম, আশেপাশের লোকগুলো নিশ্চয়ই মনে করে থাকবে, লোকটা হয় পাগল, নয় একেবারে গেঁয়ো অর্থাৎ কোলকাতার মত সভ্য শহরে থাকবার যোগ্য নয়। কি করব, বলুন। ব্যাপারটাকে নিছক হাস্যকর ন্যাকামি ছাড়া আমি আর কোনো ভাবে দেখতে পারি নি। আপনি হয়তো আপনার সাহিত্যিক দৃষ্টি দিয়ে এর মধ্যে একটা সম্রাট-সাজাহান-সুলভ গভীর প্রেম আবিষ্কার করে বসবেন। আমার সে দৃষ্টি নেই। তাছাড়া, আমার জীবনে এরকম দূরে থাক, এর কাছাকাছি কোনো অভিজ্ঞতাও কোনোদিন ঘটে নি এবং ঘটতে পারত না। বিয়ের অ্যানিভারসারী

উদ্‌যাপন পড়ে মরুক, তার তারিখটাও মনে করে রাখি নি। আমার বিশ্বাস, আমার স্ত্রীও রাখে নি।

রমণীমোহন সেদিন একটা কাণ্ড করে বসল। একগাদা বেনারসীর ভিতর থেকে অনেক বাছাবাছির পর (তার মধ্যে আমাকেও দু-একটা 'হাঁ' 'না' বলতে হয়েছে) দুখানা শাড়ি পছন্দ করল। একটা ভীষণ জমকালো, আর একটা ওরই মধ্যে একটু যাকে বলে sober··· সেখানা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, এটা তুমি নাও।

"আমি!" রীতিমত চমকে উঠলাম।

—আহা, ভয় পাবার কি আছে? ঘরে বৌ থাকলে মাঝে মাঝে দু-একটা বাড়তি খরচ করতে হয়। এমন কিছু দামও নয়। সঙ্গে টাকা না থাকলে আমি চালিয়ে দিচ্ছি। যখন সুবিধে হবে, দিও।

—বৌ-এর শাড়ি কেনা আমার কাজ নয়, ওটা বাবার ডিপার্টমেণ্ট্। তাছাড়া এরকম দামী শাড়ি সে কখনো পরে না।

—দাও না বলেই পরে না। একদিন দিয়ে ছ্যাখ; কত খুশী হবে।

ততক্ষণে বিল এসে গেছে এবং পুরো টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি বিরক্তির সুরে বললাম, কী যে কর তার ঠিক নেই। কথা নেই বার্তা নেই, হুট্ করে একটা শাড়ি নিয়ে গিয়ে উঠবো কী বলে? পুজো-টুজোর সময় হলেও না হয়—

—বৌকে প্রেজেণ্ট্ দেবার আবার সময়-অসময় আছে নাকি? নাও।

কাগজের বাক্সটা জোর করে আমার হাতে গুঁজে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল—চল, চল, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে জুয়েলারীর দোকানটাও একবার ঘুরে যেতে হবে।

বাক্সটা লুকিয়ে নিয়ে বাড়ি ঢুকলাম এবং লুকিয়ে রেখে দিলাম। তখন বাবা বাড়ি ছিলেন, মন্দাও রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত। রাত্রে যখন শুতে এল, কাপড়খানা বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, ছ্যাখ তো কেমন হলো?

এখানে একটা গোপন কথা স্বীকার করছি, যদিও জানি, আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে দ্বিধা করবেন। কিন্তু সত্যি বলছি, শাড়িটা দেবার পর মন্দার মুখে খুশির ঝলক না হলেও অন্ততঃ একটা আভাস দেখতে পাব, এইরকম একটু আশা মনের মধ্যে ছিল। কিন্তু তার বদলে দেখলাম জিজ্ঞাসা। পরে ভেবে দেখেছিলাম, সেইটাই স্বাভাবিক। বস্ত্র নামক বস্তুটিকে খাদ্যের মত নিতান্ত দৈহিক প্রয়োজন হিসেবেই সে দেখে এসেছে। সেটা যে কখনো 'উপহার'-এর মত অনাবশ্যক রূপ নিতে পারে, সে অভিজ্ঞতা তার ছিল না। কাজেই তার মুখ থেকে যে কথাটি বেরিয়ে এল, সেটি একটি সরল প্রশ্ন—'এটা কার ?'

—কার আবার ? তোমার।

—'আমার !' এটা নিছক বিস্ময়। 'আমার তো শাড়ি রয়েছে।'

—থাকলই বা। এটা তোলা হিসেবে রইল। কোথাও যেতে আসতে পরবে।

—বাবা জানেন ?

আমার পৌরুষে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগল, যদিও লাগা উচিত নয়। উষ্মার সুরে বললাম, সব কিছুই যে বাবাকে জানাতে হবে, তার কি মানে আছে ?

—উনি শুনলে রাগ করবেন।

কথাটা মিথ্যা নয়। তাই আমার মুখে তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর যোগাল না। মন্দা মুহূর্তকাল কি ভেবে নিয়ে বলল, দোকানে ফেরত দিতে গেলে নেবে না ?

আমি কিছু বলবার আগেই হঠাৎ যেন সব সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে গেছে, এমনি ভাবে বলে উঠল, ভালই হয়েছে, ৭ই বীণার বিয়ে। আজই সকালে চিঠি এসে গেছে। একটা শাড়ি তো দিতে হতো। এটা দিলেই হবে।

বলে, বেশ "খুশি" হয়েই মন্দা কাপড়খানা বাক্সে ভরে আলমারিতে তুলে রাখল। এই "খুশিই" কি আমি দেখতে চেয়েছিলাম!

বীণা আমার পিসীমার মেয়ে। কাপড় দেখে বাবা যথারীতি মন্দার উপরেই এক হাত নিতে ছাড়লেন না, যেন সে-ই আমাকে দিয়ে এমন একটা দামী শাড়ি আনিয়েছে। মেয়েমানুষকে তো রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হয় না, পয়সার দাম বুঝবে কোত্থেকে —ইত্যাদি মন্তব্য তার মত আমিও নীরবে গ্রহণ করলাম। বললাম না যে, এর ভিতরে ওর কোনো হাত নেই। কেন বলতে যাব? আপনি হয়তো বলবেন, মন্দার এই স্বার্থত্যাগের জন্যে তার উপর আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল, অন্ততঃ কিছুটা সহানুভূতি সে দাবি করতে পারত। কিন্তু তার এই প্রত্যাখ্যান তাকে আমার কাছে বড় করা দূরে থাক, আরো ছোট করে দিল। 'প্রত্যাখ্যান' কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না। তার মধ্যে একটা জোর থাকে, যা ওর চরিত্রে একেবারেই ছিল না। একে বলা যেতে পারে গ্রহণ করার অক্ষমতা। মন্দাকে যদি আমি ভালোভাবে না জানতাম, হয়তো তার উপরে রাগ হতো, এই ভেবে যে, সে আমার স্বামিত্বের অধিকারকে অগ্রাহ্য করছে, আমাদের ভিতরকার যে-সম্পর্কটা—প্রভু ও দাসীর সম্পর্ক—সেই বিয়ের রাত থেকে মেনে আসছিল, তাকে যেন অস্বীকার করছে। কিন্তু মন্দাকিনীকে আমার চিনতে বাকী নেই; একথা তার সম্বন্ধে ভাবাই যায় না। এটা আর কিছু নয়, স্ত্রী হিসেবে তার নিছক অযোগ্যতা। কে জানে, রমণীমোহনের মাথার ভূতটা হয়তো কোনো দুর্বল মুহূর্তে আমার মাথায় চেপে থাকবে। মনে মনে তার বৌ-এর পাশে আমার বৌকে কখন বসিয়ে ফেলেছিলাম। ধাক্কা খেয়ে ভুল ভাঙল। হয়তো ঐ কল্পিত তুলনার ফলেই ও আমার কাছে আরো খেলো হয়ে গেল; স্ত্রীকে শ্রদ্ধা বা প্রীতির চোখে আমি কোনোদিন দেখি নি। এই ঘটনার পর থেকে তাকে রীতিমত ঘৃণা করতে শুরু করলাম।

আপনার অনুচ্চারিত বিশেষণটা আমি শুনতে পাচ্ছি। বলছেন, লোকটা কি পাষণ্ড! কি করবো, বলুন। আমি যা তাই। আপনি কী ভাববেন, তাই ভেবে মনের আসল রূপটা চাপা দিতে চাই না।

তাহলে এই চিঠি লেখার কী প্রয়োজন ছিল ?

তবে আপনার তূণে যে-সব কড়া কড়া বিশেষণ আছে, সবগুলো যেন এখনই নিঃশেষ করে বসবেন না। তাদের আসল প্রয়োজন দেখা দেবে শেষ অঙ্কে। অনাবশ্যক ভূমিকা না বাড়িয়ে এবার সেই দিকেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

আমার এবং আমাদের সংসারের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে মন্দাকিনী কোথাও কোনো ত্রুটি রাখে নি। ফাঁক ছিল শুধু এক জায়গায়। আমাদের একটি বংশধর সে দিতে পারে নি। বন্ধ্যা হলে হয়তো বা মার্জনা পেতে পারত। কিন্তু তার অপরাধ তার চেয়েও গুরুতর। সন্তান সে ধারণ করেছিল, জীবিতাবস্থায় পৃথিবীতে আনতে পারে নি। মাস পূর্ণ হবার আগেই কি সব জটিলতা দেখা দেয়, যার ফলে হাসপাতালে না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। ডাক্তারেরা এসব ক্ষেত্রে যা করে থাকেন, তাই করলেন। অর্থাৎ, ওঁদের ভাষায়, ফলের আশা ছেড়ে দিয়ে গাছের দিকেই পুরো নজর দিলেন। অনেক ধাক্কা ও ধকল খেয়ে 'গাছ' শেষ পর্যন্ত টিকে রইল বটে কিন্তু জানা গেল, সে চিরদিনের তরে নিষ্ফলা হয়ে গেছে।

মোটা টাকা বেরিয়ে যাওয়ায় বাবার মেজাজ আগে থেকেই তেতে ছিল, তার উপরে ডাক্তার এসে যখন এই শুভ সংবাদটি শুনিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আগুন হয়ে উঠলেন! আমার উপর হুকুম হলো, 'আবার বিয়ে কর।' আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। মন্দাকে দিয়ে সত্যিই আর কাজ চলছিল না, কিন্তু রমণীমোহন অজান্তে কখন আমার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার ঘরে যে চীজটি আছে, সেই রকম কিংবা তার কাছাকাছি কেউ এসে যদি ঘাড়ে চাপে, তখন কি করব। বাবা এদিকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যেতে লাগলেন। বৌ তাঁকে একটি পৌত্র-মুখ দর্শনে বঞ্চিত করেছে, এইটাই তাঁর একমাত্র কারণ নয়, সংসারের চাকাগুলোকেও সে আর আগের মত স্বচ্ছন্দ গতিতে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না,

তাঁর সেবা-যত্ন আরাম-বিরামের ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে ত্রুটি দেখা দিচ্ছে এবং সে-সব পূরণ করতে একটি বাড়তি ঝি-এর প্রয়োজন হয়েছে।

যাই হোক, বেশি দিন তার তাঁকে এই অসুবিধাগুলো ভোগ করতে হল না। ইদানীং যাকে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না, সেই পুত্রবধূর কোলে মাথা রেখেই হঠাৎ একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

গোটা ব্যবসাটা আমার হাতে এসে পড়ল। সেই দিকেই বেশি নজর দিলাম। মন্দা ফালতু ঝিকে ছাড়িয়ে দিয়ে গোটা সংসারের ভার আবার নিজের হাতে তুলে নিল। আমার চিরাচরিত অভ্যাস এবং প্রয়োজনগুলো কোথাও বিশেষ বাধা পেল না। সে বিষয়ে তার দৈহিক অক্ষমতা যতই থাক, অতিরিক্ত উৎসাহ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে, সেটুকু বুঝতে কোনো অসুবিধা ছিল না। সেটা লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠতাম।

"এতদিন হাসপাতালে কাটিয়ে এলে, ডাক্তারে ওষুধে এক ঝুড়ি টাকা বেরিয়ে গেল। এদিকে চেহারায় তো তার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। কী হয়েছে, খুলে বলবে তো?"

—"হবে আবার কী?" মুখে একটা মৃদু হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করত মন্দা। তাতে তাকে আরো কুৎসিত দেখাতো, "আমি তো ভালোই আছি।"

—তবে শরীর সারছে না কেন?

—"আর কত সারবে? এর চেয়ে মোটা তো আমি কোনো কালেই ছিলাম না।"···বলে কোনো একটা কাজের অছিলা করে তখনই আমার সামনে থেকে সরে যেত।

মন্দার এক ভগ্নীপতি থাকতেন পশ্চিমের কোনো স্বাস্থ্যকর শহরে। নামটা আপনার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং উহ্য রইল। কোলকাতায় বড় একটা আসতেন না। একবার কী কাজে আসতে

হলো। যাবার আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শ্যালিকা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মন্দা হাসিমুখে বলল, চিনতে পারছেন না?

—পেরেছি; তবে অতি কষ্টে। একী চেহারা হয়েছে তোমার!

আমি বাড়িতেই ছিলাম। শ্যালিকার সম্বন্ধে তাঁর উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে গত কয়েক মাসের একটা মোটামুটি ইতিহাস দিলাম। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে আমাদের তরফ থেকে চিকিৎসাদির যথাসাধ্য ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয় নি এবং তা সত্ত্বেও মন্দার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যাচ্ছে না—এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করলাম। আমার ভায়রাভাই বললেন, তার মানে একটা চেঞ্জ দরকার। তাহলে এক কাজ করা যাক। আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। জল-হাওয়ার দিকে দিয়ে জায়গাটা খুব ভালো। মাসখানেক থাকলেই সেরে উঠবে। না হয়, আরো কিছুদিন কাটিয়ে আসবে। অনেকদিন দেখাশুনো নেই, ওর দিদিও খুব খুশী হবে। তাই করি, কী বলো?

আমি বললাম, বেশ তো, আপনি নিয়ে যাবেন, তাতে আর আমার বলবার কী আছে?

সেই সময়ে মন্দা এল চা এবং খাবার নিয়ে। তিনি খুশি মুখে তাঁর প্রস্তাব এবং আমার সম্মতি তাকে জানিয়ে দিয়ে বললেন, "কাল সন্ধ্যা সাতটায় গাড়ি। নানা জায়গায় ঘোর ঘুরি সেরে আমি সাড়ে পাঁচটার আগে আসতে পারবো না। তুমি একেবারে তৈরী হয়ে থাকবে কিন্তু। 'আপনি একটু বসুন, আমি চুল বেঁধে আসি,' তা বললে চলবে না। বাঁধা-ছাঁধা সব আগেই সেরে রাখবে।"

মন্দা চুপ করে রইল এবং ভগ্নীপতি চলে যেতেই বলল, কাল যখন আসবেন, তুমি ওঁকে বুঝিয়ে বলো, আমার এখন যাওয়া হবে না।

—কেন?

কাপ ডিস্‌গুলো গোছাতে গোছাতে বলল, সংসারে আর

কোনো লোক নেই, তোমাকে দেখবে কে? তাছাড়া—

'তাছাড়া'র ফিরিস্তি শোনবার আগেই আমি শ্লেষের সুরে ঝাঁজিয়ে উঠলাম, এই শরীর নিয়ে যা দেখা দেখছ, সেটা কিছুদিন বন্ধ রাখলে কোনো ক্ষতি হবে না। তার চেয়ে বরং নিজেকে দেখবার চেষ্টা করো। এই পোড়া-কাঠের ওপরে যদি একটু মাংস লাগতে পার, তাহলেই আমি কৃতার্থ হবো।

এর পরেও বোধহয় সে এখানকার ব্যবস্থার কথা তুলত। সব রকম অপমান এবং রূঢ় ব্যবহার সহ্য করবার এক অদ্ভুত শক্তি ছিল তার। 'শক্তি' না বলে তার অভাব বলাই বোধহয় ঠিক। এক ধরনের অসাড়তা। যাই হোক, তখনকার মত আর কিছু বলবার সুযোগ আর তাকে দিলাম না। সশব্দে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লাম।

হাসপাতাল থেকে ফিরবার কিছুদিন পরে যে ঠাকুরকে সে ছাড়িয়ে দিয়েছিল, তাকেই কোত্থেকে খুঁজে পেতে ডেকে এনে নানা রকম উপদেশ দিয়ে পরদিন সন্ধ্যার মুখে মন্দাকিনী এই প্রথম আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেল। যাবার আগে যথারীতি প্রণাম, সাবধানে থাকবার এবং অসুবিধা বোধ করলেই ফিরিয়ে আনবার অনুরোধ ইত্যাদি কোনো পর্বই বাদ যায় নি। চোখের জলও দেখেছিলাম। কিন্তু কিছুই আমার মনে এতটুকু স্নেহ বা করুণা জাগাতে পারে নি। নিজের চোখ দুটো অবশ্য দেখতে পাই নি। তবু নিশ্চয় করে বলতে পারি, তার মধ্যে তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

আজ ভাবছি, সেদিন তার চোখে জলের বদলে এক কণা আগুন যদি দেখতাম, হয়তো কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা সে আমার কাছে পেলেও পেতে পারত, অন্ততঃ এতটা হেয় এবং তুচ্ছ হয়ে যেত না। আপনি কী বলেন?

যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই। মাস খানেক যেতে না যেতেই

মন্দার চিঠি পেলাম, সে এরই মধ্যে অনেকখানি সেরে উঠেছে, আর ওখানে পড়ে থাকবার দরকার নেই, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেন তাকে বাড়ি আনবার ব্যবস্থা করি।

শ্যালিকার যে চিঠি পেলাম, তার বয়ান ঠিক উল্টো। মন্দার শরীরের কোনো উন্নতি হয় নি। বেশ কিছুদিন ওখানে থাকা দরকার। কিন্তু আমাকে এখানে একা ফেলে সে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। সুতরাং আমি যেন এদিকের কাজকর্মের কোনো একটা ব্যবস্থা করে অন্ততঃ মাসখানেকের জন্যে ওখানে গিয়ে থাকি। তাহলে "আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হইব। অনেকদিন তোমাকে দেখি নাই। তোমার দাদা তবু কালে ভদ্রে কলিকাতায় যাইতে পারেন। আমার কোথায়ও নড়িবার উপায় নাই।" ইত্যাদি।

আমাদের কারবারের কথা আগেই বলেছি। তার মধ্যে কারচুপির অংশটাই বড়। কালক্রমে এই সব লাইনে আরো কিছু লোক এসে জুটল। শুধু প্রতিযোগীর সংখ্যাই যে বাড়ল, তাই নয়, তার মধ্যে কয়েকজন রীতিমত পেছনে লাগল। বাবা পাকা লোক, এদের সঙ্গে খানিকটা এঁটে উঠতে পারতেন। তিনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল। ক্রমশঃ নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। শ্যালিকার নিমন্ত্রণ যখন এল, তখন আমারও এক পা নড়বার উপায় নেই। মন্দার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হচ্ছে না—এ খবর পেয়ে দুশ্চিন্তার বদলে বিরক্তিটাই বেড়ে গেল। এটা যেন তার ভালো না হবার পণ, এখানকার শত্রুদের মত এই দুঃসময়ে সেও আমার পিছনে লেগেছে। তার উপরে তার ঐ প্যানপেনে 'পতি-বিরহ' অসহ্য আদিখ্যেতা বলে মনে হলো। শ্যালিকার চিঠির উত্তরে অবশ্য তাঁর ভগিনীর জন্যে যথারীতি উদ্বেগ প্রকাশের ত্রুটি হলো না। সেই সঙ্গে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাইলাম। আলাদা চিঠিতে মন্দাকে বেশ কড়া করে লিখলাম, রীতিমত সুস্থ হবার আগে ফিরে আসার কোনো কথাই উঠতে পারে না, এবং আমার জন্যে তার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

এর পরে রমণীমোহনের স্ত্রী বা তার দোসর কোনো মেয়ে হয়তো লিখত, না, আমি এখনই যেতে যাই, কিংবা ঐ ধরনের একটা কিছু। কিন্তু আমার স্ত্রী একেবারে অন্য জাতের। সে কোনো কথাই লিখল না, অর্থাৎ স্বামীর ইচ্ছাকেই নিঃশব্দে মেনে নিল।

যদি বলি, মেনে না নিলেই আমি মনে মনে খুশি হতাম এবং স্পষ্ট বা জোরালো না হলেও আমার চিঠির একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ আশা করে বসে ছিলাম, আপনি বিশ্বাস করবেন কি? করবেন না। কিন্তু এটুকু জেনে রাখুন, সে আশা যখন পূরণ হলো না, আমার মনটা তার উপরে শুধু তিক্ত নয়, বিষাক্ত হয়ে উঠল।

মন্দার আর কোনো চিঠি আমি পাই নি, তার দিদিরও না। পরের চিঠিটা এল তার ভগ্নীপতির কাছ থেকে। বেশ কিছুদিন, তা প্রায় মাস দুই পরে। প্রথমে আমার কুশল সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করে লিখেছেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, শ্রীমতী মন্দাকিনীর শরীর দিন দিন খারাপের দিকে যাইতেছে। বর্তমানে সে প্রায় শয্যাগত। এখানকার সর্বাপেক্ষা বড় ডাক্তারকে দেখাইয়াছি। তাঁহার মতে শ্রীমতীকে অবিলম্বে কলিকাতায় লইয়া গিয়া কোনো বিশেষজ্ঞের চিকিৎসাধীনে রাখা প্রয়োজন। এখানে একটি বিশেষ জরুরী কার্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। শীঘ্র ছাড়া পাইবার আশা নাই। নতুবা আমিই লইয়া যাইতাম। তুমি অতি সত্বর চলিয়া আসিবে। অন্যথা করিও না। অন্য সকলে একপ্রকার আছে। ইতি।"

অতি সত্বর না হলেও কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে যেতে হলো। দেখলাম, "শয্যাগত" শব্দটিকে আমার ভায়রাভাই যে 'প্রায়' নামক বিশেষণ দিয়ে মডিফাই অর্থাৎ মোলায়েম করবার চেষ্টা করেছেন, সেটা প্রকৃত ঘটনার দিকে চেয়ে নয়, আমার দিকে চেয়ে, আমি পাছে অতিরিক্ত বিচলিত হয়ে পড়ি, এই আশঙ্কায়।

মন্দার অবস্থা দেখে, তার ব্যাধির ইতিহাস এবং কাশির শব্দ শুনে আমি সত্যিই 'বিচলিত' হয়ে পড়লাম। বলাবাহুল্য, ওঁদের বা অন্য দশজনের মনে যে কারণ জাগবে, সে কারণে নয়। একে

এই 'শয্যা' থেকে টেনে তুলে দাঁড় করাতে যে বিপুল অর্থ, পরিশ্রম, শুশ্রূষা এবং সময়ের অপব্যয় হবে, সেই চিন্তাই আমাকে চঞ্চল করে তুলল। তার চেয়েও বেশী মনে হলো—একে দিয়ে আমি করবো কী।

আশা করি, আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন। আপনার গল্পের নায়কদের মত আমার মধ্যে কোনো রোমান্স নেই, বা কোনোদিন হৃদয়চর্চার ধার ধারি না, সে কথা আগেই জানিয়েছি। আমি রমণীমোহন নই, 'প্রেম'-জ্বরে কখনো ভুগি নি। দয়া, মায়া স্নেহ, প্রীতি এসব বড় একটা নিজেও পাই নি, অন্য কারো জন্যেও অনুভব করি না। নিছক 'ইউটিলিটি' বা প্রয়োজন ছাড়া 'স্ত্রী' নামক মানুষটিকে আর কোনো দিক থেকে দেখি নি। সেও কোনোদিন বুঝতে দেয় নি, এর বাইরে তার আর কোনো অস্তিত্ব আছে। সেই ইউটিলিটির কষ্টিপাথরে তার দাম অনেক দিন থেকেই কমে আসছিল। আজ যখন সেটা শূন্যে এসে ঠেকল, তখন একটি মাত্র প্রশ্নই আমার মনের মধ্যে মাথা তুলে উঠল—একে দিয়ে আমি করবো কী? আমার জীবনে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সেই-খানেই শেষ নয়। তারপরেও সে থাকবে—কে জানে কত বছর—আমার বা আমার সংসারের ভার নিয়ে নয়, আমার জীবনের দুর্বহ ভার হয়ে। অথচ—

ফার্স্ট ক্লাসের একটা 'কুপে' আমাদের জন্যে রিজার্ভ করা হলো। ভাড়াটা অবশ্য আমিই দিলাম, কিন্তু ব্যবস্থাটা আমার ভায়রা-ভাইএর। অনেকটা পথ; সঙ্গে ঐ রকম রুগী, তার ওপর মেয়েছেলে। তৃতীয় যাত্রীর ঝঞ্ঝাট রইল না, নির্বিবাদে যাওয়া যাবে।

স্ট্রেচার লাগল না। দিদি আর ভগ্নীপতি দুজনে দুবাহু ধরে ধীরে ধীরে প্লাটফরমটুকু পার করিয়ে মন্দাকে গাড়িতে তুলে দিলেন। বিছানা করে, ওকে শুইয়ে, ঘণ্টা পড়তে নেমে গেলেন। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, আমার শ্যালিকার অনুচ্চ কণ্ঠ থেকে শোনা

গেল, 'দুর্গা দুর্গা'। ভায়রাভাই চেঁচিয়ে বললেন, পৌঁছেই একটা তার করে দিও।

গরম কাল। রাত নটা। জামাটা খুলে ঝুলিয়ে দিয়ে মন্দার মাথার কাছে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। ও চোখদুটো তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ গো, এ গাড়িতে আর কেউ উঠবে না?

—না।

আর কিছু বলল না। লক্ষ্য করলাম, ওর মুখের উপর একটা খুশির আভা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ পরে বলল, তুমি কোথায় শোবে?

হাত দিয়ে উপরের বার্থ্‌টা দেখিয়া দিয়ে বললাম, ঐখানে।

—ওখানে! উঠবে কেমন করে?

—ঐ শেকলটা ধরে উঠবো।

—না, না, তার চেয়ে আমার বিছানাটা মেঝেতে নাবিয়ে দাও, তুমি এইখানে শোও।

এই ছেলেমানুষি প্রস্তাবে অন্য কেউ হলে হয়তো হেসে ফেলত। আমি গম্ভীর ভাবেই বললাম, মেঝেটা শোবার জায়গা নয়। আমি ওপরেই শোবো। তুমি ঘুমোও—আমাব এখন ঘুম পাচ্ছে না।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে আবার বলল, একটু উঠে বসবো?

—পারবে?

—খুব পারবো। তুমি যদি এই বালিশটাকে একটু—

বাকীটুকু আর বলল না। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। নিজের জন্যে আমাকে হঠাৎ কিছু একটা ফরমাশ করে বসেছে—হলই বা সে অতি তুচ্ছ—এটা ওর পক্ষে একেবারে নতুন। সেই লজ্জাটা তখনো ওর চোখে মুখে জড়ানো। আমি উঠে বালিশটা ওর পিঠের দিকে খানিকটা সরিয়ে দিলাম। আধশোয়ার মত বসে মন্দা অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি একমনে সিগারেট

টানতে টানতে শুনলাম, "এই ক'মাসে তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। খুব কাজ পড়েছে বুঝি ?"

আমি জবাব দিলাম না। ও তার জন্যে অপেক্ষাও করল না। অনেকটা যেন নিজের মনে বলল, তাছাড়া, দেখাশুনো কে করে ? খাওয়া-দাওয়া—

বাধা দিয়ে বললাম, সে সব পরে ভাবলেও চলবে। এখন নিজের কথা ভাবো।

—আমি এবার তু'দিনেই সেরে উঠবো।

আমার মুখে বোধহয় অবিশ্বাসের কোনো চিহ্ন ফুটে উঠে থাকবে। হাসি মুখে তারই যেন প্রতিবাদ জানাল মন্দা—"সত্যি, দেখো তুমি।"

এই জোর, এই তরল সুর—সবটাই আমার কাছে নতুন। যে মন্দাকে এতদিন দেখে এলাম, যাকে নিয়ে এতগুলো বছর ঘর করলাম, তার স্বভাবের সঙ্গে এটা যেন ঠিক খাপ খাচ্ছিল না।

—"কী ভাবছ ?"

—"কিছু না।"—জবাবটা নিজের কানেই বেশ রূঢ় লাগল। "রাত দশটা বেজে গেছে ; এবার ঘুমিয়ে পড়।" বলে উঠে পড়লাম।

মন্দা আর কোনো কথা না বলে, বালিশটা নিজেই ঠিক করে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত বেড়ে চলল। আমার চোখে ঘুম নেই। গাড়ির সব জানালাগুলো খোলা, তার উপরে পুরো দমে পাখা চলছে। তবু মনে হচ্ছে, কী তুঃসহ গরম। দরজা খুলে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চাঁদ নেই, কিন্তু আকাশ ভরা তারা। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। বিহারের রুক্ষ কঠিন, গাছপালা-হীন, অসমান পাথুরে মাঠ। পাতলা অন্ধকারে ঢাকা। তারই মধ্যে চোখ তুটোকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। বৃথা চেষ্টা। তারা বার বার গাড়ির ভিতরে ফিরে আসতে লাগল। মন্দা শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে পিছন ফিরে। আর সব আলো নেভানো। শুধু

একটা কম পাওয়ারের নীল আলো জ্বেলে রেখেছি। ওর কাঁধ পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মুখের একটা দিক আর তার নীচে গলাটা দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্ট আলোয় শুকনো ভাঙা গালের ঠেলে ওটা হাড়-গুলো আরো ঠেলে উঠেছে, চোখটা যে কোন্ কোটরে তলিয়ে গেছে, দেখা যায় না। কণ্ঠার হাড় ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। মানুষের মুখ যে এত কুৎসিত, এর আগে কোনোদিন দেখি নি। শুধু কুৎসিত নয়, কী বীভৎস! একটা জীবন্ত কঙ্কাল। কী মূল্য এই জীবনের। কী সার্থকতা এই বেঁচে থাকার? ভাবতে গিয়ে সমস্ত মনটা গভীর নৈরাশ্যে ভরে উঠল। সেই একই প্রশ্ন মনে এল—এই জীবন্ত অভিশাপ নিয়ে আমি করবো কী?

রেলগাড়ির চলন্ত চাকায় তারই প্রতিধ্বনি বেজে চলল—আমি করবো কী—আমি করবো কী?

এই কিছুক্ষণ আগে সে আমাকে ভরসা দিয়েছে (ভরসাই বটে!)—'আমি দুদিনেই সেরে উঠবো।' আমি জানি, সে কোনোদিনই সেরে উঠবে না। কিন্তু সেই মিথ্যা আশা, বেঁচে থাকবার সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ওকে সহজে মরতে দেবে না, মৃত্যু-কবলিত প্রাণটাকে কোনো রকমে জীইয়ে রেখে দেবে। কে জানে, সে কত কাল, কত বছর!

বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস! আমি যখন প্রায় সারারাত ধরে এমনি করে জ্বলে পুড়ে মরছি, যাকে ঘিরে সেই জ্বালা, সে তখন নির্বিবাদে ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে কোনো ছোট স্টেশনে গাড়ি থামতেই তার সেই নিশ্চিন্ত নিশ্বাস আমাকে পাগল করে তুলছিল। ভাবছিলাম, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কত আকস্মিক ঘটনা ঘটছে। এই নিঃশ্বাসের গতিটা হঠাৎ থেমে যেতে পারে না? নিজে থেকে না থামলেও—

কাশির শব্দে চমকে উঠলাম। একটানা প্রবল কাশি। তার দমকে গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো যেন ঠিকরে পড়ছে। এমনি করেও তো দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু গেল

প্রতিবাদ করছি না। যে রাজ্যে আমি দীর্ঘজীবন কাটিয়ে এলাম, সেখানে 'পিশাচের' অভাব নেই, 'পাপের মূর্তি'-ও কম দেখি নি। তবু মনে হয়েছে, সেইটাই সবটুকু নয়, তার অন্তরালে আরো কিছু আছে। কারো কারো বেলায় সেই 'আরো কিছু'-টাই আমার চোখে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আজও কোনো নির্জন অবসরে যখন পিছন ফিরে তাকাই, সেই কটা লোকই সামনে এসে দাঁড়ায়—সেই বদন মুন্সী, কাশিম ফকির, মংখিয়া জং, জ্ঞানদা, পরিমল, ব্রহ্মচারী সদানন্দ। তাদের কাছে ম্লান হয়ে যায় অনাথ, কুসুম, রাজাবাহাদুর এবং এই পত্রলেখকের মত আরো যাদের দেখেছি।

হয়তো শ্রীকান্তর মত আমারও এটা একটা সংস্কার। তার মধ্যে যদি অপরাধ থাকে, সে-অপরাধ আমি অকপটে স্বীকার করছি।

সমাপ্ত